লৌহ মানব
নসীম হিজাযী

লৌহ মানব*

মূল
নসীম হিজাযী

অনুবাদ
ফজলুদ্দীন শিবলী

প্রকাশক
তারিক আজাদ চৌধুরী
আল-এছহাক প্রকাশনী
বিশাল বুক কমপ্লেক্স, দোকান নং ৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল ফোন : ০১৯১৬৭৪৩৫৭৭, ০১৯১৬৭৪৩৫৭৯

প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০১১

প্রচ্ছদ
আরিফুর রহমান

কম্পোজ
আল-এছহাক বর্ণসাজ
বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

মূল্য : ১৬০.০০ (একশত ষাট) টাকা মাত্র।

ISBN : 984-837-004-8

---

* "লৌহ মানব" এই বইটি নসীম হিজাযীর লিখিত মূল উর্দূ বইয়ের বাংলা অনুবাদ। বইটি বাংলাভাষায় এই প্রথম অনূদিত। যার ঘটনা ইতিপূর্বে বাংলায় আর কখনো অনূদিত হয়নি। "লৌহ মানব" নামটি ছদ্ম বাংলা নামকরন।

ভূমিকা

ইতিহাস জাতির দর্পণ। মেরুদণ্ড সম্পন্ন জাতি সত্ত্বাকে ভঙ্গুর করে দিতে পারে ইতিহাসের বড় নির্দয়-নিষ্ঠুর ছড়ি। মেরুদণ্ডহীন জাতিসত্ত্বাকে পুনঃস্থাপনের জন্য চাই নির্মল-নিস্কলুষ জাতিস্বত্ত্বার ইতিহাস। মজার বিষয় এই যে, আমাদের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। পৃথিবীর সবখানেই আমরা বিজয়ী ঘোড়া দাবড়িয়েছি এক সময়। পিরেনিজের সুউচ্চ পর্বতমালা থেকে রোম সাগরের উত্তাল উর্মিমালা একসময় ধন্য হয়েছে এ জাতির বিজয়ী ঘোড়ার পা চুম্বনে। রোম-ইরানের দম্ভের সুউচ্চ চূড়া কেঁপে ওঠেছে জাতির দৃঢ় ইচ্ছার সম্মুখে। আরল, জাইহুন, নিশাপুর থেকে সুবিশাল ভারতের ভূ-ভাগও বাদ যায়নি এ থেকে। হিমালয়ের আকাশচুম্বি উত্থানের মত অতিউঁচু আমাদের উপাখ্যান। ভারত মহাসাগরের ঢেউ ঝুঁটি আজো গেয়ে চলেছে আমাদের যশোগাথা। সিন্ধু, মালাবার, নিরূন, তরাইন কালের সাক্ষী হয়ে আছে। আমাদের স্বর্ণালী ঐতিহ্য আমরা হারিয়েছি নিজের দোষেই। ভঙ্গুর সেই সত্ত্বাকে বলীয়ান করতে দরকার আজ কিছু মর্দে মুমিন সিংহ-সার্দুল পালোয়ান। দরকার কিছু মুহাম্মদ ঘুরী, আইবেক ও হাম্মাদের মত দুঃসাহসিক যোদ্ধা। জাতি তাকিয়ে আছে কবে আসবে আবার সেই সুদিন ? কবে আবার তরাইনের রণাঙ্গনে তলোয়ারের ঝংকার ওঠবে? যুগের পৃথ্বিরাজদের প্রমোদমহলে কারা কাঁপন ধরাবে? আছে কি এমন অমিত তেজা কোন ঘুরী কিংবা আইবেক? থাকলে তারা কৈ ? কোথায় ??

—নসীম হিজাযী
স্যাটেলাইট টাউন

প্রস্তুতি

শীতের জমকালো দীর্ঘরাত।

কনকনে শীতের প্রাবল্য গোটা প্রকৃতিতে খেলে যায় একের পর এক। পথঘাট ও লোকালয় শূন্য। হিরাত থেকে নিশাপুরের দিকে যাওয়া গিরিপথগুলোতে মৃত্যুর নিস্তব্দতা। কোথাও কেউ নেই। দুর্গম পাহাড়ী পথের দু'পাশেই কবরের নীরবতা। ঘন ঝোপ-ঝাড় সেই পরিবেশকে করে তুলছে আরো ভয়াল, আরো বিভিষিকাময়। মৃত্যুপুরীর নিস্তব্দতার বুক চিরে সহসাই ভেসে ওঠে দ্রুতগামী অশ্বখুড় ধ্বনি। সেই ধ্বনিতে পাথুরে ভূমি কেঁপে ওঠে। খানিকবাদে জনা তিনেক অশ্বারোহীকে ঝড়োবেগে নিশাপুরের দিকে যেতে দেখা যায়।

অশ্বারোহীরা খরস্রোতা পাহাড়ী নদীর তীরে এসে দাঁড়ায়। এদের একজন পূর্বদিকে তাকিয়ে সঙ্গীদের বলল, 'বন্ধুরা আমার! ফজরের নামাযের ওয়াক্ত আসন্ন। এসো নামায পড়ি। পরে চড়ি ঘোড়ায়। তিনজনই একলাফে অশ্বপৃষ্ঠ হতে নামল। ঘোড়াগুলো তেকোনা পাথরে বাধল। নদীর হাটু পানিতে নেমে সেড়ে নিল ওজু।

পূর্ব দিগন্তে আঁধারের বুক চিরে ভেসে ওঠল লম্বালম্বি সূর্যরেখা। এ সময় আলবুর্জ পর্বতমালার গা বেয়ে নেমে আসা উত্তর-পশ্চিমি হিমবায়ু শৈত্য প্রবাহে আরো প্রবৃদ্ধি আনল। অশ্বারোহীরা ওজু করে ঘোড়া নিয়ে উঁচু পাহাড়ে চড়ল। ঘাস-পাতা খেতে অবলা প্রাণীগুলোকে ছেড়ে দেয়া হল তার মর্জির ওপর। এদের নেতাগোছের আরোহী উঁচু পাথরে দাঁড়িয়ে দিল আযান। কণ্ঠস্বর তার ঠিক আরবের মতই। বোঝা গেল, আযানদাতা আরবী-ই। আযানের সুমধুর আওয়াজ জাগিয়ে তুলল জংলী মোরগ ও পাহাড়ী পাখিগুলোকে।

বাদ নামায অশ্বারোহীরা পুণরায় ঘোড়ায় চাপল। পূবালী হিমবায়ুর ঝাপটা লাগল তাদের গায়ে। এক দিগন্তপ্রসারী আলোকবন্যা নিয়ে সূর্য ওঠল। জমকালো প্রকৃতি থেকে ক্রমশই সড়ে যায় আঁধারের পর্দা। নীড় ছেড়ে বিহঙ্গকুল ঝাঁকবেধে উড়ে যায় অজানার উদ্দেশ্যে। অশ্বারোহীরা দূরে আরো একদল অশ্বারোহী দেখে চমকে ওঠে। ওরা তাদের লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে। সূর্যের আলোতে বরফাবৃত আলবুর্জ পাহাড়ের উঁচু চুড়া দেখা যায়। আগুয়ান অশ্বারোহীদের এবার আরো স্পষ্ট করে চোখে ভেসে ওঠে। তিন অশ্বারোহী খানিকটা ভীত হয়ে আগুয়ান অশ্বারোহীদের

পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। বিপদ আসন্ন আঁচ করে ওরা খাপ থেকে খুলে নেয় তরবারীগুলো। গিরিপথ থেকে তরতর করে ওরা নেমে আসে। সংখ্যায় বারোজন। সকলেই জংগী হাতিয়ারে সজ্জিত। এরা এই তিন আরোহীর কাছে এসে দাঁড়াল। আগতদের একজনকে জেনারেল বলে মনে হচ্ছিল। তিনি এদের লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমরা কারা? যাচ্ছ কৈ?'

আরবী গোছের আরোহী যে একটু আগে আযান দিয়েছিল বললো, আমরা মুসাফির, যাচ্ছি নিশাপুর।

আগন্তুক জেনারেল বললেন, এসেছেন কোত্থেকে?

আরবী এবার কিছুটা জলদগম্ভীর স্বরে বললো– 'নিশাপুর থেকে ভারতমুখী একটি কাফেলার মোহাফেয হয়ে ভারত গিয়েছিলাম। ওই কাফেলার লাভ-লোকসানের হিসাব কষে আমরা ফিরে এসেছি। কাফেলাটি এই মুহূর্তে হিরাতে অবস্থান করছে। থাকবে কিছুদিন। ওরা যেহেতু আমাদের হিস্যা আদায় করেছে সেহেতু আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে নিশাপুরের উদ্দেশ্যে ছুটছি।'

জেনারেল বললেন, তোমরা কি নিশাপুরবাসী?

আরবী এবার খানিকটা ক্লান্ত কিন্তু মুখ গোমরা করে বললো, নিশাপুর থেকে চার ফার্লং দূরবর্তী সামারাবাদ বসতিতে আমাদের বাস।

'তোমরা ৩জনই আমাদের সাথে নাসীরুদ্দীনের কাছে চলো। তিনি তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন।

'নাসীরুদ্দীন কে? আমাদের দিয়ে তার কি কাজ? কেনই বা ডেকে পাঠিয়েছেন?' তিনজনই বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল।

আগন্তুক নম্রকণ্ঠে বললেন, 'তিনি সুলতান শেহাবুদ্দীন ঘুরীর ভাগ্নে, একই সাথে তিনি হিরাতের গভর্নরও। এক্ষণে তিনি 'তোয়ালুক' শহরে আছেন। এখান থেকে শহরটা মাইল দুয়েক দূরে। ওই শহরটা তোমরা পেছনে ফেলে এসেছো। তিনি এক বাহাদুর, দুঃসাহসী, স্বতন্ত্রমনা, অকুতোভয় জোয়ান খুঁজে ফিরছেন। তিনি হিন্দুস্তানে মোহাম্মদ ঘুরীর পক্ষ হয়ে ওখানে চরবৃত্তির জন্য তাকে এমন কাজের ভার দিতে চান যা মুসলিম বিশ্ব ও মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর হবে।

আরব এবার কতকটা তটস্থকণ্ঠে বললো, এ কাজের সম্পর্ক ইসলাম প্রচার ও প্রসারের জন্য কি?'

আগন্তুক দ্বীধাহীন চিত্তে বললেন, 'হ্যাঁ যুবক! তোমার ধারণা সঠিক।'

আরবী যুবকের স্বর এবার উত্তেজনায় ভরপুর, 'এমনটা হলে কেবল তোয়ালুক কেন আমরা আপনাদের সাথে পৃথিবীর শেষ কোনায়ও সফর করতে প্রস্তুত। একথা বলে সে ঘোড়ায় চাপল। সাথীরাও পরে তার অনুসরণ করল। ওদের গতি এবার হিরাতের রাজপথ ধরে।

২.

তোয়ালুকের উপকণ্ঠে পাহাড়ী পথের এক প্রাচীন হাবেলীর সামনে এসে ওদের ঘোড়া থমকে দাঁড়াল। তন্মধ্যে একজন এক লাফে ঘোড়পৃষ্ঠ হতে নেমে হাবেলীর ভেতরে প্রবেশ করল। খানিকবাদে বেশ কিছু মোহাফেযবেষ্টিত গম্ভীর প্রকৃতির একলোক বেরিয়ে এলেন। ইনি হিরাতের গভর্ণর নাসীরুদ্দীন। তাঁকে দেখামাত্রই সব সওয়ার-ই ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়াল। নামল ওই আরবও।

নাসীরুদ্দীন সোজা ওই আরবের কাছে এলেন। তার সাথে মোসাফাহা করে বলেন, 'হিরাতের গভর্ণর নাসীরুদ্দিন আমি। তোমার দেহ-চেহারা পর্যবেক্ষণে আমার দৃষ্টি ভুল করে না থাকলে তুমিই হবে সে জোয়ান যাকে আমরা হন্যে হয়ে খুঁজে ফিরছি। খুব সম্ভব তুমিই আমাদের শর্ত পুরা করতে পারবে। তা তোমার নাম?'

মোসাফাহার জন্য হাত বাড়িয়ে যুবক বললো, 'হাসান আমার নাম। হাসান বিন খালদুন। তা আপনাদের শর্তটা জানতে পারি কি? আপনি আমাকে কি ধরনের কাজ সোপর্দ করতে চান?'

'এসো আমার সাথে, বলব সব।' বা'দিকে সামান্য এগিয়ে বললেন নাসীরুদ্দীন।

ঘোড়ার লাগাম পাকড়ে সকলেই তার পিছু নিল। নাসীরুদ্দীন বলতে থাকেন, শোন! আমি এমন এক জোয়ানের খোঁজে আছি, যে সুলতান মুহাম্মদ ঘুরীর হয়ে হিন্দুস্তানে গুপ্তচরবৃত্তি করবে। সুলতান খুব শীঘ্র হিন্দুস্তানে চূড়ান্ত আঘাত করবেন। তবে এরপূর্বে সুলতান হিন্দুস্তানী রাজাদের প্রতিরক্ষাশক্তির আন্দায করতে চান। এ মুহূর্তে আমাদের অসংখ্য গুপ্তচর হিন্দুস্তানের মাটিতে জালের মত ছড়িয়ে আছে। বেশ ক'মাস পূর্বে জনৈক জোয়ানকে গুপ্তচরদের আমীর করে পাঠিয়েছিলাম। তার শৌর্য-বীর্য ও দুঃসাহসিকতায় সকলেই প্রীত। নাম তাঁর আইলাক খান। আল-বুর্জ পর্বতমালার পাদদেশে তাঁর বাস। জাতিতে তুর্কি।

ছ'মাস পর্যন্ত সে তাঁর দায়িত্ব পালন করে আসছিল। আচমকা তাঁর সাথে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মনে হচ্ছে, সে ধরা পড়ে গেছে। এক্ষণে এমন এক গুপ্তচরের খোজে আছি আমরা, যে হিন্দুস্তানে চরবৃত্তির নেতৃত্বের পাশাপাশি আইলাক খানকেও খোঁজ করবে এবং হিন্দুস্তানী রাজা-বাদশাদের প্রতিরক্ষা সম্পর্কে তথ্য দেবে। মুহাম্মদ ঘুরী ওই গুপ্তচরের তথ্য মোতাবেকই ওই দেশে আক্রমণ করবেন।

নাসীরুদ্দীন বলে চলেছেন। পাহাড়বেষ্টিত এক খোলা ময়দানের সামনে এসে দাঁড়ান তিনি। ওখানে একটি উঁচু পাইনগাছে মোটা একটা রশি ঝুলে থাকতে দেখা গেল। নাসীরুদ্দীন ওই বৃক্ষের নীচে এসে রশির দিকে তাকিয়ে বললেন, "হিন্দুস্তানে গুপ্তচরবৃত্তির নেতৃত্বের জন্য আইলাক খানকে নির্বাচন করেছিলাম আমিই। এই রশিটা ওই তুর্কি লোকটা ছিড়ে ফেলেছিল। আইলাক খানের মত যে এই রশি টেনে ছিড়তে পারবে তাকেই গোটা ভারতবর্ষের গোয়েন্দাপ্রধান নিযুক্ত করব। শোন হাসান বিন

খালদুন! তোমার দু'সাথীকে বেশ দুর্বল অনুমিত হচ্ছে। তবে তোমার কথা ভিন্ন। এসো! ভাগ্যটা একটু পরখ করে নাও।'

হাসান বিন খালদুন বেশ কিছুক্ষণ বড় চোখ করে নাসীরুদ্দীনের দিকে তাকিয়ে রইল। পরে ঝুলন্ত রশির দিকে গেল এগিয়ে। রশির এক প্রান্ত গাছে মোড়া অপরপ্রান্ত পাথুরে জমিনে শোয়ানো।

হাসান অগ্রসর হয়ে ভারী ওই রশি উঠাল। খানিক পরখ করে নিল পরিস্থিতি। জামার হাতা গুটিয়ে শক্তি ব্যয় করতে লাগল। দড়ি ছিড়তে তার সে কি প্রচেষ্টা। কিন্তু দড়ি ছেড়া তো দুরের কথা উল্টো হাসানেরই ছিড়ে যাবার উপক্রম। শেষ পর্যন্ত হাসান রশি ছেড়ে মাথা নীচু করে এসে দাঁড়াল। নাসীরুদ্দীন এতে আরো হতাশা প্রকাশ করেন। তার চেহারা বলছে, আহা, তুমি যদি এ রশি টেনে ছিড়তে পারতে।

হাসান তার কাছে এসে দাঁড়ালে তিনি ভগ্নোৎসাহ হয়ে বলেন, 'তোমার বীরত্বের ঢাক-ঢোল পিটিয়ে আমি ভুলই করেছি। সত্যিই তুমি আমাকে ভ্যাবাচাকায় ফেলে দিয়েছ। এমুহূর্তে আমার মন বলছে, তোমাকে যেতে দিয়ে অন্য কারো তালাশে লেগে যাই। তবে যদি কাউকে না পাই তখন তো আমার অবস্থা 'আমও গেল ছালাও গেল' এর মত হবে। তার চেয়ে তোমার মত অন্য কাউকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তোমাকে বন্দী রাখব। দেশসেরা বীর পেলে তো ভাল, নচেত তোমাকেই পাঠাব ভারতে।'

হাসানের জনৈক সাথী এ সময় বলে ওঠল, ' এ জোয়ানকে ছেড়ে দিন। নইলে কিয়ামতের বিভীষিকা নিয়ে তার বড় ভাই এসে পড়বেন। কোন শক্তি কিংবা চোখ রাঙানী দিয়ে তাকে ঠেকানো যাবে না। ওর ভাই সে এমন এক যুবক যে জীবনে পরাজয় কাকে বলে জানে না।

নাসীরুদ্দীন চকিতে তার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'শক্তিতে ওর বড় ভাই ওর চেয়েও বেশী?'

'শক্তিতে সে ওর চেয়ে দশগুন বেশী। পাথরের মত শক্ত তার পেশী। বীরত্বে অনন্য, দুঃসাহস অসম। প্রতিরোধ্য তার গতি।' বলল যুবক।

নাসীরুদ্দীনের চেহারায় কালো মেঘ সরে সেখানে জ্বলজ্বল আভা দেখা গেল। নিজের খুশী সংযত করে তিনি বললেন, 'কওমের এই শেরদিল জোয়ানের সাথে তুমি কি আমায় পরিচয় করিয়ে দিতে পারনা?

ওই যুবক পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'নাম তার হাম্মাদ বিন খালদূন। সে এমন এক জোয়ান, যে মরুভূমিকে পুকুর বানিয়ে দিতে সক্ষম মুহূর্তেই। সমুদ্রকে ঢোকাতে পারে লোটার মধ্যেই। নাসীরুদ্দীনের দেহ ঝটকা মেরে ওঠে। তিনি হাসানের কাছে এসে সন্দিহান দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার বন্ধু যা বলল তা কি সত্য? আমার কান আমার সাথে প্রতারণা করেনি তো? হাসান মুচকি হেসে বললো, 'উহু! আমার সাথী যা কিছু বলেছে যথার্থই বলেছে। আমার ভাই সত্যিই

অমন লৌহমানব। শক্তি-সমর্থে তার ধারে কাছেও ঘেঁষার মত কেউ নেই। তিনি আমাদের শক্তির প্রাণবিন্দু,আশার আলো ও শেষ ভরসা। এতদাঞ্চলের মানুষ তাকে 'লৌহমানব' বলে খেতাব দিয়েছে। দোস্ত-দুশমনের ওপর আঘাত হানলে তিনি তার মাথার খুপড়ী তুলেই তবে ক্ষান্ত হন। কলা-কদু গাছের মত প্রতিদ্বন্দ্বীর মাথা কাটতে থাকেন। এ অব্দি যারাই তার মোকাবেলায় নেমেছে তার ভাগ্যেই জুটেছে পরাজয়ের কালো তক্‌মা।'

থামল হাসান। খানিক দম নিয়ে আবার বলতে শুরুর করল, 'শুনুন নাসীরুদ্দীন! যেভাবে সমুদ্র কোন জাহাজের গতিরোধ করতে পারে না যেভাবে সাঁপের গতিরোধ করতে পারে না কোন প্রান্তর এবং ঈগলের পথে বাদ সাধতে পারে না কোন আকাশ; সেভাবে আমার ভায়ের গতিরোধ করতে সক্ষম নয় কোন মানবিক শক্তিই। যেখানে প্রিয়জন ও নিকটাত্মীয়দের কাছে তিনি আলোকবর্তিকা সেখানে দুশমনের কাছে তিনি যমদূত ও ধ্বংসের প্রতিভূ।'

নাসীরুদ্দীন হাসানের দু'সাথীর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তধর্মী যবানে বললেন, 'যাও! তোমরা নিশাপুর গিয়ে হাম্মাদ বিন খালদূনকে বলো, তার ভাই হাসানকে হিরাতের গভর্নর বন্দী করে রেখেছেন। পারলে তলোয়ারের জোরে সে তার ভাইকে আমাদের থেকে ছাড়িয়ে নিক। তাকে এও বলো, নাসীরুদ্দীন এ মুহূর্তে তোয়ালুক শহরের উপকণ্ঠে একটি হাবেলীতে আছেন।'

হাসানের দু'সাথী রাগত চেহারায় গভর্নরের দিকে তাকাল। হাসানের দিকে তাকাল সকরুণ দৃষ্টিতে। পরে তারা চাপল ঘোড়ার পিঠে। মুহূর্তে নিশাপুরের উদ্দেশ্যে হিরাতের রাজপথে উঠে গেল।

নাসীরুদ্দীন হাসানের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করে বললেন, 'এসো আমার সাথে।'

হাসান অবনত মস্তকে তাকে অনুসরণ করল। হাতে ওর ঘোড়ার লাগাম। ওর ঘোড়ার একপাশে ঝুলছিল একটি কুঠার। এক সময় গিয়ে পৌছুল পুরানো হাবেলীতে। দারোয়ান গভর্নর ও হাসানের ঘোড়া আস্তাবলে নিয়ে গেল। তিনি ওকে নিয়ে একটি কামরায় প্রবেশ করেন। একটি বেঞ্চের দিক ইশারা করে ওকে বসতে বলে বললেন, 'তোমার ভাই সম্পর্কে বিস্তারিত বল। ভারতের ভৌগলিক জ্ঞান ওর আছে কি?'

হাসান খানিক চিন্তা করে বলল, 'এর পূর্বে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন।'

'বলো!' নাসীরুদ্দীন মুচকি হেসে বলেন।

'সত্যিই কি আমি আপনার বন্দী এখানে? আমার ভাইকে তলোয়ারের জোরেই এখান থেকে আমাকে উদ্ধার করতে হবে?'

'উহু! তুমি আমার বন্দী নও— মেহমান। যখনই যেতে চাইবে যেতে পারবে। বাধা দেব না। 'তুমি আমার বন্দী' কথাটা না বললে তোমার ভাই এদিকটায় হয়ত

আসতই না। বলতে পার এটা তাকে বাগে আনার একটা কৌশল মাত্র। এক্ষণে তোমার বন্দীদশা অনুমান করে তাকে আসতেই হবে; যদি সে তোমার কথার মত হয়ে থাকে লৌহমানব। এসে সে আমার শর্তপূরণ করলে ধর্ম ও জাতির এমন কাজ তার দ্বারা নেব যাতে তোমাদের ইহলৌকিক জীবন আমূল বদলে যায়। এক্ষণে তার সম্পর্কে কিছু জানতে চাইব। আশা করি সঠিক উত্তর এড়িয়ে আমাকে হতাশ করবে না। শেষের দিকের কথাগুলো বলতে গিয়ে গভর্নরের কণ্ঠ ধরে এল। সেই সাথে ঝড়ে পড়ল একরাশ মিনতিও।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হাসান বলতে শুরু করল, আমরা তিন ভাই। আমি কনিষ্ঠ। আমার বড় দু'জন। বড় জন হাম্মাদ আর মেঝটা হারেস। বাবার নাম খালদূন। মায়ের নাম যাবীব। আমার মা পক্ষাঘাতগ্রস্থ। ঘোড়ার থেকে পড়ে তার এই দশা। লাঠিই তাঁর চলার সম্বল। হাম্মাদ ও হারেস নিশাপুরে একটি চুনা ফ্যাক্টরীতে কামলা খাটে। আমার মত ওরা দু'জনও মাঝে মধ্যে ভারতীয় বাণিজ্য কাফেলার প্রহরী হয়ে ওখানে গিয়ে থাকে। ভারতবর্ষ ওদের কাছে অপরিচিত নয়।

হাম্মাদ আমার মায়ের অধিক স্নেহধন্য। কারণ, সে আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড়, অধিকন্তু মায়ের সেবায় সর্বেসর্বা। প্রাত্যহিক সে মা'কে ওজু পর্যন্ত করিয়ে দেয়, পা ধুয়ে দেয়। তলদেশ দিয়ে ঝর্নাপ্রবাহিত এক নয়নাভিরাম পাহাড়ের চূড়ে আমাদের বাস। বড় ভাই হাম্মাদ মাকে পিঠে করে ওই ঝরনার কাছে নিয়ে যায়। ওখানে গোসলখানা আছে। আছে নামায ঘরও। বড় ভাইয়ের ওপর তাই মায়ের বিশেষ দোয়া আছে। কাজেই তিনি যে কাজে যান সে কাজেই সফলকাম হয়ে থাকেন।

একবার ভাইজান কোন এক বাণিজ্য কাফেলার সাথে ভারতবর্ষে আগমন করেন। আমি ও হারেস তখন খুব ছোট। দুর্ভাগ্যবশতঃ মা তখন কঠিন রোগে আক্রান্ত। মায়ের অবস্থা দেখে আমি ও হারেস খুব কান্নাকাটি করছিলাম কিন্তু মায়ের পদসেবার পাশাপাশি বড় ভাইয়া আমাদের যথারীতি সান্ত্বনাও দিয়ে চলছিলেন। এমনকি নিশাপুরের হেকিম এনে তাঁর এলাজও করিয়েছিলেন। দিনরাত তিনি আম্মিজানের পায়ের কাছে পড়ে থাকতেন।

মায়ের অসুখের দিনগুলোতে গভীর রাতে আমরা যখন গাঢ় নিদ্রায় বিভোর তখন বড়ভাই বিনিদ্র। হঠাৎ করে এসময় মা পানি চাইলেন। সোরাহী হাতরে তিনি দেখলেন পানি নেই। সঙ্গে সঙ্গে পানি আনতে একাকী পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে নামলেন। গ্লাস ভরে তাঁর শিয়রের কাছে পানি নিয়ে গিয়ে দেখলেন তিনি ঘুমিয়ে গেছেন। তিনি আম্মিজানের নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটালেন না। গ্লাসভর্তি পানি নিয়ে ওখানে বিনিদ্র দাঁড়িয়ে রইলেন। সকাল অবধি মা ঘুমিয়ে রইলেন। ভোরের আলোতে তার ঘুম ভাংতেই দেখলেন বড় ভাইয়া পানি হাতে দাঁড়ানো। এদৃশ্য দেখে মায়ের চোখ ছানাবড়া। ভাইয়ার এই মাতৃভক্তি তাঁর মনে দাগ কাটে। মনের অজান্তেই রাব্বুল আলামীনের দরবারে তাঁর হাত উত্তোলিত হয়। আমার ভাইয়ের জীবন ওই এক

দোয়াতেই ঘুরে যায়। তিনি যেখানেই যান সফলতা সেখানে যেন ওঁৎপেতেই থাকে। থামল হাসান। খানিক দম নিয়ে আবার বলা শুরু করল, 'হাম্মাদ চটের পোষাক পরিধান করে থাকেন।'

নাসিরুদ্দীন ওর কথার মাঝ পথে বলে ওঠলেন, 'চটের পোষাক কেন?'

'আমার বাবা-মা ছিলেন নিঃসন্তান। অনেকদিন পরে বড় ভাইয়া তাদের ঘরে এলে চটের পোষাক পরিয়ে মানুষের নজর থেকে তাঁকে বাঁচাতেই মা এমন সিদ্ধান্ত নেন। তার আশৈশব চটের পোশাক পরার দরুন এর প্রতি তার কেমন একটা ভালবাসা জন্মায়। যৌবনে পা দিয়েও তিনি চট প্রীতি ছাড়তে পারছেন না। মা তার জন্য উত্তম জরিদার-বুটিদার পোষাক স্বহস্তে সেলাই করতেন। কিন্তু ভাইয়া কোন না কোন অজুহাতে ওই নয়া পোষাক গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাতেন। কোন কাজে ভাইয়া ঘর থেকে বেরুলে মানুষের বদনজর থেকে রক্ষাকল্পে বাবা আর মুখমন্ডলে কালা মেখে দিতেন।' মুচকি হেসে কথাগুলো বলল হাসান।

হাসানের বক্তব্যে ছেদ পড়ল। নাসীরুদ্দীন ডুবে গেলেন চিন্তার অথৈ সাগরে। আচমকা তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, তোমার খানার এন্তেযাম করছি। খেয়ে দেয়ে আরাম করবে। তোমার ভাই হাম্মাদ ইবনে খালদন আসা অবধি তুমি আমার সম্মানিত মেহমান হিসেবে থাকবে।' ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন নাসীরুদ্দীন। হাসান দীর্ঘশ্বাস কেটে কেবল আসমানের দিক তাকাল।

সাক্ষাৎ

নিশাপুর শহর।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি।

এর চারপাশেই ঢেউ খেলানো পর্বতশ্রেণী। শিল্পরসিক সৌন্দর্য প্রেমিকদের নজর কাড়তে এর জুড়ি নেই।

শহরের পাদদেশে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়ানো বেশ ক'টি বিশাল চুন ফ্যাক্টরী। এর কিছু থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উড়ছে, আর কিছুতে উড়ছে না। পাথরের পর পাথর ভরা হচ্ছে ওগুলোয়। বড় মাপের একটি চুনা বয়লারের কাছে জনৈক বৃদ্ধ বসে সেদিকে গভীর নযরে দৃষ্টি বুলাচ্ছেন। হাসানের বাবা খালদূন-ই এই বৃদ্ধ। যার দাঁড়ির সিংহভাগই পেকে সাদা। তাঁর পাশেই উঁচু পাহাড় থেকে কোদাল মেরে পাথর কেটে টুকরী ভরে নীচে নামছে দ' যুবক এবং পালাক্রমে তা বয়লারে ওঠাচ্ছে। ওই দু'যুবক পাথর ফেলতে খালদূনের নির্দেশনা মেনে চলছে।

এক সময় ওই যুবকদ্বয় চিৎকার দিয়ে বৃদ্ধকে সড়ে যেতে বলল। প্রকান্ড এক পাথর ওদের হাত ফসকে গড়িয়ে যাওয়ায় ওদের এই সড়ে যেতে বলা। পাথরের ওপর বসা খালদূন উঠে দাঁড়ালেন। প্রকান্ড পাথর গড়িয়ে নীচে পড়ে থেমে গেলে এক যুবক ওটি ওঠানোর চেষ্টা করে। যুবকটি হাসানের বড় আর খালদূনের মেঝ ছেলে হারেস। দেখতে সে বেশ তাগড়া। পাথরটি যারপরনাই চেষ্টা সত্ত্বেও সে ওঠাতে পারল না। ফুটে ওঠল তার চেহারায় হতাশার কালোছাপ। খালদূন হারেসের দিকে বাৎসল্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'কোদাল মেরে দু'টুকরো করে ওটি ওঠাতে চেষ্টা কর বেটা! অবলীলায় উঠে যাবে।'

কোদাল না মেরে পাশের যুবকটির দিকে ইশারা করে হাসের বোঝাতে চাইল, এসো একা নই আমরা দু'জনে মিলে ওটি ভাঙি। অপর যুবক দেখতে ওর চেয়েও তাগড়া, বলিষ্ঠ। পরনে তার চটের পোষাক। হারেসের বড় ভাই এই যুবক। নাম হাম্মাদ বিন খালদূন। জলন্ত আঙ্গারের মত দ্যুতিমান তার চোখ। কাজলকালো মাথাভর্তি একরাশ চুল। মোটা ভ্রু। সটান তার শীরাতন্ত্রী। বাহু যুগলে প্রচন্ড শক্তি। পাষাণ প্রান্তরের মত সুবিশাল বক্ষ। প্রভাতী সৌরালোকে দীপ্যমান প্রকৃতি যেন তার চেহারার লালিমা। পাঞ্জাযুগলে ব্যঘ্রশক্তি। লৌহরডের মত আংগুলগুলো সটান। হাতে ওর একটি লৌহ গুর্জ। পাথুরে মিস্ত্রীরা শীলান্তর ভাঙতে এর সাহায্য নেয়।

প্রকান্ড পাথরখন্ডটি ভাংতে না পেরে হাসের হতাশ হয়ে ভায়ের মুখের দিকে তাকায়। হাম্মাদ এই হতাশার অর্থ বুঝতে পারে। তার মুখমন্ডলে দ্বীপ্তির রেশ।

সেখানে জমে ওঠে রক্তের স্রোত। সে লৌহগুর্জ মাটিতে ফেলে দেয়। আপাদমস্তকে খেলে যায় বিদ্যুৎচমক। উল্কাপিন্ডের মত সে পাথরটির দিকে অগ্রসর হয়। ঝুঁকে প্রথমে পাথরটির ওজন আন্দায করে হাম্মাদ। দু'হাতে জাপটে ধরে পাথরকে। পরে আল্লাহু আকবর বলে পাথরটিকে কাঁধে তুলে নেয়। বৃদ্ধ খালদূনের চোখেমুখে বিস্ময়ের দ্যুতি। তিনি অগ্রসর হয়ে হাম্মাদের মুখে থুথু লেপ্টে দেন, যাতে ওর ওপর কারো বদ নযর না পড়ে। পাথরটি উঁচিয়ে হাম্মাদ বয়লারের কাছে নিয়ে যায়। হারেস ও খালদূন বিস্ময়াভিভূত হয়ে তা দেখে। এভাবে দিনের পর দিন হাম্মাদ ও হাসের কাজ করে যেতে থাকে আর ওদের বাবা দিক-নির্দেশনা দিয়ে যান। দুপুরের দিকে ওরা বয়লার ভরে ফেলে। ওরা বাবার কাছে এসে দাঁড়ায়। বাবা ওদের দেহে স্নেহ পরশ বুলান এবং দেহ থেকে ধুলা ঝাড়েন। দু'ভাই পতিত নয়া কাপড় উঠিয়ে পরিধান করেন। হারেসের জামা উটের চামড়ার আর হাম্মাদেরটা চটের। চটের মধ্যে পশম ঢুকিয়ে মোটা করেই হাম্মাদ পরিধান করে। হাম্মাদ লোহার গুর্জ কাঁধে ওঠায় এবং বাবার সাথে বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে।

তিন বাপ-বেটা ওদের বসতি সুমরাবাদ–এ উপনীত হয়। নিশাপুর থেকে ফার্লং চারেক দূরে পাহাড়ী উঁচু নীচু উপত্যকায় ওদের বাস। পাহাড় কেটে তৈরি করা ওদের শান্তির নীড়। ওই নীড়ে জনৈকা নারী ওদের খাদ্য রান্না করছিল। ইনি খালদূনের স্ত্রী যাবীব, হাম্মাদ ও হারেসের মা। ওদের দেখামাত্রই পতিত লাঠি উঠিয়ে তাতে ভর করে অভ্যর্থনা জানালেন। একে একে বাচ্চাদের গালে মুখে এঁকে দিলেন বাৎসল্যের চুম্বন। পরে নিয়ে গেলেন ভেতরে। পরিবেশন করে যেতে লাগলেন নিজের হাতে খাদ্য-খাবার।

খানা খেয়ে খানিক ওরা আরাম করল এরপর আদায় করল জোহরের নামায। হাম্মাদ এল মায়ের কাছে। মা ওর জন্য উঠানে অপেক্ষা করছিলেন। ও আসতেই মা ওর পীঠে চাপলেন। হাম্মাদ তার লাঠি মুঠে চেপে ধরল। মাকে পীঠে করে হাম্মাদ পাহাড়ের নীচে নেমে গেল। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে যাওয়া জলপ্রপাতে তাকে গোসল করাতেই ওর এই নেমে যাওয়া। এদিকে হারেস ও খালদূনও ওদের সাথে নেমে এলেন। হাসের ও হাম্মাদ মায়ের পা ধোয়াতে ব্যপৃত হল।

এক সময় ওরা লক লকিয়ে ওঠা গম-ক্ষেত দেখতে বেরুল। এ জমি ওদের। জমির আশে পাশে দেবদারু ও পাইন গাছ আছে দু'চারটা। এছাড়া এ ক্ষেত্রের অদূরেই ওদের রয়েছে ফলের বাগান, আঙ্গুর, বেদানা, পেস্তা বাদাম আর কতশত বৃক্ষ।

২.

ঘোড়ার খুড় ধ্বনীতে খালদূন ও হারেস চমকে ওঠল। গমের ক্ষেত থেকে কাজ ফেলে ওরা উঠে দাঁড়াল। গিরিপথ দিয়ে দ্রুতগামী দু'টি ঘোড়ার পিঠে দু'সওয়ারকে

এগিয়ে আসতে দেখা গেল। নিশাপুরের রাজপথ ছেড়ে ওরা এ পথ ধরেছে। ক্ষেতের পাশে এসে এক লাফে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল তারা। খালদূন ও হারেস আগ বেড়ে আগন্তুকদ্বয়ের সাথে মোসাফাহা করল। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল এরা বাপ-বেটা উভয়ের সাথে পূর্ব পরিচিত। এরা সেই আগন্তুক যারা হাসানের গ্রেফতারী সংবাদ নিয়ে এসেছে। ওরা কিছু বলার পূর্বেই খালদূন বলে উঠলেন, আমার বেটা হাসান কৈ? তাকে দেখছিনা যে! ও তোমাদের সাথে এলনা কেন?'

এ প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে আগন্তুকদ্বয় জিজ্ঞাসা করল, 'হাম্মাদ কোথায়?'

গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন খালদূন। বললেন, 'ওর মাকে গোসল করাতে জলপ্রপাতে গেছে।

'আমরা আপনাদের জন্য কোন সুখকর খবর নিয়ে আসতে পারিনি। হিরাতের গভর্নর নাসীরুদ্দীনের বন্দী দশায় হাসান।'

কথা শেষ না করতে দিয়ে মাঝপথে বাকরুদ্ধ খালদুন প্রশ্ন করেন, 'কেন? কেন? আমার বেটাকে সে গ্রেফতার করতে যাবে কেন?'

আগন্তুকদ্বয় মুখ গোমরা করল। তাদের একজনে হতাশাগ্রস্ত কণ্ঠে বলল, তিনি এর কোন কারণ ব্যক্ত করেননি। মনে হচ্ছে শক্তিধর কোনো যুবরাজের সন্ধানে নেমেছেন তিনি। তার থেকে অতি গুরুত্ব কোন কাজ নিতে চান। হাসানকে এ উদ্দেশ্যে তিনি আটকে রেখেছেন হয়তবা। তিনি বলেছেন, ভাইকে ছাড়িয়ে নিতে হলে হাম্মাদকে আসতে বলো।'

'নাসীরুদ্দীন এক্ষনে কোথায়? কোথায় আমার পুত্রকে বন্দী করে রেখেছে?'

'তোয়ালুক শহর থেকে উত্তরে পাহাড়ী অঞ্চলে তাকে একটি হাবেলীতে আটকে রেখেছে।'

'এসো! বসো। আমি তোমাদের খানার এন্তেজাম করি। আর খবরদার! এ কথা হাম্মাদের কানে দিও না। তাহলে সে অগ্নিশর্মা হয়ে যাবে। নাসীরুদ্দীনের ওপর সিরিয়াস প্রতিশোধ নেবে, যেটা আমাদের জন্য বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে।' আগন্তুক ঘোড়ায় চেপে বলল, 'আমরা আপনাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমরা এখানে অবস্থান করতে আগ্রহী থাকলেও দ্রুত ফিরতে হবে যে। কাজেই মন চাইলেও আপনার খানা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারছি না।

সওয়াররা ঘোড়ায় চাপতে যাবে এমন সময় একটি জলদগম্ভীর স্বরে সকলে চমকে ওঠে। 'কৈ যাও! দাঁড়াও! তার কথা দ্বারা বোঝা যায় সে সব কথা শুনে ফেলেছে। 'আমার কথার উত্তর দাও! নাসীরুদ্দীন আমার ভাইকে কোথায় আটকে রেখেছে?

আগন্তুকদের একজনে জবাব দেয় "আমরা তিনজন বাড়ী অভিমুখে ছুটছিলাম শহর থেকে খানিক দূরে এক স্থানে ফজরের নামায আদায় করে পুণরায় ঘোড়ায়

চাপি। এ সময় নাসীরুদ্দীনের টহলদার বাহিনীর ১০/১২ জন আমাদের ঘিরে নেয় এবং গ্রেফতার করে তোয়ালুক নিয়ে যায়। নাসীরুদ্দিনের হাবেলীতে হাসান বন্দী। ওই হাবেলীর বাইরে একটি প্রকান্ড বৃক্ষে বাধা ছিল রশি। হাসানের বীরত্ব পরীক্ষা হেতু নাসীরুদ্দীন ওই রশি ছিড়তে বলেন। হাসান হয় ব্যর্থ। ওকে আটকে রেখে তোমার বীরত্বের কথা শুনতে পায়। বলে, বীর হলে তুমি যেন তোমার ভাইকে উদ্ধার কর। আমরা আমাদের দায়িত্ব শেষ করলাম। এবার অনুমতি চাইছি ফিরে যাওয়ার। আগন্তুকদ্বয় ঘোড়ার পিঠে করে অদৃশ্য হয়ে যায়। এদিকে হাম্মাদ তখন হয়ে পড়ে গুরু গম্ভীর। মনের জগদ্দল পাথর সড়াতে চেষ্টা করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে। পীঠে বসা মাকে সে বাড়ীতে নিয়ে যায়। খালদূন ও হারেস ক্ষেতের কাজ ফেলে ওর পিছু নেয়। মাকে ঘরের আঙিনায় নামায় হাম্মাদ। তিনি লাঠি ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালে হাম্মাদ বিনয়ের সুরে বলে, 'মাগো! আমায় অনুমতি দিন ভাইকে ছাড়িয়ে আনব। বন্দীদশায় ও আমাকে ডেকে ফিরছে। আমি না গেলে কে ওকে মদদ করবে। ও আমার ভাই। আমার অস্তিত্বের একাংশ।

মা ওর পীঠ চাপড়ে বলেন, 'অবশ্যই যাবে বেটা। হাসানকে যেভাবে পার উদ্ধার কর। তবে ঝগড়া-ফাসাদে যেন না জড়াও খেয়াল রেখ। হাসান কোন অন্যায় না করে থাকলে হিরাতের গভর্নর তাকে আটকে রাখবেন না। বাবা! তুমি আমার বংশের বাতি। জলদী ফিরে এসো। তোমার অপেক্ষায় থাকব আমি। আমার নসীহত ভুলো না যেন। সর্বদা নিজের মায়ের আদেশ শিরোধার্য করো। আল্লাহ তোমাকে হার ময়দানে কামিয়াব করবেন। সফলতার পত্র পুষ্পে পল্লবিত হবে তোমার চলার রাহা।'

হাম্মাদ রওয়ানা করবে এমন সময় দেখল খালদূন ও হারেস এসে হাজির। বুড়া খালদূন বাৎসল্য গদগদকণ্ঠে বলেন, বেটা! জানি তুমি পরিকল্পনা করেছ। ভাবছি, হাসানকে ছাড়িয়ে আনতে আমি গেলে কেমন হয়। তবে তোমাকে যেতে এক্ষনে বাধা দেব না। জানি, আমি গেলে তুমি দুঃখ পাবে। তাই আমি যাব না। তোমার সাথে যাবে হারেসও। শোন! তোমরা আমার ঘরের চেরাগ। এ ঘরে তোমরা ছাড়া আর কেউ নেই যাদের নিয়ে আমরা বাঁচার স্বপ্ন দেখতে পারি। তোমরাই আমাদের চোখের মনি, অন্ধের যষ্ঠি। যাও বাবা তোমরা। আমরা তোমাদের তিন ভাইয়েরই পথ চেয়ে থাকলাম।'

ঘর থেকে বেরিয়ে আস্তাবলের দিকে এগিয়ে গেল হাম্মাদ-হারেস। ওখানে গোটা তিনেক ঘোড়া বিক্ষিপ্ত বাধা। দু'ভাই দুটি ঘোড়ায় জিন কষল। পরে দু'জনে অস্ত্রাগারে গিয়ে অস্ত্র সজ্জিত হয়ে এল। হাম্মাদ চটের পোষাক পরে নিল। এর ওপর পরল বর্ম। সর্বপরি আরবী আচকান জড়াল। মাথায় হেলমেট। লোহার কড়া তাতে উঁচানো। খাপে সুতীক্ষ্ম ধার তলোয়ার। ঝোলায় মজবুত জংগী তীর। কাঁধে ঘোড়ার খর্জুন (ঝোলা)। হারেসও এই সাজে সজ্জিত। জংগী হাতিয়ার ওরা ঘোড়ার পিঠে রাখল। সেই সাথে আস্তাবলে রাখা তুনভর্তি তীর নিতেও ভুলল না। ঘোড়ায় চেপে

আস্তাবল থেকে বেরোতে গিয়ে দেখল ঘরের দরোজায় মা কোরআন উঁচিয়ে দাঁড়ানো আর বাবা খালদূন পথ খর্চার সামান্য কিছু অর্থ নিয়ে ওদের অপেক্ষায়। ওরা নিকটে এলে খালদূন জিনিষ দু'টি ঘোড়ার খর্জুনে ঢুকিয়ে দেন। আগে বেড়ে উভয়ের মুখে এঁকে দেন আখেরী চুম্বন এবং কামনা করেন সফলতার। মা বলেন যাও বাবা! আর দেরী নয়-খোদা হাফেয। ঘোড়ার নিতম্বে আঘাত করে দু'ভাই গিরি পথের দিকে এগোয়। ঘোড়া ছুটে চলে উর্ধ্বশ্বাসে। তোয়ালুক ওদের গন্তব্য যেখানে বন্দী ওদের হাসান।

৩.

কোন এক সকালে হাসান দোয়া করছিল। এমন সময় ১০/১২ জন সওয়ার হাবেলীতে প্রবেশ করল। ও মনে করল, হাম্মাদ বুঝি এসেছে। জলদি দোয়া খতম করে ও বাইরে এলো। দেখল নাসীরুদ্দীন ওদের সাথে কথা বলছেন। হাসানের মুখ কালো হয়ে গেল। কেননা আগন্তুকদের মাঝে হাম্মাদ নেই। আগন্তুকরা নানা কথা বলে যে পথে এসেছিল সে পথেই বিদায় নিল। হাসান লক্ষ্য করল, সওয়াররা চলে যাবার পর নাসীরুদ্দীনের চেহারায় হতাশার ভাব ফুটে ওঠল। হাসান আস্তে আস্তে তার কাছে এগিয়ে এল। বিনয়ী সুরে বলল, 'ওরা আপনার জন্য বেদনাদায়ক কোনো সংবাদএনেছে বুঝি?'

নাসীরুদ্দীন ওর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলেন, 'তোমার অনুমান যথার্থ। এরা জাইহুনের তীর থেকে এসেছে। ওখানে সুলতান শেহাবুদ্দীন ঘুরী ও খারযামের সুলতান শাহের সাথে অনবরতঃ লড়াই লেগেই আছে। ওরা মুহাম্মদ ঘুরীর পয়গাম আমার কাছে নিয়ে এসেছিল। দুঃখজনক একটি ঘটনার পাশাপাশি তিনি আমার কাছে সৈন্য ও রসদ চেয়েছেন।'

'কি সেই দুঃখজনক দুঃসংবাদ?'

'এক যুদ্ধে খারযামের সুলতান শাহ আমাদের এক অভিজ্ঞ জেনারেল কুতুবুদ্দীন আইবেককে গ্রেপ্তার করে লৌহপিঞ্জরে বন্দী করে রেখেছেন।'

হাসান খানিক সাহস করে বলল, 'এটা আমাদের জন্য লজ্জাজনক নয় কি যে, মুসলমানরা আজ একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামছে! গযনীর সুলতান শেহাবুদ্দীন আর খারযামের সুলতান শাহের একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই, ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ নয় কি।'

'সীমান্তের মামুলী ব্যাপার নিয়ে তাদের মাঝে লড়াই বেধেছে। কিছুদিনের মধ্যে আশা করি এ লড়াই থেমে যাবে। এর পরেই মুহাম্মদ ঘুরী হিন্দুস্তানে মনোনিবেশ করবেন। আজ সন্ধ্যা নাগাদ তোমার ভায়ের অপেক্ষা করব। সে এসে গেলে আমাদের দু'জনার ভাগ্যই সেক্ষেত্রে সুপ্রসন্ন বলতে পার। নয়ত কাল অতি ভোরেই

আমরা হিরাতের উদ্দেশে রওয়ানা হব এবং ওখান থেকে কমান্ডো নিয়ে ছুটব জাইহুনের তীরে। ওখানে মুহাম্মদ ঘুরী একসাথে দু'টো যুদ্ধ করে চলেছেন। আশা করি তুমিও ওই যুদ্ধে আমাদের সঙ্গ দেবে।' বললেন নাসীরুদ্দীন।

'শেষবারের মত আজো আমাকে ওই রশি টেনে শক্তি পরীক্ষায় নামতে দিবেন কি! হতে পারে আমি আজ ওটা টেনে ছিড়তেও পারি।' বলল হাসান।

নাসীরুদ্দীন খুশী গদগদকণ্ঠে বললেন, 'দাঁড়াও! আমি ব্যবস্থা করছি।'

হাবেলীর ভেতরে চলে গেলেন তিনি। খানিকবাদে এলেন ফিরে। সাথে তার সেই দেহরক্ষী বাহিনী যারা হাসানকে ধরে এনেছিল। ওদের হাতে প্রকান্ড সেই রশি।

বিশাল সেই বৃক্ষের নীচে এসে দাঁড়াল হাসান। রশির কাছে দাঁড়িয়ে নাসীরুদ্দীন বললেন, 'খালদূনের বেটা হে! আজ এ রশি ছিড়তে পারলে মনে করব মহান উদ্দেশ্য সাধনে সত্যিই তুমি পারঙ্গম। রশি হাতে নিয়ে হাসান চমকে ওঠল। আশপাশের কি এক শব্দে ওর চোখ কান খাড়া হলো। পাষাণ পাহাড়ী অঞ্চলে কি এক ভয়ানক প্রতিধ্বনী ওর কানে খুশীর সংবাদ বয়ে আনল। সেই সাথে নাকারাধ্বনি ওর মনে ধুক ধুকুনি আনল। অবলীলায় ওর মুখ থেকে বেরোল, শোন! নাকারার আওয়াজ শোন। শুনে নাও! আমার ভাই হাম্মাদ বিন খালদূন এল বলে। কসম খোদার! এমন নাকারা সে ছাড়া আর কেউ বাজাতে পারে না। আমাকে ডাকছে সে!'

থামল হাসান। খানিক দম নিয়ে আবার বলা শুরু করল, শুনুন নাসীরুদ্দীন সাহেব! নাকারার এই আওয়াজ আমার ভাইয়ের। পর্বত শৃঙ্গের নিভৃত প্রকোষ্ঠে দাঁড়িয়ে তিনি এ বাঁশি বাজাচ্ছেন। এই বাঁশির সুরে তিনি কি বলতে চাইছেন জানেন কি? তিনি বলছেন, হাসান তুমি কৈ?'

নাসীরুদ্দীনের দেহরক্ষী বাহিনী এ আওয়াজ শুনল। আওয়াজ পাষাণ পাথুরে হিল-এ ভয়াবহ গুঞ্জন করে ফিরছে।' আপনার ঘোড়ার দিকে দৌড়ে গিয়ে হাসান বলল, ' দাঁড়ান। আমার বাঁশি বাজিয়ে আমার ভাইকে জবাব দিচ্ছি যাতে সে আমার অবস্থান জানতে পারে।

ঘোড়ার পিঠে ওঠল হাসান। জিন থেকে বাঁশি বের করল এবং প্রচন্ড শক্তিতে তাতে ফুঁ দিল। বাঁশি মুখ থেকে নামাতেই গোটা প্রকৃতিতে পীন পতন নিস্তব্ধতা নেমে এল। হাসানের জবাবে অপর প্রান্ত বিলকুল খামোশ যে। খানিকবাদে ঘোড়ার অনবরত খুরধ্বনিতে পর্বতাঞ্চল কেঁপে ওঠল। কিছুক্ষণের মধ্যে হাম্মাদ ও হারেস ঘোড়া হাঁকিয়ে এগিয়ে এল।

এদের দেখেই হাসানের চেহারায় আনন্দদ্যুতি খেলে গেল। ময়দানে এসে চক্রাকারে ঘোড়া ঘুরাল হাম্মাদ। ওর প্রচন্ড লাগাম কষার সাথে ঘোড়া পূর্ব হতেই অভ্যস্ত। কাজেই সামনের দু'পা উঁচিয়ে প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে হ্রেষাধ্বনি করে ওঠল। ঘোড়া থেকে নেমে হাম্মাদ হাসানের বুকে মিশে গেল। পরে পালা হারেসের। প্রাথমিক মোলাকাত শেষে নাসীরুদ্দীনের দিকে ইশারা করে হাসানকে জিজ্ঞাসা করল

হাম্মাদ, 'আমার দৃষ্টি প্রতারণা না করলে ইনিই বোধহয় হেরাতের গভর্নর নাসীরুদ্দিন যিনি তোমাকে বন্দী করে রেখেছেন?'

হাসান লাজনম্র কণ্ঠে বলল, 'ভাইয়া সত্যি বলতে কি উনি আমাকে বন্দী করে রাখেন নি। আমাকে সাময়িক নযরবন্দী করে রাখার উদ্দেশ্য হলো এমন এক যুবরাজকে খুঁজে ফেরা যে ভারতবর্ষে মুসলিম জাতি ও ধর্মের সেবা করতে পারেন। সেই যুবরাজ নির্বাচনের পদ্ধতি হলো, এই রশিটি টেনে ছিড়ে ফেলা। ভাইয়া! ইসলামকে সবার উপরে তুলে ধরতেই শক্তিশালী এক যুবরাজকে তিনি চাচ্ছেন। আমি ভাগ্য যাঁচাই করে দেখেছি তবে প্রতিবারই হয়েছি বিফল। আজো এসেছিলাম সে উদ্দেশে, কিন্তু আপনার বাঁশির খোজারু আওয়াজ সে কাজে বাদ সেঁধেছে। আমি আরেকবার ভাগ্যটা যাঁচাই করে দেখতে চাই। কি জানি সফল হলে হতেও পারি।'

হাসান রশির দিকে এগিয়ে গেল। নাসীরুদ্দীন হাম্মাদ ও হারেসের সাথে মোসাফাহা করে বললেন, ' তোমরা দু'জন নিশ্চয়ই ওর গর্বিত বড় ভাই। এই উপত্যকা তোমাদের জানাচ্ছে খোশ আমদেদ। থামলেন নাসীরুদ্দীন, কেননা হাসান রশি নিয়ে বলপ্রয়োগ করছে। কিন্তু সে এবারও ব্যর্থ। এক সময় বাধ্য হয়ে রশি ছেড়ে দিল। ভাইদের কাছে এসে বিফল ও অসহায় নজরে তাকাল।

হারেস নামল সৎসাহস নিয়ে। শক্তির শেষবিন্দুটুকু খর্চা করে সেও হাসান সাজল। ওদেরসহ সকলের দৃষ্টি এবার হাম্মাদের প্রতি পতিত হল। শান্ত নদীটির মত হাম্মাদ দাঁড়িয়ে। শক্তিআভা উছলে উঠছিল ওর চোখেমুখে। রশির কাছে গিয়ে চটের আচকান যমীনে ছুঁড়ে মারে হাম্মাদ। আচকানের নীচ থেকে চকচক করে ওঠে ওর দেহে সাঁটা বর্ম। তাচ্ছিল্যপূর্ণ দৃষ্টিতে নাসীরুদ্দীনের দিকে তাকিয়ে হাম্মাদ বলে ওঠে, 'জনাব! আমার দু'ভাইয়ের শক্তি পরীক্ষার মুখে রশি বেচারা দুর্বল হয়ে পড়েছে। কাজেই আমার বজ্রমুষ্টির টান সহ্য করার শক্তি নেই ওর। যদি কোন নতুন রশি যোগাড় করতেই না পারেন, তাহলে না হয় একেই দু'ভাগ করে দিন এবং দেখুন আমার বাহুর শক্তি।'

নাসীরুদ্দীন প্রীতিভরে, বলেন, 'রশিটা দুর্বল নয় বাপধন! ওটাকেই ছিড়তে পারলে মনে করব শর্ত পুরা করতে পেরেছ।'

'না না। তাহলে একেই দু'তা করেই পেঁচানো হোক। আমি দুর্বল রশি ছিড়ে আমার শৌর্যবীর্যকে খাটো করতে চাইনা।' বলল হাম্মাদ।

নাসীরুদ্দীন বাধ্য হলেন রশিকে দু'তা করে দিতে।

হাম্মাদ অগ্রসর হোল। যেন আলবুর্জ পাহাড় এগিয়ে আসছে। রশি বুকে পেঁচিয়ে দু'বগলের নীচ দিয়ে পেঁচিয়ে হাটুগেড়ে বসে গেল। আসমানের দিকে তাকিয়ে ও দু'হাত উঠিয়ে দোয়াচ্ছলে বলল, 'আয় আল্লাহ! শক্তির যাবতীয় গুনগান তোমার। ভুল-ত্রুটি থেকে তুমি পবিত্র। তোমার কুদরতী কৌশলের সম্মুখে আমরা অসহায়। এ ব্যাপারে অভিযোগ ঠোকার মতও কেউ নেই। আয় মাওলা। তুমিই তো সেই যে

মুকুটধারীকে ধুলোয় নিক্ষেপ করে থাকো। আমার মনোবাঞ্ছাপূর্ণ কর হে মহামহীম। আসন্ন পরীক্ষায় আমাকে উৎরে যেতে দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমার মজবুত বুর্জ ও দুর্গম প্রান্তর। আমার ওপর সদয় দৃষ্টি রাখো। আমায় শক্তি দাও প্রভু। বাযুর শক্তি বাড়াও।'

দোয়া শেষ করে হাম্মাদ উঠে দাঁড়াল। ওর অবয়বে কিছু একটা করা করার, সবাইকে তাক লাগানোর অভিব্যক্তি। শেরদিল জোয়ানের চোয়াল দুটো শক্ত হচ্ছে। ঝড়ের পূর্বাভাস ওর চোখে মুখে। সেই ঝড় পাহাড়কে করতে চাচ্ছে টুকরো টুকরো। এক দু'সাহসিক অধ্যায়ের জন্ম দিয়ে সে দু'হাতে রশি নেয়। ওর বাযু লৌহদন্ডের রূপ নেয়। চোখ থেকে বেরোয় কাচা ঘুমভাঙ্গা শার্দুলের চাহনি। 'আল্লাহু আকবর' বলে ছাড়ে বজ্র হুংকার। সে হুংকার ইথার তরঙ্গ ভেদ করে পাহাড় তোলে প্রতিধ্বনি। মুহূর্তেই কাট কাট করে পেঁচানো দু'তা রশি ছিড়ে দু'ভাগ হয়ে যায়।

ঘটনার আকস্মিকতায় নাসীরুদ্দীন হতভম্ব হয়ে যান। সম্বিত ফিরে পেয়ে তিনি দৌড়ে এসে হাম্মাদকে জড়িয়ে ধরেন। বললেন, কসম খোদার! তুমিই সেই যার তালাশে ছিলাম আমি। কুদরত তোমাকে জাতির এক মহান খেদমতের জন্য নির্বাচন করেছেন। গতকালও ভেবেছিলাম, আগামীকাল এখান থেকে রওয়ানা করব। কিন্তু তোমার বীরত্বে আজ সে সিদ্ধান্তে বদল আনতে হলো। আজই আমি হিরাত যাচ্ছি, সেখান থেকে কমান্ডো নিয়ে উপনীত হব জাইহুনের তীরে। ওখানে এখন মুহাম্মদ ঘুরী খিমা ফেলেছেন। তুমিও আমার সাথে যাবে এবং চলন্তি যুদ্ধে হিস্যা নেবে। এতে ফায়দা হবে দুটি। এক. আমরা তোমার জঙ্গী কৌশলের দিকটা আন্দাজ করতে পারব। দুই. ঘুরীর সাথে তোমার পরিচয় করিয়ে দিতে পারব। এই যুদ্ধ শেষে তোমাকে প্রেরণ করব ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্দ ভারতবর্ষে।

কিছুদিন হলো তোমারই মত এক নওজোয়ানকে হিন্দুস্থানে মুসলিম গোয়েন্দা প্রধান করে প্রেরণ করেছিলাম। কয়েকমাস কাজ করেই সে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। আমার শংকা, তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ওখানে কর্মরত মুসলিম গোয়েন্দারা তাকে খুজে ফিরছে। হিন্দুস্থানে সর্বপ্রথম তোমার কাজ হবে আইলাক খানকে খুঁজে ফেরা। তাকে জীবন্ত খুঁজে পেলে তুমি তার নেতা হবে আর সে তোমার অধীনস্ত। সে শহীদ হয়ে থাকলে তুমিই চৌকসভাবে নেতৃত্ব দেবে। তোমার দ্বিতীয় কাজ, হিন্দুস্থানী রাজাদের সৈন্যবল ও তাদের যুদ্ধপারঙ্গমতার কথা আমাদের কাছে পেশ করা। কেননা মুসলমানরা খুব শীঘ্রই হিন্দুস্থানে হামলা করতে যাচ্ছে। নিশাপুর ও হিন্দুস্থানের পথে তোমার আমার যোগাযোগ রক্ষার জন্য দ্রুতগামী [illegible] ঘোড় সওয়ার থাকবে। ওরাই যে কোন সংবাদ যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি আমাদের গোচরে আনবে। রওয়ানা দেবার পূর্বে তোমাকে সবকিছু বুঝিয়ে দেব। বুঝিয়ে দেব হিন্দুস্থানে তুমি কার কার সাথে মিলিত হবে। কে কে ওখানে আমাদের নির্ভরযোগ্য গোয়েন্দা এবং তাদের পূর্ণ ঠিকানাও।'

নাসীরুদ্দীন খামোশ হলে হাম্মাদ বলল, আমার বাবা বুড়া, মা পক্ষাঘাতগ্রস্থ। বোন নেই। নেই তার সেবা করার মত কেউ। আমিই তার সেবা যত্ন করে থাকি। সর্বাগ্রে আমি বাড়ী যেতে চাই। বাবা-মার অনুমতি পেলে যথাশীঘ্র আপনার খেদমতে উপস্থিত হব। তাঁরা বেকে বসলে আমার কিছু করার থাকবে না।'

'আমি কিছুক্ষণ পরে এখান থেকে হিরাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হচ্ছি। ওখান থেকে কমান্ডো নিয়ে জাইহুনের উদ্দেশে ছুটব। পথিমধ্যে নিশাপুর পড়বে। ওখানে যাত্রাবিরতি করে তোমার বাবা-মার থেকে অনুমতি নিয়ে নেব। তোমাকে ছাড়াও হাসান ও হারেসকে সেনাবাহিনীতে ঢুকাতে চেষ্টা থাকবে আমার।' বলে নাসীরুদ্দীন খামোশ হয়ে গেলেন। সকলে চলল হাবেলীর দিকে। খানিক বাদে তিনি ওদের তিন ভাইকে নিয়ে হিরাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

৪.

সন্ধ্যার ছায়া পরিবেশকে ছেয়ে নিয়েছে।

রাতের কালো পর্দা সুন্দর পৃথিবীর মুখে কালিমা এনে দিয়েছে। চন্দ্রালোককে ঘিরে রয়েছে হালকা মেঘমালা। ঝাকছাড়া নীড়হারা বিহঙ্গকুল ফিরে চলছে নীড়ে। মিটমিট করে দুটি তারকা চন্দ্রকলার আশে-পাশে জ্বলছে। মান-অভিমানে ভরা দুটি প্রাণীর মত ওগুলো ছুটছে এদিক ওদিক।

বাদ এশা খালদূন ও যাবীব বসেছিলেন, আচমকা তিনি স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন, যাবীরা যাবীরা! শোন শোন! এ আওয়াজটা লক্ষ্য করে শোন।'

যাবীরের চেহারায় খুশীর নহর বয়ে চলল। তিনি মুচকি হেসে বললেন, 'আমি অশ্ব খুড়ধ্বনি শোনতে পাচ্ছি। আওয়াজটা ক্রমশ আমাদের হাবেলীর দিকে ছুটে আসছে। মন বলছে, আমাদের বাপধনরা আসছে।

খালদূন দাঁড়িয়ে বললেন, 'দাঁড়াও! দেখছি কারা এলো। বাপধনরা হলে হাবেলীর বাইরে গিয়েই ওদের অভ্যর্থনা জানাব।' তিনি সহসাই বাইরে ছুটে গেলেন।

খানিক বাদে। পাহাড়ের চূড়ে তিন সওয়ারকে দেখা গেল। এর কিছুপরে এরা খালদূনের সামনে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। ওরা হাম্মাদ, হাসান ও হারেস। বাবা অগ্রসর হয়ে সকলের সাথে মোয়ানাকা করলেন এবং সবশেষে গেলেন ভেতরে নিয়ে। উঠানে ঘোড়া রেখে ওরা মায়ের সামনে এসে দাঁড়াল। মায়ের চেহারায় পূর্ণিমা শশীর ঝলক। তিনি সকলকে ডেকে পাশটিতে বসালেন। খালদূন বললেন, 'তোমরা তোমাদের আম্মিজানের সাথে কথা বলো, আমি ঘোড়াগুলো আস্তাবলে রেখে আসি।

হাম্মাদ ফওরান দাঁড়িয়ে বাবার হাত মুঠে পুরে পাশে বসতে বলল। মিনতিঝরা কণ্ঠে বলল, 'আপনি বসুন! আমি আপনাদের থেকে বিদায় নিতে এসেছি।'

মা চকিতে প্রশ্ন করলেন 'বিদায় নিতে এসেছ? তার মানে?'

বাবা বললেন, 'তুমি না হাসানকে নিয়ে এলে মাত্র। তা এক্ষনে কোথায় যাবে?

হাম্মাদ প্রথমে হারেস ও হাসানের দিকে তাকাল বড় চোখ করে। পরে বলল, 'নাসীরুদ্দীন আমাকে তার সেনাদলে দলভুক্ত করে মুহাম্মদ ঘুরীর হয়ে ভারতবর্ষে গোয়েন্দাবৃত্তিতে প্রেরণ করতে চান। ওখানকার রাজ-রাজড়াদের প্রতিরক্ষা শক্তির তথ্যোদ্ধারই আমার প্রধান কাজ। মুহাম্মদ ঘুরী খুব শীঘ্রই ভারত আক্রমণ করবেন। তিনি হারেস ও হাসানকেও ফৌজে ভর্তি করাতে চান।'

বৃদ্ধ খালদূন পুত্রের কথার মাঝপথে বললেন, 'তুমি যে মিশন নিয়ে ভারত যাচ্ছ তাতে ইসলাম প্রচারের দিকটা আছে কি?'

হাম্মাদ মুচকি হেসে বলল, 'আব্বাজান! মুহাম্মদ ঘুরী ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যেই ভারতবর্ষে হামলা করছেন।

'ব্যাপারটা এমন হলে শোন, তুমি ও হারেস ফৌজে ভর্তি হতে পার কিন্তু হাসান আমাদের সাথে থাকবে। তোমাদের অনুপস্থিতিতে ও-ই তোমার মায়ের দেখভাল করবে। এছাড়া সঙ্গ দেবে ক্ষেত-খামারে আমার সাথে।' বললেন সিদ্ধান্তমূলক উত্তরে বাবা খালদূন।

হাম্মাদ মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আম্মিজান। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?'

মা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'তোমার বাবার মতকেই আমি সমর্থন করছি।'

এবার ও বাবার কাছে মিনতি করে বলল, 'আব্বাজান! আমাকে কিছু নসিহত করুন!'

বাবা খামোশ হয়ে গেলেন। কামরায় ছেয়ে গেল নিস্তব্দতা। ঝুকানো মাথা উঁচিয়ে তিনি হাম্মাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেটা! খোদার দুশমনের সাথে মোকাবেলায় নামলে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করবে। দুশমনের সাথে মোকাবেলা ক্ষণে তোমার চোখে নিদ্রা তো দূরে থাক তন্দ্রাও যেন না আসে। তোমার কাঁধে কোন ফৌজি জিম্মাদারী চাপলে অধীনস্তদের সাথে শান্ত নদীটির তীরে দাঁড়ানো সবুজ বৃক্ষটির মত সঞ্জীব সমীরণ বিলানোর ব্যবহারটি করো।

খালদুন খানিক থেমে ফের বললেন, বেটা। ঘুমানোর দ্বারা যেমন রাত সংক্ষিপ্ত হয়ে যায় না তেমনি ভুল কাজের দ্বারাও দিনকে সংকুচিত করা যায় না। যুদ্ধের ময়দান মরণপণ লড়াইয়ে ব্রতী থেকো। কাফেরের মোকাবেলায় ইস্পাত-কঠিন মনোভাব দেখিও। বেটা! মনে রেখ যেখানে নমরূদের অগ্নিকুন্ড থাকে ওখানে আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহীমের ঈমানও তৈরি করে রাখেন। ইসলাম প্রচার জীবনের ব্রত বানিয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে বজ্র বিভীষিকা কায়েম করতে পারলে আমি কসম করে বলতে পারি দুর্গম পাহাড়ও তোমার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

আবারো থামলেন বৃদ্ধ খালদূন। তার চোখেমুখে রৌশনি। বলেন, বেটা! প্রশান্তিময় আত্মা জীর্ন হাড্ডির মাঝে জাগরণ আনতে পারে। তনুমনকে সর্বদা জাগ্রত রেখো। আর হ্যাঁ! তুমি এ ঘরের প্রদীপ। আমি ও তোমার মা সন্ধ্যা-সকালের প্রতিটি ক্ষণে তোমাদের দু'ভায়ের সাফল্য কামনা করব। আচ্ছা তোমরা দু'ভাই এখনই কি মকানত্যাগ করবে?

ঝুকানো মাথা উঁচিয়ে হাম্মাদ বললো, 'হিরাতের গভর্নর নাসীরুদ্দীন সুলতান মুহাম্মদ ঘুরীর সাহায্যার্থে একদল সৈন্য নিয়ে এখান থেকে যাচ্ছেন। আমরা দু'ভাই তাঁর দলে ভিড়ব। তিনি বড় পাহাড়ের পাদদেশে আমাদের অপেক্ষা করছেন। আপনাদের অনুমতির জন্য তিনি আমাদের ছেড়েছেন। বলেছেন, আপনাদের অনুমতি না পেলে তিনি নিজেই আমাদের অনুমতি দেয়ার জন্য আপনাদের স্মরণাপন্ন হবেন।'

খালদূন চকিতে বললেন, 'তাহলে আর দেরী কেন বাবা! দ্রুত ওদের সঙ্গ দাও। তোমাদের দেরী দেখে ওরা না আবার ভেবে বসে যে, আরবের জোয়ানরা ইসলামী খেদমত থেকে বঞ্চিত হতে চায়।'

হাম্মাদের জবাব দেয়ার পূর্বে মা উঠে বললেন, 'খানিক দাঁড়াও বেটা! আমি এই আসছি।' বলে তিনি ঠক্ ঠক্ করে লাঠি ভর দিয়ে ওপাশের কামরায় চলে গেলেন। এদিকে হাম্মাদ হারেসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি আমাদের ঘোড়া দু'টো বের করো। আমি আসছি।' খালদুন, হারেস ও হাসান বেরিয়ে গেল। হাম্মাদ গেল তার ব্যক্তিগত অস্ত্রাগারে। সেখান থেকেও তুলে নিল ভারী গুর্জ। খর্জুনে নিল লৌহ দস্তানা। হাতে নিল মোটা ক'গাছি রশি। এগুলোও নিজের ঘোড়ার জিনে বেধে নিল।

মা ওদের জন্য ছোট্ট একটি গাঠরীতে ছেলেদের খাদ্যপুরে নিয়ে এলেন। ওটা তিনি বড় বাপধনের জিনে বেধে দিলেন। বাঁকানো কোমড় সোজা করে পরক্ষণে তিনি বললেন, বেটা! ময়দানে তোমরা কাছাকাছি থাকলে একে অপরের প্রতি খেয়াল রেখ। বিশেষ করে হাম্মাদ তুমি হারেসকে দেখে রেখ। খোদা তোমাদের হার ময়দানে কামিয়াব করেন। আর শোন বাবারা! তোমাদের বাবার নসীহতগুলো স্মরণে রেখো। বাবা! এই বার্দ্ধক্যে তোমরা ছিলে আমাদের আশা-আকাংখার কেন্দ্রবিন্দু। এতদসত্ত্বেও ইসলামের জন্য তোমাদের কোরবান করতে আমাদের কোন কার্পন্য নেই। আমার কথার অর্থ এই নয় যে, তোমরা রনাঙ্গনে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। সিংহ শার্দুল যেভাবে ছাগ-পালের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে সেভাবে দুশমনের ওপর ঝাপিয়ে পড়বে তোমরাও। এবার তোমরা রওয়ানা করো। কুদরত তোমাদের সহায় হোন।'

৫.

সুলতান শেহাবুদ্দীন ঘুরী জাইহুনের তীরে সসৈন্য রনব্যুহ রচনা করেন। ওখান থেকে মাত্র মাইল পাঁচেক দূরে আমু দরিয়ার ঢাল ও আরল সাগরের দিকস্থ তটে খারযাম শাহও যুদ্ধাপেক্ষা করছিলেন। যুদ্ধ করবেন কি করবেন না— এ নিয়ে

উভয়পক্ষে টানাপোড়েন চলছিলো। সবচেয়ে বেশী ইতস্ততঃ ভাবটা সুলতান মুহাম্মদ ঘুরীর দিক থেকেই বেশী ছিল। কাজেই কতকটা রনকৌশল হিসাবেই ঘুরীর বিজ্ঞ জেনারেল কুতুবুদ্দীন আইবেককে সুচতুর খারযম শাহ বন্দী করে পিঞ্জিরাবদ্ধ করেছিলেন। এই জেনারেল ছিলেন সুলতানের প্রানাধিক পুত্রসম।

সৈন্য শিবিরের ঠিক মাঝ বিন্দুতেই ছিল তার খীমা! চামড়া নির্মিত বড় সড় আকারের ছিল এই তাবু। এর মধ্যে ছিল দুটি কামরা। দামী পর্দা সাঁটা এর দরোজায়। মেঝেতে পুরু পাটজাত কার্পেট। সুলতান এর ওপরই বিছানা করতেন।

হাড় কাঁপানো শীতের কোন এক বিকেলে হিরাতের গভর্নর নাসীরুদ্দীন হাম্মাদসহ ঘুরীর শিবিরে এসে হাজির। হাম্মাদকে তাবুর বাইরে রেখে তিনি সুলতান শিবিরে প্রবেশ করেন। তাকে দেখে দেহরক্ষীরা মাথা ঝুঁকিয়ে পথ ছেড়ে দাঁড়াল। ভেতরে ঢোকলেন গভর্নর। বাইরে বয়ে চলা হীমবায়ু থেকে বাঁচতে সুলতান ওই সময়টায় ভেতরেই ছিলেন। গভর্নরের প্রতি দৃষ্টি পড়তেই তিনি উঠে অভ্যর্থনা জানান। শোবার বিছানা একপাশে সড়িয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। বলেন, বড় ভাল সময় এসেছ। আজ রাতে কিংবা কাল যে কোন সময়ে কুতুবদ্দীন আইবেককে মুক্ত করতে আমরা যুদ্ধ শুরু করে দেব।'

পরে সুলতান তার ভ্রাতুষ্পুত্রের হাত ধরে আপনার পাশটিতে বসিয়ে বললেন, কি পরিমাণ কমান্ডো এনেছ হিরাত থেকে?

নাসীরুদ্দীন নিজের রানের ওপর হাত রেখে বিনয়ের সাথে বললেন, 'হাজার পাঁচেক এনেছি। এরা অগ্রগামী বাহিনীর কাতারে ইতোমধ্যে নাম লিখিয়ে ফেলেছে।'

'আইলাক খান সম্পর্কে কোন তথ্য জানা আছে কি তোমার?' প্রশ্ন মুহাম্মদ ঘুরীর। এ প্রশ্নের উত্তরে নাসীরুদ্দীনের মাথা নুয়ে পড়ল। তিনি হয়ে পড়েন কতকটা অপ্রস্তুত। বলেন, আইলাক খানকে নিয়ে আমি বড্ড চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন। তার অন্তর্ধান আমাকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছে।'

তাবুর ছাদের দিকে তাকিয়ে সুলতান বলেন, 'ধন্য সেই মা, যে আইলাক খানের মত যুবককে গর্ভে ধারণ করেন। খোদা না করুন তার কিছু হয়ে গেলে অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হব আমরা। ওর মত দুঃসাহসী যুবক যে কোন ফৌজের জন্য গর্বের বিষয়। একদিকে সে যেমন বাহাদুর তেমনি অকুতোভয়ও।'

নাসীরুদ্দীন সুলতানের কথার মাঝপথে বললেন, 'আইলাক খানের ভাগ্যে যা-ই হোক না কেন ওর বিকল্প খুঁজে পেয়েছি।'

চমকে ওঠেন সুলতান। বলেন, 'বলো কি! বিকল্প খুঁজে পেয়েছ। আইলাকের বিকল্প!' যেন তাঁর মন বিশ্বাস করতে চায় না।

নাসীরুদ্দীন কতকটা গৌরব বিজয়ী দরাজ কণ্ঠে বলেন, 'আমি এমন এক যুবরাজের সন্ধান পেয়েছি যে আইলাক খানের চেয়েও বীর ও শক্তিধর।'

সুলতান বে-চাইন হয়ে বল্লেন, 'এ মুহূর্তে সে কোথায়? কি নাম তার?

নিশাপুরে তার বাস। নাম হাম্মাদ বিন খালদূন। লোক মুখে লৌহমানব বলে তার খ্যাতি। আমার কমান্ডোদের সাথে তাকে এনেছি। সাথে আছে তার এক সহোদরও।'

'ওকে তোমার সাথে নিয়ে আসার দরকার ছিল।' সুলতানের কণ্ঠে আশার সুর।

'আপনি অত চিন্তা করবেন না। এক্ষনে সে আপনার খিমার বাইরেই অপেক্ষা করছে। আপনার সাথে পরিচিত করেই তবে তাকে আমি হিন্দুস্থানের পথে রওয়ানা করাব।' মুচকি হেসে বলেন নাসীরুদ্দীন।

সুলতান তাঁর বিছানা থেকে উঠে কৃত্রিম রাগতঃস্বরে বলেন, 'তাকে বাইরে অপেক্ষায় রেখে তুমি বড্ড যুলুম করেছ। কসম খোদার! মাতৃজাতি প্রত্যহ এমন যুবরাজ জন্ম দেয় না। খিমার বাইরে গিয়ে তাকে আমি অভ্যর্থনা জানাতে চাই।'

নাসীরুদ্দীন ফওরান উঠে বললেন, 'আপনার স্থলে আমিই না হয় ওকে ভেতরে নিয়ে এলাম।'

খানিক বাদে হাম্মাদকে নিয়ে নাসীরুদ্দীন তাবুতে প্রবেশ করলেন। সুলতান তাবুর দরোজায় দাঁড়িয়ে ওর দিকে হাত বাড়িয়ে প্রফুল্ল চিত্তে সহাস্য বদনে বলেন, 'এসো এসো। মুহাম্মদ ঘুরীর তাবুতে নিশাপুরের লৌহমানব এসো! তোমাকে স্বাগতম, সম্মাননা।'

হাম্মাদ বেতস পত্রের মত কাঁপছে। বুক দুরু দুরু কণ্ঠে লাজনম্রচিত্তে ও বললো, 'সুলতানের তাবুতে দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে মোসাফাহা করে নিজকে গৌরবান্বিত মনে করছি।' তিনজনই ভেতরে গিয়ে বসলেন। সুলতান ওকে বললেন,

'নাসীরুদ্দীনের থেকে তোমার বীরত্ব গাঁথা কথা শুনেছি। হিন্দুস্তানের যমীন সম্পর্কে তোমার কোন অভিজ্ঞতা আছে কি?'

'ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে প্রায়ই আমি হিন্দুস্তান গিয়ে থাকি। আপনি যে কাজের দায়িত্ব আমার ওপর সোপর্দ করবেন তা আমি খুব ভালভাবেই আনজাম দিতে পারব। আপনাকে হতাশ করব না।' বিনয় নম্র কণ্ঠে বলল হাম্মাদ।

সুলতান ওর কাঁধে হাত রেখে বললেন, তাহলে তুমি আজই তোমার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাও। তোমার প্রথম কাজ আইলাক খানকে খুঁজে ফেরা। তার সন্ধান পেলে জেনো, আগামীতে হিন্দুস্থানে সে তোমার অধীনস্ত হিসাবে কাজ করবে। নাসীরুদ্দীন তোমার নেতৃত্বের ব্যাপারে তার কাছে পত্র লিখবে। সে বলে দেবে, কে তোমার দোস্ত আর কে দুশমন। বলে দেবে, বিপদে পড়লে কারা তোমার মদদ করবে। আইলাক খান যিন্দা থাকলে প্রতিটি কাজে তোমাকে মদদ করবে। সে নিষ্ঠাবান উদারচেতা। তোমার অধীনে কাজ করতে পেরে সে নিজকে ধন্যই মনে করবে। সে কোন দুর্ঘটনার শিকার হয়ে থাকলে ওখানে করনীয় যা তুমি নিজেই ঠিক করে নেবে।

থামলেন সুলতান। খানিক খামোশ থেকে ফের বললেন, 'ওখানে গিয়ে ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশ ধারণ করো। এ পেশার আড়ালে তুমি সর্বস্থানে নির্বিঘ্নে বিচরণ করতে পারবে। ভারতবর্ষে প্রবেশ করেই আবুল ফাতাহ এর কাছে যেও। সরস্বতী নদী উপকূলীয় ভীমসেন প্রদেশে তার বাস। বাহ্যতঃ সে এক হিন্দুর ছদ্মবেশে আছে। নাম বিদ্যানাথ। প্রকৃতপক্ষে সে একজন পাকা মুসলিম মুবাল্লিগ। কিছুদিন হল ইসলাম গ্রহণ করেছে। কিন্তু ইসলামের কথা কারো কাছে প্রকাশ করেনি। ওই বেশেই মুসলিম গোয়েন্দাগিরি করে যাচ্ছে পুরোদস্তুর। যে কোন বিপদাপদে তোমার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। আবুল ফাতাহ নিজেই আইলাক খানকে খুঁজে ফিরছে। তুমি ওখানে পৌঁছা পর্যন্ত সে হয়ত তাকে খুঁজে ফিরবে।'

সুলতান চুপ করলে হাম্মাদ বললো, 'তাহলে আসন্ন যুদ্ধে শরীক হবার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারব না আমি? আমি ওয়াদা করছি আসন্ন যুদ্ধ যার জন্য আপনি এখানে তাবু গেড়েছেন এর থেকে ফারেগ হয়েই আমি বাড়ী না গিয়ে সরাসরি হিন্দুস্তানের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যাব।'

'অবশ্যই। তুমি এ যুদ্ধে শরীক হতে পার।' নির্দ্বিধায় বললেন মুহাম্মদ ঘুরী।

সুলতানের খিমা থেকে বেরিয়ে নাসীরুদ্দীন ও হাম্মাদ হিরাত থেকে আগত সেনা ছাউনীতে যান। দু'পাহারাদারবেষ্টিত খিমায় প্রবেশ করেন গভর্নর। তার পাশটিতে অপর একটিতে বসে যায় হাম্মাদ। হারেস ওখানে ওর অপেক্ষায়। হাম্মাদকে দেখামাত্রই হারেস প্রশ্ন করে, 'ভাইয়া! সুলতানের সাথে তোমার সাক্ষাৎ হয়েছে কি?'

হাম্মাদ ওকে সামনে বসিয়ে বলল, 'হ্যাঁ। সুলতানের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। আসন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ শেষে আমি হিন্দুস্থানের পথ ধরব'।

হারেস চকিতে প্রশ্ন করল, 'আর আমি?'

হাম্মাদ মুচকি হেসে বলল, 'সুলতানের ফৌজে থাকবে। এখানে নিষ্ঠা ও কর্মঠতার পরিচয় দিয়ে নাম যশ কুড়াতে পার। হারেস খামোশ হয়ে গেল। অতঃপর খীমার কোনে লুকানো খাদ্য পুটলি বের করল। খানিক বাদে দু'ভাই দস্তরখানে বসে গেল।

৬.

পরদিন।

সুলতান মুহাম্মদ ঘুরী ও খারযম শাহ পরস্পর মুখোমুখি হলেন। উভয়ের সাথে মামুলী বাধা ছিল একটি সীমান্ত! কুতুবুদ্দীন আইবেককে গ্রেফতারের দরুন এই যুদ্ধ। সুলতান তার ডান বাহু ফৌজের কমান্ডার বানালেন চাচাত ভাই জিয়াউদ্দীনকে। বামবাহুর কমাণ্ডার ভ্রাতুষ্পুত্র মাহমুদ। মধ্য বাহিনীর দায়িত্ব খোদ নিজেই। এছাড়া হিরাত থেকে আগত ৫ হাজার কমান্ডো তো রয়েছেই। এদেরকে রাখা হয়েছে

অগ্রগামী বাহিনীতে। নাসীরুদ্দীনই এদের সালার। হারেসও এই দলে। সুলতানের সাথে সালারের কথা হয় যে, যুদ্ধ যখন চরমরূপ ধারণ করবে তখন তারা কুতুবুদ্দীন আইবেককে ছাড়িয়ে এনে নিরাপদ দূরত্বে চলে যাবে।

যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই নাসীরুদ্দীন তিন হাজার জোয়ানকে হাম্মাদের নেতৃত্বে আলাদা করলেন। বললেন, তোমরা ঠিক ওই স্থানে প্রচন্ড হামলা করবে যেখানে আইবেক কে আটকে রাখা হয়েছে। তাঁকে মুক্ত করাই তোমাদের প্রধান ও একমাত্র দায়িত্ব।

উভয় গ্রুপের যুদ্ধ শুরু হলে সেহরক্ষী বাহিনীর উপর হামলা করে নাসীরুদ্দীন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলেন। এই ফাঁকে কাতার চিরে হাম্মাদ তার অধীনস্ত বাহিনী নিয়ে আইবেক শিবিরে হামলা করল।

রসদ ও খোরাকীর অজস্র খিমার মধ্যে জিঞ্জিরাবদ্ধ আইবেক মানবেতর জীবন যাপন করছিলেন। হাম্মাদ ও তার সাথীরা অবলীলায় তাকে ছাড়িয়ে আনতে গিয়ে বাঁধার সম্মুখীন হলো। কেননা তাঁকে মজবুত লৌহশলাকায় পেঁচিয়ে রাখা হয়েছিল। এবং তাতে ঝুলেছিল প্রকান্ড এক তালা।

বাধ্য হয়ে হাম্মাদ আইবেককে ওই লৌহ শলাকা পেঁচানো খাঁচাসহ উঠিয়ে এনে তার ঘোড়ার পিঠে চড়াল। ওর অধীনস্তরা এসময় খারযম বাহিনী থেকে প্রাণপণ বাঁচিয়ে চলছিল। নাসীরুদ্দীন আইবেক-মুক্তির খবর শুনে ছাউনীতে হামলা বনধ করলেন এবং হাম্মাদের সাথে দেখা করলেন। তালা কেটে লৌহশলাকা থেকে কুতুবুদ্দীন আইবেককে মুক্ত করা হল। নিষ্ঠুর বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে হাম্মাদের সাথে পরিচিত হলেন আইবেক। মুক্তিদাতাকে তিনি বুকে চেপে ধরলেন। জানালেন কৃতজ্ঞতা। বললেন, তুমি আমাকে আবার মুক্ত দুনিয়ায় বাতাস সেবন করার সুযোগ করে দিয়েছ। সময় এলে এর প্রতিদান তুমি পাবে। পরে তিনি পূর্বাপর পরিচিত জনের সাথে মিলিত হলেন।

আইবেকের মুক্তির খবর শোনামাত্রই মুহাম্মদ ঘুরী যুদ্ধের সমাপ্তি টানলেন। আঁধার রাতেই তাবু গুটিয়ে তাঁর রাজধানী গজনীর উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। এদিকে সুলতান ও নাসীরুদ্দীনের কথামত হাম্মাদ হিন্দুস্থানের পথ ধরল।

দুর্গম পথে

সসৈন্যে সুলতান মুহাম্মদ ঘুরী আমু দরিয়া ত্যাগ করলেন। পথিমধ্যে মাশহাদ প্রদেশে নাসীরুদ্দীনকে বিদায় জানালেন। এখানে এক রাত থেকে তিনি হেলমন্দ ও আর জুন্দাব নদী পার হন। এক সময় উপনীত হন গজনীতে।

হাম্মাদ আমু দরিয়ার উপকূল ধরে এগিয়ে চলছে পূর্বদিকে। হাড় কাঁপানো শীতের মুষলধার বৃষ্টি ও বরফ উপেক্ষা করে এগিয়ে চলছে সে দুর্গম পথে। তুরমুজ-এর পথে ও কুন্দুজে উপনীত হলো। ওখান থেকে এলো বাগলান-এ। ডেরা রাসিদ পেরিয়ে উপনীত হলো হিন্দুকুশ পর্বতমালায়। পর্বত পেরিয়ে নেমে এলো কাবুলের মধ্যবর্তী সমতল প্রান্তরে। এবার ওর চলার গতি বেড়ে গেলো পূর্বের চেয়ে।

শীত মৌসুমের মুষলধার বৃষ্টির দরুন নীলাব (সিন্ধু নদের পুরান নাম) নদীতে উত্তাল তরঙ্গ। এ নদী পারাপারের জন্য নেই কোন ব্রীজ বা খেয়া। এছাড়া যে স্থানে এসে ও নদীর সম্মুখীন হলো সেখানটা ঘন জংগলে ঠাসা। আশে পাশে নেই লোকালয়ের চিহ্নও। থাকারও কথা নয়। কাজেই এখানে অবস্থান করারও কোন যুক্তি খুঁজে পেল না হাম্মাদ। সুতরাং খরস্রোতা নীলাব সাঁতরে পার হবার সিদ্ধান্ত নিল ও।

এবার ওর সামনে নাঙ্গা পর্বতামালা। এ দুর্গম পথে যাত্রা বিরতির খুব কম সময়ই পেয়েছে ও। ইল্লোর বিলের পাশ দিয়ে অতিবাহিত হবার পর ওর গতি দক্ষিণ-পূর্বমুখো হয়েছে। এক সময় ও মধ্য প্রদেশে প্রবেশ করে। এখান থেকে ও দক্ষিণমুখো হয়। বেশ কিছু দুর্গম পাহাড় মাড়িয়ে ও স্বরসতি নদী উপকূল ধরে চলতে থাকে। এখানে সুলতান শেহাবুদ্দীন ঘুরীর নির্দেশমত ভীমসেন-এর প্রদেশে বসবাসরত বিদ্যানাথ ওরফে আবুল ফাতাহকে খুঁজে ফেরে। বিদ্যানাথ ঘুরীর চৌকস গোয়েন্দা।

একদিন ভীম সেনের প্রদেশ দিয়ে ওর ঘোড়া দ্রুত ছুটছিল। আচমকা কারো আর্ত চিৎকারে ওর কান সজাগ হয়ে ওঠল। মনে হচ্ছে, গরুর মত কাউকে জবাই করা হচ্ছে। হাম্মাদ সহসাই ঘোড়ার লাগাম কষল। ভাবল, কোত্থেকে এই আওয়াজ এবং কেন? আওয়াজটা ওর চলৎশক্তিকে থমকে দিয়েছে। পরবর্তী ভাবনায় ও যখন জড়িয়ে পড়েছে ঠিক তখন পূর্বের মত আর্তচিৎকার ওর কানে ভেসে এল। হাম্মাদের দৃষ্টি চিৎকার যে দিক থেকে আসছে সেদিকে ঘুরে বেড়াল। ওর ঘোড়া এ মুহূর্তে সামনের দুপা উঁচিয়ে হ্রেষাধ্বনি দিতে লাগল। সামনে বিপদ আঁচ করতে পেরেই অবুঝ পশুর এই অভিব্যক্তি।

ঘোড়ার গরদানে হস্তপরশ বুলিয়ে হাম্মাদ বলল, 'ভয় পাসনে সাথী আমার! সাহস হারাসনে। বিদেশ-বিভুঁইয়ে তোর আমার এই পয়লা পরীক্ষা। হাম্মাদ দ্রুত ঘোড়ায় পদাঘাত করল। কিছুদূর যাওয়ার পর মাটি ও রক্তে একাকার অর্ধমৃত একটি লাশ ওর সামনে ভেসে ওঠল। ঘোড়া থেকে নেমে লাশটির কাছে এগিয়ে গেল। হাম্মাদ তার শ্বাসনিরীক্ষণ করল। শেষ পর্যন্ত ও নিশ্চিত হলো, লোকটা মরেনি জীবিত। দেখতে হৃষ্টপুষ্ট তাগড়া জোয়ান। বেহুশ হয়ে পড়ে আছে। বড্ড কষ্ট করে জিন্দেগীর আখেরী শ্বাস টানছে।

পুনরায় ঘোড়ার কাছে এগিয়ে এলো। জিনে বাধা পানির মশক এনে বেহুঁশ যুবকের নাকে মুখে পানি ছিটাল। অপেক্ষায় থাকল ওর হুঁশ ফেরে কি-না। খানিক পরে যুবক চোখ খোলল। হাম্মাদের দিকে তাকিয়ে বলল—

"আপনি কে? চেহারা ও লেবাছে তো মুসলমান মনে হচ্ছে।'

হাম্মাদ বলল, 'এর আগে বলো, তুমি কে? আর তোমার অবস্থাই বা এমন কেন?'

যুবক কাতর স্বরে বলল, 'বিশ্বপাল আমার নাম। আমার বোনের সাথে নগরকোট যাচ্ছিলাম। দুশমন আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং আমার বোনকে ছিনিয়ে নেয়। ওরা আমাকে আহত করে মৃত ভেবে ফেলে যায়। তুমি দেবতা হয়ে আমার কাছে এসেছ। আমি তোমার আল্লাহ ও রাসূলের দোহাই পেড়ে মিনতি করে বলছি, আমার বোনকে উদ্ধার কর।'

বিশ্বপাল খামোশ হয়ে গেল। খুব সম্ভব বেহুঁশি তাকে আবার পেয়ে বসল। হাম্মাদ লক্ষ্য করে দেখল, বিশ্বপাল যেখানে পড়ে আছে সেখানে অসংখ্য ঘোড়ার পায়ের ছাপ। উঁচু হয়ে হাম্মাদ ওই ছাপ নিরীক্ষণ করল। আচমকা বিশ্বপালের কথায় ওর সম্বিত ফিরে পেল। 'তনুমনে আপনাকে বলবান ও মহাশক্তির অধিকারী মনে হচ্ছে। আমার বোনকে উদ্ধার করতে পারেন আপনি সুনিশ্চয়ই, খুব সম্ভব সে সময় পর্যন্ত হয়ত আমি বেঁচে থাকব না। আমার বোনের পরিচিতি তুলে ধরছি। দেহের গড়ন ওর দীর্ঘ। দেখতে অপরূপ। সৌন্দর্য ওর প্রধান শত্রু। স্বর্গের দেবতা হে! ওর মাথায় ঝুমুর। হাতে কাকন, গলায় হাঁসুলি, কানে কানফুল, মেহেদী রঙা হাতে থরে থরে সাজানো আংটি। আর আর'... হাম্মাদ তার কথার মাঝপথে বলল, 'প্রথমে তোমার জীবন বাঁচাতে চাই। এরপরে তোমার বোনের ব্যাপারটা দেখব। তুমি চিন্তা করো না। আমি ওদের ঘোড়ার ছাপ নিরীক্ষণ করেছি। ওরা তোমার বোনকে নিয়ে পাতালপুরীতে গেলেও রক্ষা নেই। বিশ্বপাল কম্পিত কণ্ঠে বলল, 'আপনি আমার চিন্তা বাদ দেন। আমি বোধহয় বাঁচব না। ওকে বাঁচান, নয়ত ওরা ওকে...' বিশ্বপাল খামোশ হয়ে গেল। বেহুঁশি তাকে পেয়ে বসল। হাম্মাদ ফওরান প্রাথমিক চিকিৎসায় লেগে গেল। ওর ব্যাগ থেকে পট্টিসামগ্রী বের করে বিশ্বপালের ক্ষতে লাগাতে লাগল। বেহুশ অবস্থায়ই তাকে ঘোড়ার পিঠে বেধে নিল। নিজেও চাপল। পথের ছাপ অবলম্বনে দ্রুত ঘোড়া ছুটাতে লাগল।

পাঁচ ছ'মাইল অতিক্রম করার পর বিশ্বপালের পুনরায় হুঁশ হলো। কাতর কণ্ঠে পানি চাইল। হাম্মাদের মশক খালি। কাজেই ওর গতি বেড়ে গেল। মাইল দেড়েক অতিবাহিত হবার পর বিশাল এক মন্দির ওর নযরে ভেসে ওঠল। ওর ঘোড়া এবার ওই মন্দির অভিমুখে চলল।

মন্দিরের সামনে মাঝারী গোছের একটি ফোয়ারা। ফোয়ারার তীরে রয়েছে রশিবদ্ধ ছোট ছোট পানপাত্র। ফোয়ারার পাশে বেশ ক'টা রেস্ট হাউজ। ওগুলোতে মন্দির পুরোহিতদের বাস। আচমকা জনৈক পুরোহিতকে ওই ফোয়ারার তীরে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। হাম্মাদ মশক হাতে ওদিকে এগিয়ে গেলে বিশ্বপাল ক্ষীণকণ্ঠে বলল, 'দেবতা! আমি অসার হয়ে পড়েছি। আমাকে নীচে নামান। খানিক তাজাদম হতে পারি কি-না দেখি।'

হাম্মাদ ওকে পাজাকোলা করে নীচে নামাল এবং একটি গাছে ঠেস দিয়ে বসাল। অতঃপর মশক চুবিয়ে তাতে পানি ভরতে লাগল। আচমকা পুরোহিত গর্জে উঠে বললেন, ঐ নরাধম। তুমি জল অশুচি করলে যে!'

হাম্মাদ সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে পানি ভরতে লাগল। পুরোহিত তার বিশাল বপু নিয়ে থপ থপ করে হাম্মাদের কাছে এগিয়ে এসে ওকে পদাঘাত করলেন। বললেন, 'তুমি জানো না, ফোয়ারার এই পবিত্র জল শুধুমাত্র পুরোহিতদের জন্য নির্ধারিত?'

হাম্মাদকে এর প্রতিক্রিয়ায় কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বিশ্বপাল বলল, 'মহারাজ!

জীবন-মৃত্যুর মাঝে দোল খাওয়া এক প্রাণীকে বাঁচানোর এক ঘটি জল নিয়ে আপনি রীতিমত লড়াইতে নামতে পারলেন!'

এদিকে পুরোহিতের পায়ের গুঁতো খাওয়া সত্ত্বেও হাম্মাদ মশক ভর্তি করে দাঁড়াল। গোস্বাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল আঘাতকারীর প্রতি। পুরোহিতের গোস্বা তখনও কমেনি। তিনি আরো অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, 'পাপিষ্ঠ নরাধম! দেখতে তোমাকে মুসলিম মনে হচ্ছে। তুমি ক্ষমার অযোগ্য পাপ করেছ। এই ধৃষ্টতার শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে।'

বিশ্বপাল পন্ডিতকে বোঝাতে গিয়ে বললো, আপনার কাজ তো শান্তির বাণী শোনানো মহারাজ! সবার উপরে মানুষ সত্য এর ওপর কিছু নেই। মানব সেবাই ধর্ম।' পুরোহিত হিংস্র শার্দুলের ন্যায় গর্জে ওঠেন, 'মুর্খ কোথাকার! তুমি তো হিন্দু! তোমার ধর্ম-কর্ম কি চুলোয় গেল! শেষ পর্যন্ত মন্দিরের শিক্ষা থেকে নিজকে দূরে সরালে?'

হাম্মাদের অবস্থা তখন কাচা ঘুম ভাঙ্গা বাঘের মত। শপ করে কোষ থেকে ও তলোয়ার বের করল। বলল বজ্র কঠিন কণ্ঠে, 'তুমি কেমন পুজারী গো। তোমার

মাঝে দেখছি মানবতার লেশমাত্র নেই। অসহায়ের অসহায়ত্বে কিছু করার শিক্ষা কি তোমার ধর্মে নেই? তৃষ্ণার্ত মানুষ ছটফট করতে করতে মারা গেলেও পানি দেয়ার শিক্ষাটুকু কি তুমি পাওনি! তোমার তপস্যা এক নিমিষেই শেষ করে দিচ্ছি। জানো না। খোদার রাজত্বে সব মানুষই সমান। প্রকৃতির দান সকলের তরে সমান। তুমি কি দেখনা, পানির ঝর্না, আগুনের উষ্ণতা, সৌররশ্মি ও বায়ু প্রবাহ সকলের তরে সমান! যে কেউ এর থেকে উপকৃত হতে পারে। এখানে উঁচু-নীচু ভেদাভেদ নেই।'

পুরোহিত অবাক বিস্ময়ে হাম্মাদের কথা গিলে চলেছেন। তার জীবনে এ ধরনের অভিজ্ঞতা এই প্রথম। এতদিন তিনি হাতজোড় করা মানুষের কাকুতি-মিনতি শুনেছেন। হাম্মাদ বলছে, এই যে গঙ্গা, যমুনা, স্বরসতী, তিস্তা, সারজু, গোমতি, গোবিন্দ, চেনাব, রাবী, নীলাব, শীতলক্ষ্যা, বিয়াস, ফোরাত, দিজলা, আমু ও নীলসহ সকল নদীই খোদার দান। তোমরা খামোকাই হিন্দুদের চারস্তরে ভাগ করে রেখেছো। যে অচ্ছুৎদের তোমরা ম্লেচ্ছ ঠাওরাও তারা কি মানুষ নয়? তোমরা ওদের গঙ্গা পর্যন্ত যেতে দাও না। গঙ্গা কারো পৈত্রিক সম্পত্তি নয়। এ এক নদী। এতে সকলের অধিকার সমান।'

থামল হাম্মাদ। নাঙ্গা তলোয়ার উঁচিয়ে সামনে এগিয়ে এল। পুরোহিতকে বলল, শেষবারের মত তোমার দেবতা-ভগবানদের স্মরণ করে নাও। আমার তলোয়ারের ডগা তোমার দেহের পরশ পেতে যাচ্ছে। পুরোহিতের আপাদমস্তকে কাঁপন ধরল। প্রচন্ড শীত সত্ত্বেও পুরোহিতের ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। তিনি হাম্মাদকে লক্ষ্য করে বিশ্বপালকে বলতে শোনলেন দেবতা! ভুলতো মানুষই করে। কাজেই পুরোহিতজির ভুল হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। পাপের শেকড় হচ্ছে রাগ। তাঁকে ক্ষমা করে দিন।'

আচমকা পুরোহিতজি ওর পা জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'রাজন! আপনি সত্য ধর্মের প্রতিভূ। আমাকে ক্ষমা করে দিন। আগামীতে আমি এমন ভুল আর করব না।'

হাম্মাদের ঠোঁটে ফুটে ওঠল পরিধি বাড়ানো মুচকি হাসি। খুব সম্ভব ও পুরোহিতকে হত্যা করতে নয় ধমক দিতেই তলোয়ার বের করেছিল। পা থেকে পুরোহিতের হাত সরাল।'

পুরোহিত দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'বলুন মহারাজ!'

হাম্মাদ এবার শাহী দাপট নিয়ে বলল, 'এখান থেকে জনা চারেক ঘোড় সওয়ারকে যেতে দেখেছ কি? যারা এক যুবতীকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাচ্ছিল।'

আপনারা এখানে আসার খানিক পূর্বেই ওরা এখান থেকে ঝড়ো বেগে চলে গিয়েছে। ওদের চলার যে গতি ছিল সেই গতি বজায় রেখে চললে এক্ষণে ওদের মাইল খানেক পথ অতিক্রম করার কথা।'

হাম্মাদ আর কথা না বাড়িয়ে বিশ্বপালকে পানি পান করাতে লাগল। পুরোহিত ওদের কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'এ মনে হয় মারাত্মক যখমী! সম্পর্কে তোমার

কি হয়? হাম্মাদ আড় চোখে পুরোহিতের দিকে তাকিয়ে বলল, 'একজন মানুষের সাথে আরোকজন মানুষের যে সম্পর্ক হবার কথা ততটুকুই ওর সাথে আমার সম্পর্ক।'

'তুমি মুসলমান আর ও হিন্দু। উভয়ের ধর্ম এক হতে পারে না। তাই ওর সাথে তোমার সম্পর্ক হয় কি করে।' বললেন পুরোহিত।

'আদম সন্তানের মাঝে সম্পর্ক গড়তে ধর্মের বাধা দেয়ার কথা নয়।' বলে হাম্মাদ বিশ্বপালকে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে বলল, 'তুমি খামোকাই আমার সময় অপচয় করছ। যাও মন্দিরে গিয়ে পুজো-অর্চনায় লেগে যাও— ওদের পশ্চাদ্ধাবন করতে হবে। ঘোড়ায় পদাঘাত করে হাম্মাদ দ্রুত ছুটতে লাগল। পুরোহিত অবাক বিস্ময়ে ওদের চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইল।

উল্কাবেগে ছুটে চলছে হাম্মাদের ঘোড়া। ওর আগে বসা বিশ্বপাল বলল, 'দেবতা। এখন পর্যন্ত তোমার নাম জানা হয় নি আমার।'

হাম্মাদ ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, হাম্মাদ আমার নাম।'

'তুমি কি আরব?'

'হ্যাঁ।'

'কোত্থেকে এসেছ?'

'নিশাপুর থেকে।'

'কি উদ্দেশে এদেশে?'

'ব্যবসা।'

খানিক খামোশ থেকে বিশ্বপাল বলল, 'ফোয়ারার তীরে পুরোহিতজির সাথে তোমার সংলাপ আমার ধর্ম বিশ্বাসের চূড়া ভেঙ্গে দিয়েছে।'

'আমি ভাবছিলাম তুমি বরং তেঁতেই গেছ এবং উষ্মা প্রকাশ করবে।'

'আমি জাতে ক্ষত্রীয় হলেও মুসলমানদের সাথে ওঠাবসার সুযোগ পেয়েছি। তোমার ধর্মের এই দিকটা আমার ভালো লেগেছে যে, ঈশ্বর সকলের তরে সমান এবং তিনি সব জায়গায় বিরাজমান।'

'হ্যাঁ! আল্লাহ চিরন্তন এবং সর্বস্থানে বিরাজমান। তিনি অনাদি, অনন্ত! বিশ্বপাল! বিশ্বপাল!! দেখ! সামনে চারজন ঘোড় সওয়ার দেখা যাচ্ছে। ওরা কি তারা যারা তোমার বোনকে তুলে এনেছে?' আচমকা বলে ওঠল হাম্মাদ।

বিশ্বপালের চোখেমুখে আনন্দদ্যুতি। আনন্দ সংযত করে সে বলল, 'হ্যাঁ! ওরাই। আর দেখ সর্বাগ্রের ঘোড়ায় আমার বোনকে একজনে ধরে রেখেছে।'

হাম্মাদ ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিল। ওদের কাছটিতে এসে জলদ গম্ভীর স্বরে বলল, 'দাঁড়াও!'

চারজনই এ আওয়াজে থমকে দাঁড়াল। সকলেই হুঁশিয়ারকারী ও তার সামনে বসা লোকটার দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকাল। সর্বাগ্রের সওয়ার যে ওর বোনকে আগলে রেখেছিল বিশ্বপালের দিকে তাকিয়ে বলর, 'তুমি এখনও জীবিত?'

বিশ্বপাল রাগতস্বরে বলর, 'হ্যাঁ! ভগবানের কৃপা আর এই মহাদেবের সহায়তায় তোমাদের করুন মৃত্যু দেখতে বেঁচে আছি। মৃত ভেবে তোমরা আমাকে রেখে এসেছ। সত্যি বলতে কি জানো, জীবন-মৃত্যুর কর্তা ভগবান।

হাম্মাদ ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। বিশ্বপালকে পাজাকোল করে পাথরে ঠেস দিয়ে বসাল। পুনরায় ঘোড়ায় চেপে ঢাল-তলোয়ার বের করল। চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে ওদেরকে বলল, 'নির্জন এই পার্বত্যাঞ্চলে তোমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নাও। জবাবে ওরাও তলোয়ার বের করল। বিশ্বপালের বোন সুযোগ বুঝে ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফ দিয়ে নামল। কেননা ওকে আগলে ধরা সওয়ারের দৃষ্টি এক্ষণে আগুয়ান হামলাকারীর প্রতি। বিশ্বপালের কাছে দৌড়ে এল ওর বোন এবং ওর অবস্থাদি জানতে চাইল।

সর্বাগ্রের নেতা গোছের সওয়ার হাম্মাদের প্রতি টিপ্পনি ছুঁড়ে অবজ্ঞার সুরে বললো, 'মুর্খ কোথাকার। আমাদের কাজে বাধা দানের পরিণতি ভালো হবে না বলছি। সময় থাকতে পালা। নইলে তোর লাশ কেটে কুকুরকে খাওয়াব। পাপিষ্ঠ! আমাদের পথে বাধা দিসনে। জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হলে উঁচু ওই পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে মরতে পারতিস্। চারজন নয় তোর মত পুঁচকের মোকাবেলায় আমিই যথেষ্ট। এখানে তোকে কেউ মদদ করবে না। আমরা ক্ষত্রীয়। ক্ষত্রীয়রা লড়াই করে স্বর্গবাসী হতে জানে।'

হাম্মাদ হুংকার মেরে বলল, 'তোর গোস্তাক যবান রুদ্ধ করতে আমার তলোয়ার উদগ্রীব হয়ে আছে। তবে এ তলোয়ারের পেট একজনের রক্তে ভরবে না। সাহস থাকলে চারজন একসাথেই এগিয়ে আয়। তোদের সাথে লড়াইয়ের শখ আমার বহুদিনের। মনে রাখিস। ঘোড়া তার প্রভূকে আর বলদ তার রাখালকে খুব ভালো করেই চিনে থাকে। এভাবে আমিও লড়াইয়ের সব কলা-কৌশল রপ্ত করেছি। অতএব তোরা তোদের কোন কৌশলই আমার সামনে খাটিয়ে যুৎসই করতে পারবি না। মনে রাখিস! আমার প্রচন্ড গতির নিষ্ঠুর আঘাতগুলো তোদেরকে নিকৃষ্ট কুকুরে পরিণত করবে। হয়ে পড়বি তোরা আমার আঘাতের সম্মুখে কাঠির মত অনুগত অন্ধকারে পথ চলার মত বাধ্য। আয় কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে দেখব।

নেতাগোছের লোকটা একাকী এগিয়ে এসে বলল, 'তোর মত এক ম্লেচ্ছ মুসলিমের সাথে আমাদের সকলের লড়াই ক্ষত্রীয় জাতির জন্য অপমানজনক। নিজকে সামলাও। দেখা যাবে চাপার ধারের সাথে দৈহিক শক্তির কতটা মিল।'

ঘোড়ায় পদাঘাত করে হাম্মাদ তখনো সাড়েনি, ইতোমধ্যে তার প্রতিপক্ষ অগ্রসর হয়ে যায় এবং হামলাও করে বসে। ঢাল দ্বারা আঘাত প্রতিহত করে হাম্মাদ। এবার ও প্রচন্ড আঘাত করে বসে। প্রতিপক্ষের ওর আঘাত প্রতিহত করার শক্তি কৈ? হাম্মাদের তলোয়ার ওর গরদানে লাগে। গলা থেকে নিতম্ব অবধি চেরাই কাঠের মত তার দেহটা দু'ভাগ হয়ে দু'দিকে ছিটকে পড়ে।

আকাশে বাতাসে স্রেফ একটা আর্তনাদ-ই শোনা যায়। ওদের অবশিষ্ট তিনসাথী এবার একযোগে হামলা করে। নেতার মৃত্যুর পর ওরা হিংস্র হয়ে ওঠে আরো। কিন্তু হাম্মাদের টনের্ডোগতির হামলায় ওরা হতোদ্যম হয়ে বসে। হাম্মাদ এ সুযোগটা কাজে লাগায়। ক্ষণিকের মধ্যেই তিনজনকে জাহান্নামের পথ দেখায়।

তলোয়ারের রক্ত ওদের দেহে মুছে হাম্মাদ বিশ্বপালের কাছে এগিয়ে আসে বীর বিক্রমে। বিশ্বপাল মুচকি হেসে বলে, 'দেবতা! সত্যিই তোমার শক্তি অশেষ অপার। অতঃপর বোনের দিকে লক্ষ্য করে সে বলে, 'ও রত্না, আমার বোন। বোনকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'আমার জন্য উনি অবতার হয়ে স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন। উনি সময়মত না এলে আমার আত্মা এতক্ষণে দেহ ছেড়ে উড়ে যেত। এক্ষণে আমার উপলব্ধি, আমি বেঁচে আছি, বাঁচব।'

হাম্মাদকে দেখে রত্না প্রণাম করল। পরে এক পার্শ্বে সড়ে দাঁড়াল। এই প্রথম ওর চেহারার দিকে তাকাল হাম্মাদ। কুদরত বুঝি তাঁর সৌন্দর্যের মুঠি মুঠি ছড়িয়ে দিয়েছেন ওর তনুমনে। দুগ্ধ ফেননিভ দিলকাশ ফোয়ারার উপচে ওঠা তরঙ্গের রূপসুষমা। লাল ইয়াকুতের ওষ্ঠ যুগল। নয়নযুগলে নীলমের প্রলেপ। মুক্তাদানার মত দু'পাটি দাঁত থরে থরে সাজানো। এতদসত্ত্বেও খানিক আগে বয়ে যাওয়া ঝড় ওর সৌন্দর্যে এতটুকু ভাটা আনেনি। হাম্মাদের সামনে ও ঠিক এভাবে দাঁড়ানো যেভাবে ঝড়োহাওয়ার পর মেঘের ওপাশ থেকে প্রকাশিতব্য পূর্ণিমা চাঁদ। হাম্মাদ ডুবে যায় এই অনুপম সৌন্দর্যের পিরামিডের মাঝে। সহসাই সামলে নেয় নিজকে। হাম্মাদ কিছু বলতে যাবে ঠিক এই মুহূর্তে রত্না বলে ওঠে—

'আমার ভায়ের প্রতি আপনি যে দয়া পরবশ হলেন পরমেশ্বর এর বিনিময়ে আপনার মাথা উঁচু করবেন। আপনার গায়ে অসুরের শক্তি। আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক। কথা দিচ্ছি, প্রতিদান দেয়ার সুযোগ এলে সেটাকে ধর্ম মনে করব। ভগবানের কৃপা আপনাকে পেয়ে বসুক কাল-কালান্তর ধরে এই প্রার্থনা করি।'

হাম্মাদের চেহারায় তাকিয়ে ও ঝলসে যায়। নত হয়ে আসে লাজ-শরমে মাথা। রূপ নেয় রক্তজবা গন্ড লাল ইয়াকুতে। বেয়ে পড়ে ডাগর ডাগর চঞ্চল হরিণীর মত চোখ দিয়ে কৃতজ্ঞতার বড় দু'ফোটা অশ্রু।

হাম্মাদ তাকায় বিশ্বপালের দিকে। বলে, 'বিশ্বপাল! বিশ্বপাল!! দেখো আকাশে কি পরিমাণ মেঘ করেছে। আমাদেরকে ফওরান এখানটা ছাড়তে হবে। নয়ত শীতের বৃষ্টি আমাদের বরফ বানিয়ে ছাড়বে।

বিশ্বপাল ওর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলল, 'আপনি ঠিক বলেছেন। রওয়ানা করার পূর্বে এক কাজ করুন, দেখুন ওদের চারটি ঘোড়া আর আমাদের দু'ভাইবোনের দুটি। রত্নার পোটলায় দামী অলংকারাদি রয়েছে। হাম্মাদ ওর কথার মাঝখানে বলল, 'তোমার উদ্দেশ্য আগে ওদের ঘোড়াগুলো কব্জা করি এই তো। বিশ্বপাল যখমে বাধা পট্টির ওপর হাত রেখে বলল, 'আপনার ধারনা যথার্থ।' হাম্মাদ আস্তে আস্তে ওদের

ঘোড়াগুলো কব্জা করল। ওগুলোর লাগাম ধরে বিশ্বপাল ও রত্নার কাছে নিয়ে এলো। দু'ভাই বোনকে দুটি দিয়ে বাদবাকীগুলো ওর ঘোড়ার সাথে বেধে নিল।

কিছুদূর যাওয়ার পর হাম্মাদ জিজ্ঞাসা করল, 'এরা তোমার বোনকে উঠিয়ে নিল কেন? ওদের সাথে তোমাদের শত্রুতা কিসের?'

বিশ্বপাল আহ্ ধ্বনি করতে করতে বলল, 'জানতাম এ প্রশ্ন আপনার থেকে আসবে। আমরা আজমীরে বসবাস করি। আমার বোনের সৌন্দর্যই তার প্রধান শত্রু। আজ থেকে কিছুদিন পূর্বে আজমীরের রাজা পৃথ্বিরাজ তার বড় মেয়ের স্বামী নির্বাচনের জলসা ডেকেছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই জলসায় বাবা মায়ের পাশাপাশি রত্নাও উপস্থিত ছিল। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস আমার বোনের ওপর রাজার দৃষ্টি পড়ে যায়। তিনি ওর রূপে মুগ্ধ হয়ে পড়েন। ওই জলসার পর পরই তিনি বাবা-মায়ের সাথে যোগাযোগ করেন এবং রত্নার পাণি গ্রহণের মত নিকৃষ্ট খায়েশ ব্যক্ত করেন। বাবা-মা বাহানা করে বলেন, 'রত্না এ প্রস্তাব মানবে না।' তারা জানতেন রাজা পৃথ্বিরাজের চোখ কুমারী মেয়েদের ওপর পড়লেই তাকে বিয়ে করে নেন। কিছুদিন ভোগ করেই তাকে আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেন। এমনকি তার ঔদ্ধত্যের সীমা এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, আজমীরের বড় মন্দিরের যে সব দাসী-পূজারিনী ছিলেন তারা পর্যন্ত এই অমানুষ পশুর হাত থেকে রেহাই পায়নি। তিনি মোটা অংকের প্রলোভনের টোপ ফেলেও আমার বাবা-মাকে রাজী করাতে পারেননি। বিপদ আঁচ করে বাবা-মা আমাদের এক নিকটাত্মীয়দের অঞ্চলে প্রেরণ করলেন। ওখানে আমরা স্টোররুমে অবস্থান করছিলাম। বাবা বলেছিলেন, বিশ্বপাল ও রত্না নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

পৃথ্বিরাজ এতে ক্ষিপ্ত হয়ে বাবা-মাকে হত্যা করে ফেলেন। আমাদের খোঁজে লাগিয়ে দেন তার বাহিনী। ওরা হন্যে হয়ে আমাদের খুঁজতে থাকে। আমরা এসময় খবর পেয়ে ওই নিকটাত্মীয়ের বাড়ী ছেড়ে পালাই। অচ্ছুতের ছদ্মবেশ ধারন করি। কিন্তু এই ছদ্মবেশে ওদেরকে ফাঁকি দিতে পারিনি। ধরা পড়ে যাই। এদের থেকে বাঁচতে যারপর নাই চেষ্টা করি। ওরা হামলা করে আমাকে আহত করে রত্নাকে নিয়ে পালায়। এর পরের কাহিনী আপনার অজানা নয়।

হাম্মাদ জিজ্ঞাসা করল, 'ওরা কোনস্থান থেকে তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন শুরু করেছিল।'

ঢোক গিলে বিশ্বপাল বলল, 'যমুনা-স্বরসতীর উপকূলবর্তী প্রদেশের পার্বত্যাঞ্চল থেকে আমাদের পশ্চাদ্ধাবন শুরু করে। আমরা বেশীক্ষণ ওদের নাগাল থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারিনি। এক সময় ওরা আমাদের ধরে ফেলে। ধরা খাওয়ার ফলে আমরা আমাদের মূল গন্তব্য থেকে ছিটকে পড়ি। আমরা ভীম সেনের বসতির উদ্দেশে যাচ্ছিলাম।

হাম্মাদ চকিতে প্রশ্ন করে, 'ভীম সেনের বসতিতে কার কাছে?'

ওখানে আমার দু'মামা থাকেন। তন্মধ্যে একজনের নাম বিদ্যানাথ আরেকজন লক্ষরাজ। হাম্মাদ চিন্তার অথৈ সাগরে ডুবে যায়। কেননা সুলতান ঘুরীর কথামত বিদ্যানাথের ওই বসতিতে থাকার কথা। বিশ্বপালের কথায় ওর সম্বিত ফেরে, লক্ষরাজ আমাদের বড় মামা। তার বড় ছেলে অর্জুনের সাথে রত্নার সাথে বাগদানও হয়েছে। অর্জুন হাসনাপুরের রাজা খন্ডরায়ের ফৌজি জেনারেল। ভীম সেন-এ আমাদের থাকতে হবে চৌকস। ভীমসেন খন্ডরায়ের রাজধানী রাজা পৃথ্বিরাজের আপনভাই হচ্ছেন এই খন্ডরায়। সুতরাং ওখানেও আমরা শংকামুক্ত নই। এছাড়া আমাদের আর কোথাও যাবার জায়গা নেই।

বিশ্বপাল থামল। হালকা বৃষ্টি পড়ল চারদিকেই। ওরা স্বরসতী নদী পার হল। ওদের সামনে ভেসে ওঠল কাচা বসতি। নদীতীরে জনৈকা তরুনী কলসীতে পানি ভরে যাচ্ছিল। হাম্মাদ ওই তরুনীর কাছে এগিয়ে গেল। বলল—

'বোন! আমরা পর্যটক। আমার সংগী খুব যখমী। তোমাদের এই বসতিতে মাথা গোঁজার ঠাঁই মিলবে কি? বৃষ্টি থামতেই আমরা চলে যাব।'

যুবতী অবাক হয়ে বলল, 'আমি নীচু ও দলিত শ্রেণীর মেয়ে। তোমরা ভুলে আমাকে বোন ডেকেছ। আমি শুদ্র। গোটা বসতিই শুদ্রদের। তোমার সাথী ও মেয়েটাকে পোশাকে আষাকে ক্ষত্রীয় মনে হচ্ছে। অবশ্য তোমার বেশ-ভুষা বলছে, তুমি মুসলমান। হিন্দু ধর্মে আমাদের নাপাক নিকৃষ্ট মনে করে অথচ তুমি আমাকে বোন ডাকলে।'

হাম্মাদ বললো, 'আমি এমন ধর্মকে ধর্ম বলে মানতে প্রস্তুত নই যে ধর্ম মানুষকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিতে কুণ্ঠাবোধ করে। আমার ধর্মে প্রকৃত মানুষ সে-ই যে আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, সৎকাজ করে। এছাড়া আমার ধর্ম পরধর্মসহিষ্ণু। বিধর্মীদের শ্রদ্ধার সাথে দেখা এ ধর্মের দাবী।

শুদ্র যুবতী কিছু বলতে যাবে এ সময় রত্না হুংকার মেরে হাম্মাদকে লক্ষ্য করে বলল, 'আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার আপনাকে কে দিল। আপনি আমাদের দৃষ্টিতে অপরাধী, বিধর্মী ও ম্লেচ্ছ। ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলার শাস্তি আপনাকে অবশ্যই পেতে হবে। যার যার ধর্ম তার তার কাছে। কোন কোন মানুষ পুজা করে। কারো উপাসনালয় মন্দির, কারো গীর্জা আর কারো মসজিদ। নরককে ভয় করে কেউ সৎকাজ করে আবার শয়তানকে ভয় করে কেউ ভগবানের ধ্যান করে।'

থামল রত্না। একাধারে অনেক কথা বলে ও হাঁপিয়ে ওঠল। ঘৃণা ও ধীক্কারের মাত্রা ওর বেড়ে গেল। দম নিয়ে বলল, 'আপনি নির্লজ্জ। আমাদের ধর্ম ভূ-তল থেকে আকাশাবধি পবিত্র। আপনার মনে লোভ না থাকলে আমাদের ধর্মের ওপর এভাবে ছুরি চালাতেন না। জ্ঞানীমাত্রই আমাদের সনাতন ধর্মের রহস্য বুঝতে সক্ষম। আমি অবশ্য আপনাকে কিছু বলব না। তবে একথা অন্য কোন হিন্দুর সামনে বলতেই আপনার গর্দান কাটা যাবে।

হাম্মাদ ঠান্ডা গলায় বলল, 'আমাকে ভুল বুঝেছ রত্না! আমি তোমার ধর্মের বিরুদ্ধে বলছি না। বলছি ধর্মাচারের বিরুদ্ধে। আমার প্রতিবাদ সেই আচার ও লৌকিকতার প্রতি মানুষ যা নিজস্বার্থে ধর্মের মাঝে ঢুকিয়েছে। নয়ত আমার ধর্ম পরমতসহিষ্ণু।'

রত্না তেঁতে ওঠল। বলল, 'তাহলে আপনার কথার মতলব আমাদের ধর্মে অনেক আচার-আচরণই মানুষে ঢুকিয়েছে?

শোন রত্না! কথা শেষ করতে পারল না। বিশ্বপাল এতক্ষণ চুপচাপ রত্নার বকবক কথা শুনছিল। বোনকে থামাতে গিয়ে সে বলল, 'চুপ কর হতচ্ছারী কোথাকার। জানিস তুই কার সাথে কথা বলছিস। হাম্মাদ আমার মহাপোকারী। তিনি একজন ধর্মপরায়ণ ও সরল মানুষ। তিনি আমার কাছে দেবতুল্য। এমন দেবতা যাকে পুজোর বেদীতে বসিয়ে পূজো করা যায়। ধর্মীয় উন্মাদনায় তুই অন্ধ হয়ে গেছিস। তাঁর বিরুদ্ধে যায় এমন কথা বললে আমি তোর যবান কেটে ফেলব।

বিশ্বপাল অতঃপর হাতজোড় করে হাম্মাদকে লক্ষ্য করে বলল, 'মহারাজ! বেয়াদব এক বোনের পক্ষ থেকে অসহায় এক ভাই আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছে।'

হাম্মাদ বিশ্বপালের দু'হাত নিজের হাতের মুঠোয় পুরে বললো, 'তুমি লজ্জিত হয়ো না। তোমার বোনের কথা আমাকে আহত করছে না। নিন্দামন্দ বলে সে যদি তার মনের গরল ঝাড়তে চায় তো ঝাড়ুক। এটা অপমান নয় আমার জন্য ছওয়াবের মাধ্যম বটে।'

এরপর শুদ্রানীকে লক্ষ্য করে ও বললো, 'বোন! তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দাও নি। বৃষ্টি ক্রমশঃ বাড়ছে। আমার সঙ্গী আহত।'

যুবতী কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললো, 'মহারাজ। আপনারা আকাশের বাসিন্দা আর আমি ধূলিম্লান পৃথিবীর। দ্বিতীয়তঃ আপনি আমায় বোন ডেকে ভুল করছেন। আমি শুদ্রানী আপনাদের সেবার জন্য সৃষ্টি হয়েছি।'

হাম্মাদ শান্ত-মিষ্ট কণ্ঠে বললো, 'তুমি নিজকে এতটা ছোট ভেবোনা। এই যে আকাশ আমার খোদার শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন। এই যে যমীন তার কুদরতী নিপুণ হাতের ছোঁয়া। মানব জাতি সকলেই আদমের সন্তান। মানবের সৃষ্টি উপাদান নির্বুদ্ধিতা ও তড়িতায়িত। এজন্য মাঝে মধ্যে আত্মমর্যাদা বন্টনে সে পদস্থলিত হয়ে থাকে। আমি তোমাকে আবার বোন ডাকছি।'

শুদ্রানীর চোখ বেয়ে কৃতজ্ঞতার অশ্রু নামল। হাম্মাদ সে অশ্রুতে প্রভাবিত হয়ে বলল, 'তুমি কাঁদছ বোন? যদি আমাদের আশ্রয় দিতে নাই চাও তাহলে সরাসরি বলে ফেল। খোদার যমীন প্রশস্ত। মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজে নেব।' বলে ও ঘোড়ায় পদাঘাত করে বলল, 'আমার কথায়, দুঃখ পেয়ে থাকলে মাফ করে দিও।'

শুদ্রানী দৌড়ে এক হাতে তার দোপাট্টা সংযত করে আরেক হাতে হাম্মাদের ঘোড়ার লাগাম ধরে বলল, 'দাঁড়াও দাদা! আমি তোমাকে অতি অবশ্যই আমার ঘরে নিয়ে যাব। তুমি আনন্দাশ্রু চিনতে ভুল করলে। আমার এ অশ্রু আনন্দের–ভয়ের নয় দাদা। এ জগতে কেউ কারো নয়। কেবল যার যার আত্মা তার। আমার কোন ভাই নেই। আজ থেকে কেউ আমাকে বোন বলে ডাকেনি। তুমিই প্রথম সেই মানুষ যে আমাকে বোন ডাকলে। শোন দাদা। আমার নাম বীনা। আমার বাবা-মা স্বর্গবাসী। ঘরে আছেন স্রেফ আমার ঠাকুরদা'। আমি তাকে বাপু সম্বোধন করি। তোমাকে দেখে তিনি বড্ড খুশী হবেন। একটু দাঁড়াও আমি নদী থেকে কলসী ভরে আনি।'

বীনার এ ব্যবহার আগে কজন শুদ্রানী দেখল। ওরা কিছু বলল না।

বীণা কলসী ভরতে নদীতে চলে গেলে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে রত্না বিশ্বপালকে বলল, 'তোমার এই দেবতা এক ম্লেচ্ছ যুবতীকে বোন ডেকেছে। আমাদের দৃষ্টিতে এখন ম্লেচ্ছ সেও। ওর হাতের যে কোন জিনিষ ছোঁয়াও অশুচি ও অবৈধ। আমি শুদ্রর বসতিতে যাব না। দাদা। তুমি ব্রাহ্মণদের মত রহমদিল হতে যেওনা। ক্ষত্রীয়রা হামেশাই বে-রহম হয়ে থাকে। অহিংসা ব্রাহ্মণদের ধর্ম হলে ক্ষত্রীয়দের ধর্ম হিংসা। এসো দাদা! দুভাই বোন মিলে এই ম্লেচ্ছ মুসলমানের সঙ্গ ত্যাগ করি। নতুবা সর্বত্র ম্লেচ্ছ হিসেবে আমাদের নাম চর্চা হতে থাকবে। বলতে পার এটা এক ধরনের ধর্মীয় মৃত্যু আমাদের।' বিশ্বপাল রত্নাকে লক্ষ্য করে ধিক্কার দিয়ে বলল, 'পাপিনী! মুখরা!! পাষানী!!! মুখ সামলে কথা বল। হাম্মাদের সাথে আমি শুদ্রানীর বসতিতে যাব অতি অবশ্যই। তুই যেতে না চাইলে যেখানে মন চায় যেতে পারিস। আমাদের ওপর নেমে আসা এই মুসিবতের কারণ সেতো তুই। মুখে লাগাম দে। নইলে তোর ক্ষমা নেই আমার কাছে। তুই কোন ধর্মের কথা বলছিস! ঐ ধর্মের কথা যাদের ঠিকাদারদের কাছে তোর সম্ভ্রমটুকু নিরাপদ নয়? আর তোকে নিয়ে আমি পাহাড়-জংগল চাষে বেড়াচ্ছি।'

বিশ্বপালকে খামোশ হতে হল। কেননা বীনা কলসীতে পানি ভরে হাজির। হাম্মাদের দিকে তাকিয়ে সে বলল, এসো দাদা! চলো।'

হাম্মাদ ঘোড়ায় পদাঘাত করল। রত্না অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওদের পিছু নিল।

২.

কিছুক্ষণ পরে ওরা শুদ্রদের বসতিতে প্রবেশ করল যার তিনদিকে স্বরসতী নদী আর একদিকে লতাপাতা আচ্ছাদিত সুউচ্চ পাহাড়। ওই পাহাড়ের চূড়ে দেখা যায় উঁচু এক মন্দির। এটি পোড়ো।

শুদ্রদের এ বসতির নাম সুদানীড়। বেশ বড়সড়। দূর-দুরান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কাঠের তৈরি বাড়ী। কোথাও কোথাও কাঠের দ্বিতল বাড়ীও দেখা যায়।

হাম্মাদ বিশ্বপাল ও রত্নাকে নিয়ে বীনা পরিষ্কার ছিমছাম একটি বাড়ীতে প্রবেশ করল। বাড়ীর আঙ্গিনা বেশ প্রশস্ত। এর এক কোণে একটি গাভী বাধা। ছোট একটা বাছুড় ওই গভীর দুধ চুষছিল। ওদের নিয়ে ঘরের বাইরে দাঁড়াল বীনা। পরে একাকী গেল অন্দরে। কাঁখের কলসী যথাস্থানে রাখল। পরে দরোজা ফাঁক করে হাম্মাদকে লক্ষ্য করে বলল, 'দাদা! আপনারা ভেতরে আসুন। এটাই আপনাদের বিশ্রামাগার।' সাথীদের নিয়ে হাম্মাদ ভেতরে প্রবেশ করল। বৃষ্টির মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় ওদের ঘোড়া ও উঠানের গাভী বাছুড়সমেত আরেকটি রুমে ঢুকাল বীনা।

বিশ্বপালকে পাজাকোল করে হাম্মাদ ভেতরে এনেছিল। বীনার কথামত ওকে জীর্ণশীর্ন ছাপপর খাটে শুইয়ে দেয়া হলো।

ঘরে আরেকটি খাট ছিল। রত্না বসল তাতে। বীনার উদ্দেশে হাম্মাদ বলল 'আমি ঘোড়াগুলোর জিন খুলতে যাচ্ছি। ও হ্যাঁ। তোমার বাপু কৈ! তাকে দেখছি না যে। বীনা খুশী গদগদ কণ্ঠে বললো, 'আমাদের চারটি বকরী আছে। বাপু ওগুলোর রাখালী করেন। বৃষ্টি পড়ছে। কাজেই উনি এই এলেন বলে।'

ঘোড়াশালে এলো হাম্মাদ। ওগুলোর জিন ও অন্যান্য সাজ সজ্জা খুলল। এই সময় রত্না বিশ্বপালের কাছে এলো। ওদিকে উঠানে শোনা গেল কারো উপস্থিতি। খুব সম্ভব বীনার ঠাকুরদা' এসেছেন।

উঠানে বীনা অনুচ্চস্বরে ওর ঠাকুরদার সাথে কথা বলছেন। হাম্মাদের সাথে আলাপচারিতার সবটুকু তুলে দিল ঠাকুরদার কানে। ওদের কথা শেষ হলে দেখা গেল হাম্মাদ বেরোচ্ছে ঘোড়াশাল থেকে। হঠাৎ কি ভেবে থেমে গেল ও। বীনাদের আলাপে বিঘ্ন না ঘটাতেই ওর এই থেমে যাওয়া। ইতোপূর্বে তিনি বীনাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ঘরে খাবার কিছু আছে কি-না। বীনা কম্পিত গলায় বলেছিল, মটকায় আছে যৎসামান্য আটা আর বোতলে সামান্য ঘি।

বৃদ্ধ ওকে বললেন, এখানে দাঁড়াও খুকী। আমি কোথাও থেকে ধার করে খাবার সংগ্রহ করি। পেয়ে গেলে ভাল, নয়ত ছাগল একটা না হয় বিক্রী করে দিলাম। ওদের সেবায় কোন প্রকার ত্রুটি না হয় খেয়াল রাখতে হবে।

বৃদ্ধকে বেরোতে দেখে হাম্মাদ আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো। বীনার ঠাকুরদাকে লক্ষ্য করে বলল, 'দাঁড়ান!

বৃদ্ধ থামলেন এবং হাতজোড় করে হাম্মাদের দিকে এগিয়ে এসে বিনয়াবনত হয়ে বললেন, 'রাম রাম মহারাজ!'

হাম্মাদও বুড়োর দিকে অগ্রসর হয়ে পা ছুঁয়ে বলল, 'আপনি শ্রদ্ধাস্পদ। আমার সামনে এভাবে বিনয়াবত হওয়া উচিত নয়।'

বৃদ্ধ কম্পিত গলায় বললেন, 'আমরা শুদ্র। আপনাদের দাসানুদাস মহারাজ। আপনাদের সেবাই আমাদের ধর্ম। আপনি আমার পাঁ ছুয়ে দিলেন যে!'

হাম্মাদ কথার মোড় বদলাতে গিয়ে বলল, 'হাম্মাদ আমার নাম। আমি বীনার ভাই। বৃদ্ধ খুশী গদগদ কণ্ঠে বললেন, 'আমার নাম সেবারাম। বীনার ঠাকুরদা।' ও আমাকে বাপু নামে ডাকে। আপনারা নিশ্চিত হোন। আমি সকলের খানার ইন্তেযাম করি।'

'বীনা ও আপনার কথোপকথন আমি সবই শুনেছি। বকরীর বাচ্চা বিক্রি করার দরকার নেই। আমার পকেটে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ রয়েছে। পথ আগলে বলল হাম্মাদ।

বীনা মাঝপথে বলল 'না দাদা! আপনি খরচ করবেন কেন?'

হাম্মাদ ওকে মৃদু বকুনি দিয়ে বলল, 'তুমি চুপ কর। বড়রা কথা বললে ছোটদের কথা বলতে নেই।

অতঃপর ও বৃদ্ধকে বলল, 'আমিই যাব আপনার সাথে।' বলে ও ঘোড়াশালে এলো। ঘোড়ার পিঠ থেকে খোলা একটি চটের পুটুলি বের করল। সেবারাম অনুনয়ের সাথে বললেন, 'আপনি ঐ পুটুলিতে কি আনবেন?'

'এই পুটুলিতে করে ঘোড়ার খাবার আনব।'

'আমাদের বাড়ীতে ঘোড়ার যথেষ্ট ভূষি রয়েছে। তবে খৈল নেই।'

'এখানে কোনো বাজার আছে কি?'

'আছে! বড় মাপের একটি বাজার আছে।'

'আমাদের কাছে অতিরিক্ত চারটা ঘোড়া আছে। ওগুলো বিক্রী করতে চাইলে কেউ কিনবে কি?' বৃদ্ধ অগ্রসর হয়ে ওর হাত ধরে বললেন, দুটো জিনিষই আমাকে দিন। ঘোড়া এনে দিন। ঘোড়া তাজাদম হলে হাটে উঠাতেই বিক্রী হয়ে যাবে।

ঘোড়া আনতে যাওয়ার পূর্বেই ও বললো, 'বীনা হয়ত আপনাকে বলেছে আমার সাথী যখমী। ওর চিকিৎসার জন্য কোন হেকিম পাওয়া যাবে তো?'

'আপনি ঘোড়া নিয়ে আসুন। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

রত্নার ইজ্জত হরনে উদ্যত চার কিডন্যাপকারীর থেকে সংগৃহীত ঘোড়া বুড়ার হাতে দিল হাম্মাদ।

বৃষ্টির গতি আগের চেয়েও বেড়ে গেল। বীনা এই সুযোগে ছাগলের দুধ দুইতে লেগে গেল। এদিকে রত্না বিশ্বপালকে বলতে লাগল, দাদা! নিশ্চয় আপনার খিদে লেগেছে। খাবেন কিছু! বিশ্বপাল ওর ওপর আগের থেকে রুষ্ঠ। এতদসত্ত্বেও ও নরম সুরে বলল, 'হাম্মাদ বাইরে গেছে। ও ফিরে না এলে আমরা খাবারে হাত দিতে পারি না। ও আসুক, তারপর খাব।'

রত্না খামোশ হয়ে গেল। এগিয়ে এলো দাদার কাছে। আস্তে আস্তে ওর মাথায় হস্ত পরশ বুলাতে লাগল। এক সময় ভালবাসার দাবী নিয়ে দাদার কাছে বলল, 'দাদা! আমি ওদের খাবার ও পাত্র স্পর্শ করব না। আমাদের কাছে বেশ খাবার

রয়েছে।' বিশ্বপাল নম্রতার সাথে বলল, 'তোর যাচ্ছে তাই কর। ধর্ম-কর্মে তোর বাড়াবাড়িটা আমি পছন্দ করি না। তবে খেয়াল রাখিস! হাম্মাদ এসে খেতে বসলে মুখ সামলে কথা বলিস। উল্টাসিধা কথা বললে আমি তোর সাথে ঝগড়া বাধিয়ে ফেলব হ্যাঁ। রত্না খামোশ হয়ে যায়। আবারো লেগে যায় মাথা বানাতে।

দু'ভাইবোন বাইরের প্রকৃতির প্রতি নযর বুলায়। হাম্মাদ আঙিনায় প্রবেশ করে। ওর কাধে ভুষির বস্তা। পীঠে একটা পুটুলি ঝোলানো। উঠানের মাঝে এসে ওর পা পিছলে যায়। মুখ থুবড়ে পড়ে যমীনের প্যাঁক কাদায়। কামরার ভেতর থেকে বিশ্বপাল চেচিয়ে ওঠে বলে, হাম্মাদ! হাম্মাদ! ব্যাথা পাননি তো!'

রত্না নিথর বসা। ওপাশের কামরা থেকে বীনা দৌড়ে বের হয়। ততক্ষনে হাম্মাদ উঠে দাঁড়ায়। শরীর থেকে কাদা-পানি ছাড়াতে লেগে যায়। বীনা ঘাবড়ে যায়। বলে, কি হোল দাদা।'

হাম্মাদ মুচকি হেসে বলল, 'পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম। বৃষ্টির কারণে মাটির যা অবস্থা। বীনা ওকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ভুষির বস্তা নিয়ে ঘোড়াশালে প্রবেশ করে। পরে এসে পুটুলি খোলতে থাকে। পুটুলি খোলতেই ওর চোখ ছানাবড়া। এতে রকমারী খাদ্যের সমাহার। হাম্মাদ বলে, 'নাও! তোমার খাদ্য সরঞ্জাম। এগুলো রাখবে কৈ।'

ওপাশের কামরা দেখিয়ে বীনা বললো, 'ওখানে।'

অতঃপর লাজুক কণ্ঠে ও বললো, 'দাদা! আপনি এত খাদ্য কিনতে গেলেন কেন? বেশ অর্থ ব্যায় হয়ে গেল না আপনার! সেবাতো আমাদের করার কথা। উল্টো আপনিই আমাদের সেবা শুরু করে দিলেন যে।'

মুচকি হেসে হাম্মাদ বলল, 'পাগলী কোথাকার। দাদাদের বুঝি বোনদের সেবা করতে নেই। তুমি আমার বোন। তোমার প্রয়োজন আমার দেখার দরকার নেই কি।'

'তুমি সাক্ষাৎ অবতার দাদা। এ সংসারে কেউ এভাবে কারো দিকে খেয়াল রাখেনি।' প্রভাবিত যবানে বলল বীনা।

হাম্মাদ কিছু বলতে যাচ্ছিল। এমন সময়, সেবারাম ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর সাথে জনৈক হেকিম। তার হাতে একটি দাওয়ার কৌটা। সেবারাম হেকিমকে নিয়ে বিশ্বপালের কামরায় এলেন। ওদিকে বীনা তখন রান্না ঘরে খাদ্য রান্নায় ব্যতিব্যস্ত।

হেকিমকে প্রবেশ করতে দেখে খাট ছেড়ে রত্না এক পার্শ্বে সড়ে দাঁড়ায়। রুগির কপালে হাত রেখে হেকিম সেবারামের দিকে তাকিয়ে বলেন, এ যখম হল কি করে?'

সেবারামের উত্তর দেবার পূর্বেই রত্নার দিকে তাকিয়ে হাম্মাদ বলে উঠল, এই যুবতীর ভাই ও। ওকে কিডন্যাপ করা হচ্ছিল। ওর দাদা ছিনতাইকারীদের বাধা দিয়েছিল। পরিনতিতে ওর এই হাল। ইতোপূর্বে ওরা এদের বাবা-মাকেও হত্যা করেছিল। ওরা দু'ভাইবোন প্রাণ রক্ষার্থে পালাচ্ছিল। পথিমধ্যে ওদের ওপর চড়াও

হয় দুর্বৃত্তরা। ঘটনাক্রমে আমি এই পথে যাচ্ছিলাম। আমি ওদের মদদে ছুটে আসি। প্রথমে বিশ্বপালকে সেবা করি। পরে ওর বোনকে দস্যুদের হাত থেকে উদ্ধার করি। এই হোল ওর যখমের নেপথ্য কাহিনী।'

হয়রান হয়ে হেকিম হাম্মাদের থেকে কাহিনী শুনলেন। শেষের দিকের কথাগুলোয় তার বিস্ময় বেড়ে যায়। চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আনন্দ প্রকাশপূর্বক তিনি বলেন, 'আমার দৃষ্টি আমার সাথে প্রতারণা করে না থাকলে তুমি বোধহয় মুসলমান।' হাম্মাদ বিনয়াবনত কণ্ঠে বলল, 'আপনার অনুমান যথার্থ। হ্যাঁ আমি মুসলমান। হেকিম ওর দিকে হস্ত প্রসারিত করে বললেন, আস্‌সালামু আলাইকুম। হেকিমের হাত মুঠিবদ্ধ করে হাম্মাদ বিস্ময়াভিভূত হয়ে বলল, এই বিজন অঞ্চলে আপনি!' সেবারাম বললেন, 'হ্যাঁ হেকিম সাহেব মুসলমান। নাম আবু বকর। হাম্মাদ আরেকবার উষ্ণভরে তার সাথে মোসাফাহা করলো। পরে বিশ্বপালকে চিকিৎসা করে দাওয়াই দিতে বলল।

হেকিম অগ্রসর হয়ে রত্নাকে সড়ে যেতে বললেন। সর্বাগ্রে তিনি যখমের পট্টি খুলে ফেললেন। বললেন, চিকিৎসার ধরন বলছে, তুমিই এটা বেঁধেছ কেননা যখমে এ ধরনের পট্টি কেবল মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানরাই বাঁধতে পারেন।'

উত্তরে হাম্মাদ সম্মতিসূচক মাথা হেলালো মাত্র।

হেকিম সাহেব পানি চেয়ে যখম ধুলেন। পরে ভিন্নধর্মী রং ছিটিয়ে যখমের স্থান শুকালেন। আরো পরে ভাল করে পট্টি বাধলেন। বিশ্বপালের কাধে হাত রেখে বললেন, 'আল্লাহ চাহেন তো খুব শীঘ্র তুমি সুস্থ হয়ে ওঠছো। এখন নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পার। আমি যাই তাহলে, কাল দেখা হবে।' পকেট থেকে কিছু পয়সা বের করে হাম্মাদ হেকিমের দিকে মেলে ধরে বলল, 'সামান্য এটুকু গ্রহণ করুন।'

হেকিম সাহেব নিতে অস্বীকারপূর্বক বললেন, 'আল্লাহ প্রদত্ত দান আমার কাছে কম নয়। এগুলো তোমার কাছেই থাক। এদেশে তুমি আগন্তুক। ওগুলোর প্রয়োজন আমার চেয়ে তোমারই দরকার বেশী। আমি নেব না।

হাম্মাদ জবরদস্তিমূলক তার থলেতে পুরতে গিয়ে বলল, 'এ আপনার শ্রমের সামান্য প্রাপ্তি। মুষলধার এই বৃষ্টি উপেক্ষা করে আপনি এসেছেন। সত্যিই আপনার সেবা ও দায়িত্ববোধে আমি ধন্য প্রীত।

হেকিম ওর হাত ধরে বললেন, চলো। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কালকে ওর চিকিৎসায় পরিবর্তন আনতে চাই।'

বাইরের গলিতে এসে ফের আবু বকর হাম্মাদের হাত মুঠোয় পুরলেন। কানে কানে বললেন, 'তুমি কোত্থেকে এসেছ?'

'নিশাপুর থেকে।'

'এখানে কি উদ্দেশ্যে?'

'ব্যবসার নিয়তে এখানে অনেকবার এসেছি। তবে এবার স্বরসতী তীরবর্তী ভীম সেন বসতিতে যাবার ইচ্ছে। ওখানকার বিদ্যানাথের কাছে চাকুরীর দরখাস্ত দেব। তিনি আমার অতি পরিচিত জন। অগাধ আস্থা তাঁর প্রতি।

চকিতে আবু বকর ওর চেহারা নিরীক্ষণপূর্বক বলেন, তোমার সৈন্যদৃষ্টি, বুদ্ধিমত্তা ও শৌর্যবীর্য বলছে, ব্যবসার উদ্দেশে কুদরত তোমায় পয়দা করেন নি। নিশ্চয়ই কোনো মহান উদ্দেশ্যে তিনি তোমার সৃষ্টি করেছেন। সে কাজে আমার জাতি ও ধর্মের উপকার ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

হাম্মাদ খামোশ দাঁড়িয়ে। হেকিম আবু বকর বলতে থাকেন, 'আমি চাচ্ছি না তুমি তোমার রহস্য ফাঁস করো। তবে আমার দোয়া থাকবে, যে উদ্দেশ্যে তোমার আগমন তা স্বার্থক ও সাফল্যমন্ডিত হোক।'

হাম্মাদ হেকিমের সাথে খামোশ চলতে থাকে। তিনি ওকে বলতে থাকেন 'জাতির দুরন্ত যুবক হে! বয়স ও অভিজ্ঞতায় তোমার চেয়ে সামান্য বেশী হওয়ায় একটা কথা শোন! এ সরেযমীনের মানুষ নানা স্তরে বিভক্ত। এদেশের মাটির খামির প্রতারণা ও ধুর্তামিতে পূর্ণ। এখানে তোমায় সম্মুখীন হতে হবে নানা প্রতারণা, শঠতা ও বেঈমানির। লাত ও ওজ্জার ভর্ৎসনাকারী বিশ্বনবীর প্রতি মোশরেকদের কুপমন্ডুকতা তোমাকে ছেয়ে নেবে অহর্নিশঃ।

তিনি খানিক থেমে আবারো বলেন, 'এখানকার চারদিকেই দেখবে, নানা মত নানা রঙ! রঙ ও মত দেখেই তুমি যে কোন সিদ্ধান্ত নেবে। প্রয়োজনে বুলবুলের কুজন ও পাপিয়া কুহুতান তুলবে। জরুরত পড়লে অগ্নিপর্বতের ভূমিকা নেবে। দেখবে ওরা তোমার অগ্নিমূর্তিতে প্রভাবিত হয়ে পড়বে। কোনো মহান উদ্দেশে তুমি একাকী এসে থাকলে জেনো, পঙ্গপালের কোনো রাজা বাদশাহ থাকে না। তারপর দেখেছো ওরা কি করে দলবদ্ধ হয়ে উড়ে যায়। মাখন যেভাবে দুধের ওপর প্রভাব বিস্তার করে সেভাবে তোমাকে প্রভাব বিস্তার করতে হবে। আমার ধারনা, গজনীর শাসকবর্গের সাথে তোমার সম্পর্ক। বাস্তবেও যদি তাই হয়, তাহলে বোধ করি মূর্তিপূজক ও পৌত্তলিক জাতি যারা আমাদের ম্লেচ্ছ সাব্যস্ত করে রেখেছে তাদের কবল থেকে মুক্তির সময় এসেছে আমাদের। মুসলমানদের হাতে পরাস্ত হয়ে ওদের অবস্থা 'বায়াল' ও হুবুল পুজক বনী ইসরাইলদের মতই হবে।'

কথা বলতে বলতে আবু বকর একটি দরোজার দিকে ইশারা করে বললেন, এই আমার ঘর। এসো না আজ আমার সাথে খানা খাবে। তোমাকে কিছু বলব, কিছু শোনব তোমার থেকে।

হাম্মাদ মিনতি করে বললো, 'আমাকে যেতে দিলে বরং খুশী হব। নয়ত ওরা আমার প্রতি সন্দিহান হয়ে পড়বে। কেননা ভীমসেনের বসতিতে বিদ্যানাথনামী যার বাড়ীতে আমার যাবার কথা সম্পর্কে তিনি ওদের মামা। ওরাও তার কাছেই যাচ্ছে। আপনার বাতলানো নসীহতানুযায়ী এদেশে আমাকে সতর্ক পদক্ষেপ নিতে হবে।'

উভয়ে একে অপরের সাথে মোসাফাহা করল। রাতের আঁধারে দু'টি প্রাণী গেল অদৃশ্য হয়ে। বাড়ীর দরোজায় দাঁড়িয়ে এক নিমিষে হাম্মাদের চলে যাবার পথে তাকিয়ে রইলেন হেকিম আবু বকর। নীল তারা খচিত আসমানের দিকে দু'হাত উঁচিয়ে তিনি দোয়াচ্ছলে বললেন, 'আয় আল্লাহ! আমার জাতির এই প্রহরীকে প্রভাতী সৌরস্নিগ্ধ দিনমনির মত ঔজ্জ্বল্য দান কর। তার চলার পথকে কর কুসুমাস্তীর্ন। এরপর তাঁর হাত চলে এল বদ্ধ দরোজার ছিটকিনিতে।

হাম্মাদের অন্তর্ধানের অবকাশে রত্না ওর ভায়ের সাথে মনের জমাট কথাগুলো আওড়ে নিল। হাম্মাদ উঠানে প্রবেশ করলে বীনা রান্না ঘর থেকে ওকে দেখে বলে ওঠল, দাদা। খানা খাবেন না।'

বিশ্বপালের কামরার দিকে ইশারা করে ও বললো, 'ওখানে নিয়ে যাও। আর শোন বোন! তোমার বাপুকে এদিকে আমার সাথে আসতে বল।'

হাম্মাদ ঘোড়াশালে গেল। সেবারাম ওখানে এসে বললেন, কি সেবা করতে পারি আপনার?'

ঘোড়ার পিঠে থাপপড় মেরে হাম্মাদ বলল, ঘোড়াকে চনা বুট খাওয়ানোর মত কোনো পাত্র বাড়িতে আছে কি? থাকলে নিয়ে আসুন।'

'পাত্র একটা কেন অনেক আছে। কিন্তু এক্ষনে আপনার ভূড়ি ভোজনের দরকার বেশী।' চনাবুটের বস্তা খুলে পাত্রে ঢেলে হাম্মাদ বলল, 'নিজের উদরপূর্তীর আগে বাকরুদ্ধ এ বোবা জানোয়ারগুলোকে পরিতৃপ্ত করতে চাই।'

সেবারাম ওর মানবতাবোধে হতবাক হয়ে কথা না বাড়িয়ে ওর মদদে লেগে গেল। উভয়ে মিলে পশুর খাবার যোগান দিল।

সেবারাম এক সময় রান্না ঘরে চলে গেলেন। হাম্মাদ হাত-মুখ ধুয়ে বিশ্বপালের কামরায় ঢুকলে রত্না ভায়ের খাট ছেড়ে সড়ে দাঁড়াল। হাম্মাদ বসল বিশ্বপালের পাশটিতে। খানিক নীরব থাকলো সকলে। নীরবতা ভঙ্গ করে হাম্মাদ-ই বললো, 'বিশ্বপাল! কিছু মনে না করলে একটা কথা বলি।'

'একটা নয় হাজারটা বলুন অবতার। আপনি আমার প্রতি গালি ছুঁড়লেও সেটাকে মনে কবর আশীর্বাদ।

হাম্মাদের মুখ ওর কানের কাছে নেমে এল। অনুচ্চ ও বিনয়ের কাকুতি নিয়ে ও বলল, এসো! আজকের রাতটা আমরা ধর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হই। এসো! ধর্মের দুচ্ছেদ্য বাধনে কষা রশিটা একটি রাতের জন্য হলেও ছিড়ে ফেলি। দোস্ত আমার। এসো ক্ষনিকের তরে ভুলে যাই, আমরা কেউ ম্লেচ্ছ, কেউ শুদ্র আর কেউ ক্ষত্রীয়। আজকের রাতটাতে ধর্মের ওই আওয়াজ ঢুকানোর কানে তালা দেই, যে আওয়াজ ম্লেচ্ছদের কেবল রাখালের জীবন যাপন করার কথা বলে। বেদ-বেদান্তের পবিত্র শ্লোকগুলো এক রজনীর জন্য শোনা বন্ধ করি। এসো মেজবানকে একটি ঘণ্টার জন্য হলেও এই উপলব্ধি দেই যে, মানুষ হিসেবে আমরা সকলে সমান। এখানে বর্ণ

বৈষম্য বলতে কিছু নেই। এখান থেকে চলে যাবার পর তোমার আমার রাহা ভিন্নতরো হয়ে যাবে। আমার ধর্মে কোনো মানুষের মনে কষ্ট দেয়া মহাপাপ। এসো বন্ধুবর ভুলে যাই শুদ্র মেজবানও একজন মানুষ। তার খাবার গ্রহনে কোন পাপ নেই। কি দোস্ত! আমার এই প্রস্তাবনায় তুমি ঘাবড়ে গেলে কি?'

প্রফুল্লচিত্তে বিশ্বপাল বললো, 'আপনি ধর্মের আত্মা ও সকালের সৌররশ্মির মত পবিত্র। আপনার প্রস্তাবনা মধু অপেক্ষা মিষ্ট ও জীবন সঞ্জবনী সুধা। হাম্মাদ! হাম্মাদ! আমি আমার মামা বিদ্যানাথের ওখানে মাঝেমধ্যে গিয়ে থাকি। মুসলমানদের সাথে তাঁর যথেষ্ট লেন-দেন রয়েছে। তাঁর কাছে আপনাদের ধর্মের উদারনৈতিক দিকগুলো আমাকে প্রভাবিত করেছে আগেভাগেই। আমি অঙ্গীকার করছি, আজ থেকে আমি জাত-পাত ভেদের বিরুদ্ধে মুখরিত হব। সাম্যতার যে বাণী ইসলাম রেখেছে ওটা বেশ পছন্দসই আমার। হাম্মাদ! আপনাদের রাসূলে আরাবীর বিদায় হজ্জের বানীও আমি মামার ওখানে শুনেছি। খুব সম্ভব সেই সময় বুঝি এসে গেছে যে সময়ের পরে আপনার আমার চলার রাহা হবে এক ও অভিন্ন।" না জানি এর পর বিশ্বপাল কেন খামোশ হয়ে গেল। পরে কথার মোড় ঘুরাতে গিয়ে বললো, আমার বিশ্বাস, যে ইশ্বর মানুষের প্রাণসৃষ্টি করেছেন অর্চনা ও ধ্যান কেবল এককভাবে তাঁরই করা উচিত।'

হাম্মাদ ও বিশ্বপাল কথা বলে যাচ্ছিল। ওপাশের খাটে তখন রত্না ক্রুদ্ধ ফনিনীর ন্যায় হাপাচ্ছিল। গোস্বায় খেয়ে যাচ্ছিল ওর তনুমন। ততক্ষনে বীনা খাবার নিয়ে কামরায় এলো। খাবার পরিবেশনে বীনা জাতিভেদ প্রথার স্বাক্ষর রেখেছে। ওদের ব্যবহৃত পাত্রে খাদ্য না এনে এনেছে বড়মাপের একটি পাতায় করে। হাম্মাদের সামনে রেখে ও বললো, দাদা! এই আপনাদের খাবার। আর দাদা! আপনার পরিধেয় বস্ত্র প্যাক কাদায় ভেজা। ওটা পাল্টে নিন। পরিধানের মত কাপড় না থাকলে বাপুর একসেট নিয়ে আসি।'

হাম্মাদ দাঁড়িয়ে বললো, পানি নিয়ে এসোতো বোন। আমি কাপড় ছেড়ে আসি। হাম্মাদ ওপাশের কামরায় চলে গেল। খানিক বাদে ফিরে এল। ওর পরনে চটবস্ত্র। বীনা তখনও কামরা ছাড়েনি। হাম্মাদকে দেখে ওর দুঃখের শেষ নেই। চটের পোশাক পরা মানুষ ওর জীবনে এই প্রথম। তাই বলে, দাদা! আপনি শেষ পর্যন্ত ঘোড়ার পোশাক পরলেন। কেন আপনার কাছে এছাড়া আর কিছুই কি নেই?'

'ধরে নাও ঘোড়ারটাই এক রাতের জন্য পরলাম। ও হ্যাঁ! তুমি কিন্তু এখনো পানি না এনে এখানে দাঁড়ানো!'

'দাদা! তোমাদের কাছে কোনো পান পাত্র থাকলে দাও! মুখ কালো করে বীনা বলল।

'কেন? তোমাদের কাছে নেই?'

'আছে। ভাবছি আমাদের পান পাত্র আপনারা ব্যবহার করেন কি-না! দেখছেন না আমাদের ব্যবহৃত পাত্রে খাবার না এনে এনেছি পাতায় করে।'

খাবারপূর্ণ পাতা এতক্ষণ হাম্মাদের নযরে পড়েনি। পাতাসহ খাবারগুলো ফেরৎ দিয়ে বললো, যাও! তোমাদের ব্যবহৃত পাত্রে খাবার নিয়ে এসো এবং তোমাদেরই পান করা জগ-গ্লাসে পানি আনো। তুমি আমার বোন! একভাই তার বোনের ব্যবহৃত পাত্র ব্যবহার না করলে আর কে করবে?'

· বীনা চলে গেল। খানিক পরে বড় প্লেটে করে রুটি-তরকারী ও জগে করে পানি নিয়ে এল এবং তা হাম্মাদের সম্মুখে রাখল। হাম্মাদ কাউকে আহবান না জানিয়েই খেতে লাগল। বিশ্বপালের মুখে তুলে দিয়ে সেও চিবানো শুরু করল। রত্না তার ঘোড়ার জিন থেকে খোলা পুটুলি খুলে কেবল নিজেদের খাদ্য গ্রহণ করল। ও না বীনাদের খাদ্য গ্রহণ করল, না ব্যবহার করল ওদের পানপাত্র।

বীনা খাবার দিয়ে চলে গিয়েছিল। এবার ও প্রবেশ করে এঁটো নিয়ে চলে গেল। যাবার সময় হাম্মাদকে জিজ্ঞাসা করল, আপনার খাট ওপাশের খালি কামরায় পেতে দেব কি।'

'না।' উঠতে উঠতে হাম্মাদ বলল, 'আমি ঘোড়াশালেই ঘুমাব। আর হ্যাঁ! তুমি এ কারণে আমার জন্য নয়া বিছানা কিংবা অন্য কিছু আনতে যেও না। আমার যে বিছানা আছে ওতেই চলবে। এমনকি আমি সে বিছানা পেতেই তবে খেতে এসেছি।

'আপনি বিছানা পেতে ফেলেছেন! বীনার কণ্ঠে বিস্ময় ওখানে না আছে খাট আর না অন্য কিছু। আমিতো কিছুই দেখলাম না।'

'ওখানে সবকিছুই আছে। আছে খড় কুটো। চটের ফরাশ। কুটোর ওপর ওই ফরাশ বিছালেই নরম গদী হয়ে গেল ব্যাস।' মুচকি হেসে বলল হাম্মাদ। বীনা মুখ কালো করে বললো, 'না দাদা! কুটোর পালাকে তোষক করে আপনাকে আমি ঘুমুতে দেব না। এখানেই আপনার খাটের এন্তেযাম করব। রাতের বেলা আপনার সাথীর দেখভাল করতে হবে না।

বীনার মাথায় স্নেহ পরশ বুলিয়ে হাম্মাদ বললো, 'আমার সাথীর চিন্তা তোমাকে করতে হবে না বোন। তার সহোদরা তো থাকছে তার পাশে। রাতে ও-ই ওর খেয়াল রাখবে। তাছাড়া হেকিম সাহেব তো ওর ব্যাথার এলাজ দিয়েই গেছেন। ওর সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন পড়বে পানির। সেটুকুর যোগানও দিতে পারবে রত্না। ওর কাছে মশক আছে। এরপরও যদি আর কিছু প্রয়োজন পড়ে তাহলে আমাকে ডেকে নিলেই চলবে।

বিশ্বপাল কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু হাম্মাদের ইশারায় ও খামোশ হয়ে গেল। বীনা অভিমানের সুরে বললো, 'আপনি কুটোর পালায় শুইলে আমি বাপুর কাছে নালিশ করব।'

'বুদ্ধিমতি বোনেরা ভাইদের নালিশ কারো কাছে করে কি?' বলে হাম্মাদ বিশ্বপালকে শুভরাত্রী বলে বেরিয়ে গেল।

ও আর বীনা এল ঘোড়াশালে। সত্যিই কুটোর পালা বিছিয়ে হাম্মাদ ঘোড়াশালের কোণে বিছানা করেছিল। ওর ফরাশ চটের, লেপও চটের। শেষ পর্যন্ত বীনার

অভিমান কাটতে হাম্মাদ বললো, 'বোন! এক ভাইয়ের জন্য যদি কিছু করতেই হয় তাহলে আমার কর্দমাক্ত এই কাপড় ধুয়ে দাও।'

চুপচাপ কর্দমাক্ত কাপড় নিয়ে বীনা বেরিয়ে গেল। হাম্মাদ ঘোড়া, বকরী ও বাছুরের খাদ্য পরিবেশন করে বিছানার কোলে আশ্রয় নিল। বাইরে তখনও অঝোর ধারায় বেয়ে পড়ছে আকাশের কান্না।

নিশুতি রাতের উদ্বিগ্ন ক্ষনগুলোর দমরুদ্ধ হয়ে আসছিল। আলো-আঁধারী করছিল কানাকানি। পূর্ব দিগন্তের কালো চাদর সড়ে সেখানে ফুটতে যাচ্ছিল জগৎজোড়া আলোর ঝলকানি।

ঘোড়াশালে হাম্মাদ আদায় করল ফজরের নামায। বাদ নামায ও অবোধ পশু-পাখির খাদ্য-খাবারের যোগানে লেগে গেল। আচমকা সেখানে এলো সৌন্দর্যের পিরামিড রত্না। রাতের দীর্ঘ উদাসীনতা তার ঘুম কেড়ে নিলেও কেড়ে নিতে পারেনি দুধে আলতা মেশানো সৌন্দর্য সুষমাটুকু। ঘোড়াশালে প্রবেশ করেই হাম্মাদকে লক্ষ্য করে ও বলে ওঠল—

'আপনার কাছে আমার কিছু কথা আছে।'

হাম্মাদ ওর দিকে না তাকিয়ে ঘোড়াকে ভুষি দিতে দিতে বলল, 'বলে ফেল।'

'কৃতজ্ঞতার ভারবাহী বোঝা চেপে আপনি আমার দাদার ধর্ম কর্ম চুলোয় দিয়েছেন। ক্ষমাহীন পাপ করেছেন আপনি। রাজকীয় ক্ষত্রীয় হওয়া সত্ত্বেও তাকে আপনি সমাজের নিকৃষ্ট ম্লেচ্ছতে নামিয়ে এনেছেন, এমনকি সেজেছেন তার পথ নির্দেশকও। আপনি জানেন আমরা হিন্দু, আপনি মুসলমান। আপনাদের ধর্মে যাই থাকুক আমরা ম্লেচ্ছদের খাদ্য-পানীয় স্পর্শ করিনা। করলে হয়ে যাই ম্লেচ্ছ-যবন। তারপরও আপনি আমার ভাইকে এক ম্লেচ্ছ যুবতীর হাতের খাদ্য স্পর্শ করানোর দুঃসাহস দেখালেন কেন?

হাম্মাদ রত্নার মুখোমুখি হয়ে বলল, 'তুমি অবতার ও মূর্তির চোখে সকলকে দেখে থাক।' পরক্ষনে রত্নার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'শোন দেবী। আমি তোমার দুশমন নই। রত্না হাম্মাদের কথা শেষ করতে না দিয়ে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠল। ঘৃণায় ও ক্রোধে ফুঁসে উঠে হাম্মাদের হাত সড়িয়ে বলল, 'যান! আমার শরীরকে ছোঁবেন না। এক মুসলমান কোন ক্ষত্রীয়া নারীর দেহে হাত রাখলে তার ধর্ম-কর্ম বৃথা যায়। হিন্দু নারীরা মনে করে একে মৃত্যুর শামিল।'

হাম্মাদের গলার স্বর পরিবর্তন হয়ে গেল। ও বললো, 'এতদিন তুমি কেবল আমার স্নেহ, মমতা ও চরিত্রের উদারনৈতিক দিকটা দেখেছ মাত্র। পক্ষান্তরে আমার ক্রোধ, বীরত্ব ও সিংহ সুলভ আকৃতি দেখলে জীবন-মরণ বিলকুল ভুলে যাবে। আত্মমর্যাদানুযায়ী কথা বল। আমি তোমার কেনা গোলাম নই। তুমি কি আমাকে এই জ্ঞান দিতে চাও যে, তোমার ভাইয়ের জীবন আর তোমার ইজ্জত বাঁচিয়ে আমি ভুল করেছি? কাজেই তুমি যাচ্ছে তাই বলবে ও করবে।'

পরিধেয় বস্ত্রের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে একটা তোড়া বের করে রত্না। রোমাঞ্চিত সুরে বললো, 'বলুন! আপনার উপকারের মূল্য কত?'

'জীবন ও ইজ্জত বাঁচানোর বদলা বিনিময় হয় না রত্না। যাও! আমার সামনে থেকে চলে যাও। তোমার উপস্থিতি আমার জন্য ক্ষতিকর সাব্যস্ত হতে পারে। আমাকে রাগিয়ে তুলো না।'

তোমাকে মনে হচ্ছে নিম্নমানের হীনমন্য বিকারগ্রস্ত যুবক। তোমার খোদা ও রাসূলের প্রতি পরিপক্ক ঈমানদার কেউ হলেও আমার এই তোড়া দিয়ে তাকে কেনা সম্ভব। তুমি তো কোন ছাড়। তোড়া সামান্য দেখেছ বুঝি! এর ভেতরের পুরোটাই স্বর্ণমুদ্রা। একরাশ তাচ্ছিল্য ছড়িয়ে পড়ল রত্নার মুখ থেকে।

হাম্মাদের ধৈর্যের বাঁধ টুটে যায়। রক্তিম হয়ে ওঠে ওর মুখমণ্ডল। উত্তেজনায় ওর ডান হাত উঠে যায়। ঠাস্ করে প্রচণ্ড এক চড় বসিয়ে দেয় রত্নার গালে। বেশ কয়েক হাত দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ে রত্না। কষ্টের তোড়ে ওর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে আর্তচিৎকার। ওর কোমল গন্ডে বসে যায় হাম্মাদের পাঁচটি আঙুলের লাল কালো ছাপ। বিলকুল তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়ে ছ্যাঁকা দেওয়ার মত অবস্থা। হাম্মাদের জলদগম্ভীর আওয়াজে রত্নার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে।

'ঐ মেয়ে! তুমি আমার আল্লাহ্ রাসূলকে নিয়ে টিপ্পনি কেটেছো। আল্লাহ আমার গৌরব, রাসূল আমার সেই গৌরবের প্রতিভূ। তুমি আমার ঈমান নিয়ে যতটা ঠাট্টা করবে ততটা আমার ঈমানী জোশ বাড়তে থাকবে। তোমার ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য এ বিষয়ে যতটা বাড়বে আমার কথা ও কর্মে তার রূপ তার চেয়ে বেশি আসবে। আর হ্যাঁ শুনে নাও! আমি সেই জাতির সন্তান যাদের জীবনে [illegible] ও [illegible] বালাই নেই। ফের তোমার মুখ থেকে এ ধরনের কোন কথা বেরোলে গোস্তাখ সে যবান কেটে দেব আমি। যে ধর্মের প্রতি আমি বীতশ্রদ্ধ যে ধর্ম মানুষকে পশুতুল্য করে বানায়। সেই ধর্মের বিরোধী আমি জাতিভেদ সৃষ্টি করে যা একজনকে বসায় শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অপরজনকে গোলামের জিন্দানে। দূর হও আমার সম্মুখ থেকে। তোমাকে যেন আর না দেখি আমি। সামনে আমার সাথে কখনও কথা বলার চেষ্টা করো না। তোমার ভাই যতটা অভিজাত, তুমি ততটা [illegible]।'

কম্পিত অপমানাহতকে রত্না দুহাতে গাল চেপে খোয়াবগাহ থেকে বেরিয়ে গেল। হাম্মাদ লেগে গেল তার কাজে।

রত্না গালে হাত দিয়ে চেহারা ঢাকা অবস্থায় কামরায় ঢুকে দেখল শিশুপাল জাগ্রত। শিশুপাল ওকে দেখেও না দেখার ভান করে সামনের জানালার দিকে তাকাচ্ছিল। রত্নার চোখমুখ ফোলা ও অশ্রুসজল।

শিশুপাল ওকে দেখে ক্রোধকম্পিত সুরে বললো, তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে হাম্মাদ মাত্র একটি চড় কষে দিয়েছে যার নিশানা তুমি লুকোতে চাইছ রত্না। তুমি নারী নও পেত্নী। আমি শুয়ে শুয়েই তোমাদের কথোপকথন আগাগোড়া শুনেছি।

হাম্মাদ মানুষ নয় অবতার। তুমি তার স্নেহ সুন্দর হৃদয়টাকে দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছ। অপমান করেছ তাঁর আল্লাহ রাসূলকে। তার ধর্মকে কটাক্ষ করেছ। সওদা করতে চেয়েছ তার উপকারককে। কি তুমি মনে করেছ, আমাদের ধর্ম মানুষকে ঘৃণার শিক্ষা দেয়? রত্না! হায়! তুমি যদি আমার বোন না হতে আর আমি যদি তোমার ভাই না হতাম। আহা! তুমি নিজের পাশাপাশি আমাকেও ওর চোখে ছোট করে দিলে। আমি ওর মুখ দেখব কি করে।' শেষের দিকের কথাগুলো বলতে গিয়ে বিশ্বপালের কণ্ঠ ধরে এলো।

রত্না খাটে বসে গেল। দু' হাটুর মাঝে চেহারা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল ও।

ঘোড়াশালের কাজ শেষ করে হাম্মাদ কামরায় প্রবেশ করল। বৃষ্টি পড়ছে অঝোর ধারায়। উঠানে হাটু পানি। রান্না ঘর থেকে ধোঁয়া উড়ছে। সেবারাম ও বীনা ওখানে নাশ্‌তা প্রস্তুতিতে মত্ত। হাম্মাদ বিশ্বপালের কামরায় এলো। ওর ললাটে হাত রেখে বললো, কেমন লাগছে বিশ্বপাল!'

হাম্মাদকে প্রবেশ করতে দেখেই নিজকে সামলে নিয়েছিল রত্না। হাম্মাদের হাত ধরে বিশ্বপাল বললো, 'তোমার মত সহানুভূতিপরায়ণ অবতার আর বীনার মত দেবী থাকতে খারাপ লাগতে পারে কি! হাম্মাদ! তুমি কিছু মনে না করলে একটা কথা বলতাম।'

'বলো! কি বলতে চাও।'

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বিশ্বপাল বলল, 'কথাটা গতকালই তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তোমার ক্লান্তি অবসাদগ্রস্থ শরীরের দিকে তাকিয়ে আর বলা হয়নি। শোন! পৃথ্বিরাজের বাহিনী দু একজন নয়। ওদের লোকজন প্রতিটি জনপদে আমাদের খুঁজে ফিরবে। দুষ্টদের একটা দলকে না হয় আমরা শেষ করেছি, এমন হাজারো দল ইতোমধ্যে দেশময় ছড়িয়ে দিয়ে থাকবে স্বৈরাচারী পৃথ্বিরাজ। যে বৃষ্টির কবলে আমরা পড়েছি একে ভগবানের অপার কৃপা বলতে পার। এই বৃষ্টি মাথায় করে আমরা ভীমসেন পৌঁছুতে পারি। আমার আশা সন্ধ্যার ছায়া নামতেই আমরা কোচ করব। স্বরসতীর উপকূল ধরে চললে আমাদের গন্তব্য বড় জোড় তিনক্রোশ হবে। রাতে সফর করাই ভাল। বর্ষাকাল শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলে আমরা ধরা পড়ে যেতে পারি। জানি বর্ষামাত্র রাতে সফর করা কষ্ট সহিষ্ণু ও ঝুঁকিবহুল। এতদসত্ত্বেও আমি মনে করি কৃতজ্ঞতার যে বাধনে তুমি একবার বেঁধেছ সেই বাধনটা আরেকটু মজবুত করতে আমাদের মামাবাড়ী পৌঁছে দিয়ে এসো।'

বিশ্বপালের ললাটে হাত রেখে হাম্মাদ বললো, 'তোমার কথাতো ঠিক কিন্তু এই বর্ষামুখর রাতে সফর করাটা তোমার যখমের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে। সে যাহোক আমি সেবারামের সাথে আলাপ করে দেখি। তিনি যদি গরুগাড়ী ঠিক করে দেন তাহলে আজরাতেই আমরা সফর করব। নাও! তোমরা কথা বল। আমি সেবারামের সাথে কথা বলে আসি' বলে হাম্মাদ উঠে দাঁড়াল।

রান্না ঘরে প্রবেশ করল হাম্মাদ। ওকে দেখামাত্রই বীনা বলে উঠল, এসো দাদা! ও একখানা পিড়ি এগিয়ে দিল। হাম্মাদ পিড়িতে বসল। বলল সেবারামকে লক্ষ্য করে, আপনাকে আরেকটা কষ্ট দিতে চাই।'

'একটা কেন আপনাদের জন্য হাজারটা কষ্ট করতে রাজী আমি।'

'এখানে গরুর গাড়ী পাওয়া যাবে কি। আমার সঙ্গী আজ সন্ধ্যার পর পরই সফর করতে চায়। তার জন্য ছই সর্বস্ব গরুর গাড়ী দরকার। কেননা বৃষ্টির মধ্যে খোলা গাড়ীতে চড়া তার জন্য রীতিমত কষ্টবহুল।

'গরুর গাড়ী। এ এলাকায় ঠাসা। জঙ্গলের কাঠ আমরা গরুর গাড়ীতে করেই শহরে নিয়ে যাই। তা তোমরা যাবে কোথায়?' প্রশ্ন সেবারামের।

'আমরা ভীমসেন যাব। আমরা চলে যাবার পর কোন দুশমন তালাশে এলে বলো, নগর কোটের পথে রওয়ানা হয়েছি আমরা।'

'সেচিন্তা তোমাদের না করলেও চলবে। ওদেরকে আমি এটা সেটা দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারব। তারপরও এই বৃষ্টি— কাদায় তোমাদের রওয়ানা করা ঠিক হবে কি?'

বীনা সেবারামের কথায় মাঝপথে বলল, হাম্মাদ দাদা! বর্ষাস্নাৎ স্যাঁৎসেঁতে মওসুমে ভীমসেনে সফর করা সমীচীন নয়।'

হাম্মাদ চকিতে প্রশ্ন করল, কেন? পথে কোন বিপদাশংকা আছে কি!'

হ্যাঁ দাদা! বড্ড ভয়াল আশংকা। ভীমসেন যাবার রাস্তা দুটি। তন্মধ্যে একটি স্বরসতী উপকুল ধরে। এ পথেই আপনি এসেছেন। রাস্তাটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ, এবড়ো থেবড়ো। বর্ষামুখর দিনে এর সর্বস্থানে ভাঙ্গন দেখা দেয়। গরুর গাড়ীতো দুরে থাক মানুষ চলাই দুষ্কর হয়ে পড়ে। এ পথের দৈর্ঘ ৬ ক্রোশ।

দ্বিতীয় রাস্তা পূর্বপ্রান্ত দিয়ে। কিছুদুর যাবার পর একটি কাঠের পুল দেখবেন। এ পথে ভীমসেন যাওয়াটা খানিক সহজ। দৈর্ঘ মাত্র তিন ক্রোশ। কিন্তু এ পথটি বেশকিছু দিন হল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কেউই এ পথে যাবার সাহস করে না।' হাম্মাদ বড় চোখ করে বীনার দিকে তাকাল,

'আচ্ছা! ভয়াল দিকটি কিসের?

'বাপুর কাছ থেকেই শুনে নিন।

সেবারামকে লক্ষ্য করে হাম্মাদ বলল, 'বলুন! এ পথ ভয়াল কেন?'

সেবারাম গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। বললেন, সে এক প্রাচীন কাহিনী, ভয়াল উপাখ্যান।

'বলুন! আমি শুনতে চাই। হাম্মাদের কণ্ঠে আশার সুর।

'শোন তাহলে। বেশ ক'বছর আগের কথা। আমার বসতির উত্তর পার্শ্বে গীলন নদীর দিকে পাহাড় টিলায় একটি মন্দির ছিল। ওটি এখনও আছে। ওখানে মথুরা নামী একটি বসতি আছে। মনোহর লাল নামক এক যুবক ব্রাহ্মণ সেখানে বসবাস

করতেন। ইনিই মনোহর মণ্ডলা নামে খ্যাত। তিনি অনেকা ঠাকুরে যুবতীকে ভালবেসে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অনিন্দসুন্দরী যুবতী ঘৃণাভরে তার এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

ওইদিন শোকে মনোহর মন্দিরের পেছন দিকস্থ বনে চলে যান এবং যোগ—তপস্যায় নিমগ্ন থাকেন। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস। মনোহর ছ্যাঁকা খাওয়া জীবন নিয়ে ধুঁকে ধুঁকে এক সময় ওখানেই মৃত্যুবরণ করেন। পরজন্মে তিনি এক ভয়ঙ্কর বাঘের রূপ ধারণ করেন। পরে তিনি ওইরূপে মণ্ডলাবাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ জ্বাল মেটাতে থাকেন। বসতিতে হিংস্র হামলা করেন। মানুষ প্রাণী, জীব জানোয়ার কাউকেই তিনি ছাড়েন না।

কথিত আছে তিনি মণ্ডলার অনেকা যুবতীকে উঠিয়ে নিয়ে জংগলে নৃশংসভাবে হত্যা করেন।

ওই যুবতী ব্রাহ্মণের শক্তিতে পরজন্মে বাঘিনীর রূপ ধারণ করে এবং তার সাথে মন্ত্রীবন্ধন বসাতে থাকে। বাঘের হামলায় অতিষ্ঠ হয়ে মণ্ডলাবসতির লোকজন ঘরদোর ছেড়ে নদীর ওপারে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং এক নয়া বসতি স্থাপন করে।

এদিকে সেই মন্দিরটি এক ভয়াল বিভীষিকারূপ ধারণ করে আছে। কেউই সেখানে যেতে সাহস করে না। জানা গেছে ওই বাঘ-বাঘিনী ওই মন্দিরে বাস করছে। মন্দিরের কাছ ঘেঁষে যে রাস্তাটি চলে গেছে মন্দিরের অলিন্দে দাঁড়িয়ে ওরা তা পর্যবেক্ষণ করে কোনো পথিককেই ওই পথে যেতে দেয় না।

হাম্মাদ ঘৃণাভরে ফেঁতে উঠে বললো, 'তোমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী মানুষ পরজন্মে বাঘ সাজে এই তো! আর সেই সব প্রজন্মই মণ্ডলার পথ আগলায়?'

সেবারাম বললেন, 'বিশ্বাস না করে করব কি মহারাজ! হিন্দুধর্ম তো পরজন্মে বিশ্বাসী।

'কিন্তু আমার ধর্মে এ বিশ্বাসের কোনো ভিত্তি নেই। মানুষ মৃত্যুর পরে পুনরায় জন্ম নেয় না। ওই বাঘ পণ্ডিত মনোহর লাল নয়। নয় সেই বাঘিনীও কোনো নারী, যে পুনর্জন্ম লাভ করেছে। ও দুটো জংগলের সাধারণ প্রাণী মাত্র। অন্য কোনো কারণে হয়ত ওরা বসতি বিরান করে চলেছে। হতে পারে ওদের কোনো শাবককে বসতির কেউ উঠিয়ে নিয়েছিল। এজন্য ওরা প্রতিশোধ নিয়ে চলেছে। যাই হোক আমি অন্ততঃ এই বিশ্বাস করি যে, বাঘটা মনোহর লাল নয়। এ আমার ধর্ম বিরূপ আকীদা এবং আমি একে মেনে নিতে পারি না। ইতোপূর্বে না গেলেও তোমার কথা শোনার পর আমাকে ওই পথে যেতেই হবে। আমরা যদি সুস্থ-স্বাভাবিক ওই পথাতিক্রম করতে পারি তবে এই অপবিশ্বাসের যবনিকাপাত ঘটবে জেনো। বাঘ—বাঘিনী আমার ওপর হামলা করলে ওদের প্রাণপাত করে প্রমাণ করব ওরা জংগলের নিছক জন্তু মাত্র। একবারো একটা উপকার এই হবে যে, মানুষের কুসংস্কার শেষ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত লোক চলাচলের জন্য পথটা উন্মুক্ত হয়ে যাবে। যাহোক আমার জন্য একটা গরু গাড়ীর ব্যবস্থা করে সর্বশেষ সহানুভূতিটুকু করো।'

সেবারাম কিছু বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় দরোজায় করাঘাত পড়ল। তিনি বললেন, দেখি এসময় আবার কে এলো'। হাম্মাদও তার সাথে বেরোল। সেবারাম দরোজা খুলে দেখলেন, বৃদ্ধ আবু বকর দাঁড়ান। সেবারাম বড্ড খুশি গদগদচিত্তে বললেন, আসুন! আসুন!! হেকিমজি!!!'

হেকিম সাহেব হাম্মাদকে লক্ষ্য করে বললেন, গতকাল তোমার সাথে আলাপ করার প্রতিক্রিয়ায় আমি গত রাতটা ঘুমোতেই পারিনি। আবার রাতে বিছানায় কেবল এপাশ-ওপাশ করেছি। কখন সকাল হবে এই আশায়। তোমার সাথে দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের বড্ড সাধ ছিল। সাথে নিয়ে এসেছি তোমার সঙ্গীর ওষুধও। ও এখন ঘুমিয়েছে কি-না।'

হাম্মাদ বিশ্বপালের কামরার দিকে যেতে গিয়ে বলল, 'আসুন আমার সাথে। ও সজাগ আছে। হেকিম সাহেব হাম্মাদের সাথে কামরায় প্রবেশ করলেন। রত্না তার খাটে যথারীতি উপবিষ্ট। বিশ্বপাল হেকিম সাহেবকে দেখামাত্রই প্রনাম ঠুকল। বিনয়ভরে তার দিকে তাকাল। তিনি যখমের পুনঃপুনঃ বেন্ডিস খুলে নয়াবেন্ডিজ বেধে দিলেন। ততক্ষণে রান্নাঘর থেকে বীনা এসে ওদের সামনে দাঁড়াল। ওষুধ লাগিয়ে হেকিম হাম্মাদকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি আমার সাথে বাইরে এসো। তোমাকে কিছু কথা বলতে চাই। রাতে আমার পরিবারে তোমার কথা আলোচনা করেছিলাম। তারা তোমার সাথে দেখা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।'

বীনা বলল, 'হেকিমজি! খাদ্য প্রস্তুত। খেয়ে দেয়ে না হয় তাকে আপনাদের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন।'

হেকিম বললেন, আমাদের ওখানে ওর জন্য খানার টেবিলে অপেক্ষায় সকলে।

বীনা বলল, না না তা হয় না। শুধু উনি নন, এখানে ভোজন করতে হবে আপনাকেও। খাবার রেডি। সামান্যও অপেক্ষা করতে হবে না। আমি নিয়ে আসছি।

বীনা বেরিয়ে গেল! তড়া করেই সকলের জন্য নিয়ে এল। রত্না ছাড়া সকলে খেতে লাগল। হেকিম সাহেব প্রশ্ন তুললেন ওকে খেতে না দেখে। বললেন, 'বাহ্! আমরা খাচ্ছি আর মেয়েটাকে তোমরা কেউই খাবার আমন্ত্রণটুকু জানালে না!

বিশ্বপাল ঘৃণা বিমিশ্রিত কণ্ঠে বললেন, ও কথা না বলার শপথ নিয়েছে। বাড়ী গিয়েই নাকি মুখ খুলবে এর আগে নয়।' সকলে খামোশ খেয়ে যেতে লাগল।

বীনা থালা-বাটি উঠাতে লাগলে হাম্মাদ হেকিম সাহেবকে বললেন, আমি আপনাকে আরেকটা তকলীফ দিতে চাই।'

'তোমার দেয়া তকলীফকে আমি সৌভাগ্য মনে করব। বলো, তুমি কি বলতে চাও।'

'আমাদের জন্য একটা গরু গাড়ী ঠিক করে দিন। আমার সঙ্গী আজ রাতেই রওয়ানা হতে চায়। ওর তবিয়তও তেমন একটা ভালো নেই। তাছাড়া এ বর্ষামাৎ রজনীতে ওর বেরোনো দরকার।'

'গরু গাড়ী একটা কেন, কয়েকটা দেওয়া সম্ভব। এ নিয়ে তোমাকে না ভাবলেও চলবে।'

'গরু গাড়ীওয়ালা আপনার একান্ত কাছের মানুষ হতে হবে। তাকে জিজ্ঞেস করলে যেন বলতে পারে, ভীমসেনের স্থলে আমরা নগরকোট যাচ্ছি।'

'চলো আমার সাথে গরুগাড়ী নিয়ে আসবে। আমার জানামতে খুবই ধীমান ও চৌকস এক গরুগাড়ী ওয়ালা আছে। তুমি নিজেই তার সাথে কথা বলবে। আমার আশা, সে তোমার মনের কথা বুঝবে।'

মুষলধার বৃষ্টি উপেক্ষা করে ওরা বেরিয়ে গেল। বৃষ্টি থেকে বাঁচতে হেকিম চামড়ার একটা চাদর মুড়ি দিয়েছিলেন। এরই অর্ধেকটা তিনি হাম্মাদকে দিলেন। উভয়ে কথা বলতে বলতে বাজারের গলিপথে এসে গেল। হেকিম বললেন, 'আমার বাড়ীটা এদিকে। এই তল্লাটের পুরোটাই মুসলিম অধ্যুষিত।'

'এই তল্লাটে মুসলিম বসতির সংখ্যা কত?'

'বসতি তা অনেক। মুসলমান হবার পূর্বে আমরা' বলে খানিক ইতস্ততঃ করে আবু বকর বললেন, শুদ্র ছিলাম। সুলতান মাহমুদ গযনবীর ভারতবর্ষ আক্রমনের সময় আমাদের পূর্ব পুরুষ মুসলমান হয়ে যায়। এক্ষনে আমরা অত্র এলাকায় সংখ্যাগুরু।' কথা বলতে বলতে একটি দরোজার সামনে এসে ছিটকিনিতে হাত রাখলেন হেকিম সাহেব। উঁচু আওয়াজে ডেকে বলেন, ইসমাঈল! ইসমাঈল!'

খানিক বাদে সুন্দর এক জোয়ান দরোজা খুলে দিল। হেকিমকে দেখামাত্রই সে বলে ওঠল, হেকিম সাহেব! আপনি বাইরে কেন ভেতরে আসুন! পরে হাম্মাদের দিকে তাকিয়ে সে বলল, ইনি? হ্যাঁ। পরিচয়টা তার কাছেই জেনে নাও। ও মুসলমান। আমাদেরই জাতি ভাই। নাম হাম্মাদ। গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিশাপুর থেকে এসেছে। সে এমন এক কাজ যা তোমার আমার ও আমাদের ধর্মের সকলের জন্য অতি জরুরী। রাতারাতিই তাদেরকে তোমার ভীমসেন প্রদেশে পৌঁছে দিতে হবে। একাকী হলে এতক্ষণে ঘোড়ায় চেপে সে পৌঁছে যেতে পারত। কিন্তু ওর সাথে রয়েছে জনৈক যুবক ও তার বোন। যুবকটি মারাত্মক যখমী। তার এলাজ করেছি আমি। ওই যখমীর জন্যই গরুগাড়ী। বুঝতেই পারছ বৃষ্টির মাঝে ঘোড়ায় চাপা তার জন্য যুক্তিযুক্ত কি-না।

'হেকিম সাহেব! উনি যখন আমাদের জ্ঞাতি ভাই। এখন ভীমসেন কেন হাসানপুর (দিল্লী) যেতে চাইলেও আমার আপত্তি নেই।

'স্বরসতী উপকুল ধরে যেতে বললে তুমি আবার বেকে বসবে না তো?' প্রশ্ন হাম্মাদের।

ইসমাইলের মুখ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। সে খানিক নিরসকণ্ঠে বলল, 'পোড়ো মন্দিরের ওই পথ দিয়ে গেলে কেউ জীবিত ফিরে আসে না।'

হাম্মাদ গর্জে উঠে বললো, 'হিন্দুদের মত তুমিও ওই অপঃবিশ্বাসে বিশ্বাসী? তুমিও কি মনে করো, মন্দিরে বসবাসরতঃ বাঘ পন্ডিত মনোহর লালের পরজন্মের রূপ, আফসোস! এই কুফ্‌রী বিশ্বাস কোনো মুসলমানও রাখতে পারে?

'না না! আমাদের ধর্মে এ ধরনের কুসংস্কারের কোন আশ্রয় নেই।' হাম্মাদ আগে বেড়ে ইসমাইলের পিঠ চাপড়ে বললো, ' শোনো! আমি ওই পথে গিয়ে হিন্দুদের এই অপঃবিশ্বাসের যবনিকাপাত ঘটাতে চাই। আমরা সুস্থ সবল ওই পথ অতিক্রম করতে পারলে ওদের বিশ্বাসের সৌধচূড়া এমনিতেই ভেঙ্গে পড়বে। তবে বাঘ হামলা করলে তুমি ও তোমার গরুর আগেভাগেই আমি ওকে খতম করে ফেলব।

'আপনি চিন্তা করবেন না। শুধু আপনি কেন প্রয়োজনে আমিও আপনার দুঃসাহসী অভিযাত্রার সাথী হয়ে হিন্দুবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত হানব। আমি যাব। ওই মন্দির পথেই হ্যাঁ।

'তোমার গাড়ীতে ছই আছে তো।'

'সে চিন্তা করবেন না, আমি এভাবে ব্যবস্থা করব যাতে বৃষ্টির ছিটেফোটাও কারো গায়ে না লাগে।'

হেকিম এবার তাকে বললেন, 'তাহলে আজ মাগরিবের পরপরই সেবারামের বাড়ীতে গাড়ী নিয়ে হাজির হবে।'

'কোন সেবারাম? ওই সেবারাম তো নয় যার নাতনী আমাদের মুসলিম ঘরে ঘরকন্যার কাজ করে থাকে।

'হ্যাঁ হ্যাঁ! সে-ই। এক্ষনে আমাদের যেতে হয় ভাই। ওকে নিয়ে আমার বাড়ীতে যেতে হবে। নয়ত আর কিছুক্ষণ তোমাদের এখানে থেকে যেতাম।'

হাম্মাদ হেকিমকে বললো, 'বীনা মুসলিম বাড়ীতে কাজ করে বুঝি?'

হ্যাঁ! সেবারাম বেকার। ওদের সংসারে উপার্জনক্ষম কেউ নেই বলে ও বাড়ী বাড়ী কাজ করে ঠাকুরদা' ও নিজের রুটি রুজির যোগান দেয়।

হাম্মাদ মনের দুঃখ গোপন করে কথার মোড় ঘুরাল। বলল, 'এখানকার হিন্দু-মুসলিমের ভাষায় কিছুটা পার্থক্য অনুমান করলাম যেন।'

হ্যাঁ! তোমার অনুমান যথার্থ। সত্যি বলতে কি! আমাদের বাপ-দাদা তুর্কিদের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এবং তারা বেশ কিছুদিন এদেশে থেকেও গিয়েছেন। যদ্দরুন তাদের ভাষার একটা প্রতিক্রিয়া রয়েই গেছে আমাদের মধ্যে।'

থামলেন হেকিম সাহেব। হাম্মাদও আর কথা বাড়াল না। ইতোমধ্যে কথায় কথায় ওরা হেকিমের বাড়ীতে এসে গেছে। হেকিম দরোজা নক করেন। বেশ ক'জন জোয়ানের সাথে ওর দেখা। হেকিম সাহেব বলেন, এরা আমার খান্দানের চেরাগ। এরপর দীর্ঘক্ষণ হাম্মাদ ওর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হেকিমকে বলে এক সময় বেরিয়ে পড়ে।

হামলা

জমকালো আঁধারে ঢাকা পৃথিবী।

দিনান্তের ক্লান্তি শেষে সূর্য ডুবেছে সেই কখন।

বৃষ্টি পড়ছে টাপুর টুপুর। বাদ মাগরিব ইসমাইল গরুগাড়ী নিয়ে বেরোল। সে আজ এভাবে সেজেছে যেন গরুগাড়ী নয় রথ হাঁকিয়ে চলেছে রনাঙ্গনে। দেহে সেঁটেছে লৌহ বর্ম। ডান পার্শ্বে ঝুলিয়েছে তলোয়ার। বামপার্শ্বে ঢাল। মাথায় হেলমেট। গন্তব্য সেবারামের বাড়ী।

বৃষ্টি তখনো থামেনি। পরিবেশ থমথমে। রিমঝিম বর্ষার লাগাতার আক্রমনে জনমানবহীন রাস্তা। দ্রুত হাঁকাচ্ছে ইসমাঈল তার গরু। মালিকের গুঁতোয় অতিষ্ঠ বোবা প্রাণীগুলো ডান বামে ঘুরে ছাড়ছে দীর্ঘশ্বাস।

সেবারামের বাড়ীর সামনে এসে গরুগাড়ী থামল। চামড়ার চাদরে ঢাকা কৃত্রিম ছাতা একহাতে গুছিয়ে সেবারামের দরোজায় করাঘাত করল। খুলে গেল দরোজা। ইসমাঈল বললো, 'কি বাপু! মেহমানরা সফরের তৈরি নিয়েছেন কি? তাদেরকে খবর দাও।'

সেবারাম দরোজার উভয় কপাট খুলে বললেন, 'মেহমানরা তৈরি। তুমি ভেতরে এসো।' ইসমাইল ভেতরে এলো। বিশ্বপালের কাছে বসল। মুসলিম হেকিম আবু বকর ওখানে বসা। সে যথাক্রমে আবু বকর ও হাম্মাদের সাথে মোসাফাহা করল। বললো, 'তা আপনারা কতক্ষণে রওয়ানা করছেন?'

হাম্মাদ বিশ্বপালের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরা তো কখন থেকে প্রস্তুত।'

ইসমাইল দাঁড়িয়ে গেলে ও বলল, 'তাহলে আর দেরী কেন।'

হাম্মাদ দাঁড়াল। ইসমাঈল দেখল হাম্মাদ জঙ্গী লেবাসে সজ্জিত। মোটা চটের ভেতর থেকে চাকচিক্যময় ওর বর্ম দেখা যাচ্ছে। কব্জী থেকে কনুই পর্যন্ত লোহার দস্তানা। কোমড়ে তলোয়ার।

রত্না ও বীনা বেরিয়ে গরুগাড়ীতে বিশ্বপালের বিছানা বিছাল। হাম্মাদ পাজাকোল করে বিশ্বপালকে দিল শুইয়ে। চড়িয়ে দিল ওর বুকের ওপর মোটালেপ। ততক্ষণে ইসমাঈল ওদের ঘোড়া তিনটি গরুর গাড়ীর সাথে বেঁধে দিল। রত্নাও একসময় গরুর গাড়ীতে উঠে ভাইয়ের শিয়রের কাছে বসল।

আবু বকর গাড়ীর কাছে দাঁড়ালেন। হাতে তার তিনটি মশাল। ঘোড়ায় বাধা তিনটা লৌহগুর্জ খুলে ইসমাঈলকে দিয়ে ওগুলো সামনে তার কাছে রাখতে বলল

হাম্মাদ। ওতলো যথাস্থানে রেখে ইসমাঈল তার আসনে বসল। গাড়ীর ছই চামড়াবৃত। চার পাশের বেড়াও চামড়া নির্মিত। বৃষ্টির পানি ঢোকার কোন কায়দা নেই। গরুগাড়িটার সামনের দিকটা অপেক্ষাকৃত ঢালু, যাতে চলতে ও চালাতে সহজ হয়। আবু বকর ইসমাইলকে বললেন বসতি থেকে বেরিয়ে একটা বেজল নিও। অর্পিত দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করো।' ইসমাইল বুকে হাত রেখে বললেন, আপনি চিন্তা করবেন না হেকিম সাহেব। আল্লাহ সহায় থাকলে ওরা আমার বিরুদ্ধে কোনই অভিযোগ তুলতে পারবে না আপনার কাছে।'

বীনা এ সময় ফোঁপানো কান্নায় সুরে বললো, 'দাদা! আমার মত দলিত শ্রেণীর এক মেয়েকে আপনি বোন ডেকেছেন। আমার কোন ভাই নেই। আপনিই প্রথম পুরুষ যে কিনা আমাকে বোন ডেকেছে। আমার আশা, এক ভাইয়ের সাথে তার বোনের সাক্ষাৎ এই শেষ নয়।'

হাম্মাদ বীনার মাথায় হাত বুলিয়ে কান্না সজল সুরে বলল, বীনা! বীনা! যেভাবে তোমার কোন ভাই নেই, সেভাবে আমারও কোন বোন নেই। ওয়াদা করলাম, সময়মত তোমার সাথে দেখা করব। এর পর হাম্মাদ পেছন ফিরে বিশ্বপালকে লক্ষ্য করে বললো, বিশ্বপাল! তোমাদের ওপর আক্রমনকারী শত্রুদের ঘোড়া চারটি আমি বিক্রি করে দিয়েছি। প্রকৃতপক্ষে ওই ঘোড়াগুলোর মালিক আমিই। কেননা ওই ঘোড়ার মালিকদের আমিই যমালয়ে প্রেরণ করেছি। এর পরেও তোমার কাছে অনুমতি চাইছি যে, যদি আমি এর মূল্যটা কোন কল্যাণধর্মী কাজে ব্যয় করতে চাই তাহলে তোমার কোন আপত্তি থাকবে কি?'

'হাম্মাদ! তুমি অনুমতি চেয়ে আমাকে লজ্জায় ফেললে। স্রেফ ওদের কেন আমাদের ভাই-বোনের ঘোড়া বিক্রি করে কল্যানধর্মী কাজে ব্যয় করলেও ভগবানের দোহাই দিয়ে বলছি, আমার মন শান্তি পাবে।' বলল স্বতঃস্ফূর্ত চিত্তে বিশ্বপাল।

হাম্মাদ এবার বীনার দিকে ঘুরল। কোমড় থেকে বড় সড় একটা তোড়া বের করে বীনার সামনে পেশ করে বলল, এটা তোমার কাছে থাক বোন। দুর্দিনে তোমার কাজে আসবে।'

বীনা দু'কদম পিছু হটে বলল, না দাদা! আমি ওটা নিতে পারব না।

হাম্মাদ সোহাগ করে বলল, 'বুদ্ধিমতি বোনেরা দাদাদের কথা ফেলে না। আমার পকেটে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ আছে এর সামান্য কিছু দিলাম তোমাকে। তুমি এটা গ্রহণ না করলে বুঝব, তুমি আমাকে ভাই হিসাবে গ্রহণই করোনি।'

বীনা ফওয়ান আগে বেড়ে অশ্রু মুছে ওটা গ্রহণ করল। বলল, 'দাদা! অমন কথা মুখে আনবেন না।

'আর শোন! ভবিষ্যতে তোমার ও তোমার ঠাকুরদার কোন অর্থের প্রয়োজন পড়লে হেকিম সাহেব কিংবা ইসমাঈলের কাছ থেকে কর্জ করো। আমি এসে ঋণ

শোধ করে দেব পরবর্তীতে।' বীনা কিছু বলতে যাবে এসময় পাশে দাঁড়ানো সেবারাম বলে ওঠেন, মহারাজ।" আপনি মানুষ নন, সাক্ষাৎ দেবতা।' বুড়ো আর কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারলেন না। হাম্মাদ হেকিম সাহেবের সাথে আখেরী মোসাফাহা করল। ইসমাঈলের গাড়ীর চাকা স্পন্দিত হতে লাগল। হাত উঁচিয়ে হাম্মাদের দিকে তাকিয়ে শেষ বারের মত সেবারাম বললেন, ধন্য সেই মা যে তোমার মত মহানুভব ও মহাবীর সন্তান গর্ভে ধারণ করেছে।'

অন্ধকারে মুহূর্তের মধ্যে গরুগাড়ী অদৃশ্য হয়ে গেল। ফুঁপিয়ে কেদে ঘরে প্রবেশ করল বীনা। বৃদ্ধ সেবারামও মাথা ঝুকিয়ে ঘরে ঢোকলেন। বীনার কাধে হাত রেখে ঠাকুরদাদা নাতনী এমন এক যুবকের বিরহ ব্যাথায় কাতরাতে লাগল যার সাথে ধর্ম ও জাতের কোনই রিশতা নেই।

২.

বসতি থেকে বেরিয়ে ইসমাঈল তার গরুগাড়ীকে স্বরসতী উপকূলের পথ ধরাল। ওখান থেকে সহসাই বা'দিকের মোড় নিল। সেখান থেকে দক্ষিণমুখো চলল। হাম্মাদকে সে তার কাছটিতে বসাল। ইতোপূর্বে সে মশাল জ্বেলে দিয়েছিল। মুষলধার বৃষ্টির দরুন কোথাও জমেছিল হাটু অবধি পানি কিন্তু পাথুরে জমিন হবার দরুন পথ চলতে তেমন একটা অসুবিধে হচ্ছিল না।

মাইলখানেক চলার পর বনভূমির সম্মুখীন হলো ওরা। ঝোপঝাড়ে এলাকাটি ঠাসা। ইসমাঈলের একহাতে মশাল আরেক হাতে গাড়ীর রশি। সময় অতিবাহিত ও একঘেয়েমি দূর করতে হাম্মাদ তাকে গল্প শুনিয়ে যাচ্ছিল। ওদিকে ছইয়ের ভেতরে বিশ্বপাল ও রত্নাও বলে যাচ্ছিল পেছন অতীতের অনেক না বলা কথা। শীত থেকে বাঁচতে রত্নাও গায়ে পেঁচিয়ে রেখেছিল লেপ ও মোটা ওড়না। বসেছিল ভাইয়ের কাছ ঘেঁষে।

ইসমাঈল গাড়ীর গতি বাড়িয়ে দিল। কেননা স্থানটা যুৎসই নয়, নয় নিরাপদও। এ পথেই রয়েছে সেই ভয়াল পোড়ো মন্দির। সামনে মথুলা বসতি। পাহাড়ের ঢালবেয়ে নামার সময় হাম্মাদ উঁচু টিলার দিকে তাকিয়ে বলল, এ বুঝি সেই মন্দির যা কিংবদন্তী হিসাবে হিন্দু সমাজে বিভীষিকা ছড়িয়ে দিয়েছে। মন্দির মাড়িয়ে ওরা নিবিড় জংগল ধরে এগুতে লাগল। গরু তার সাধ্যমত চলছে। এ সময় শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে হাম্মাদ ইসমাঈলকে বলল, আমি এ সফরকে জীবন-মৃত্যু মনে করেছিলাম। কোথায় সেই মনোহর লালের পুনর্জন্মের বস্ত্ররূপ? ইসমাঈল এ প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে কেবল মুচকি হাসি দিল।

ঘন জংগলের আরো কিছুটা অতিক্রান্ত হবার পর আচমকা গরুগুলো থমকে দাঁড়াল। হাম্মাদ উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করে কারণ জিজ্ঞাসা করল, 'ইসমাঈল! গাড়ী থামালে কেন? ইসমাঈল শুষ্ক কণ্ঠে বলল, আমি নই, ওরাই থেমে গেছে।' পরে সে

হাম্মাদকে ভয়কাতুরে চিত্তে বললো, হাম্মাদ ভাই! মনে হচ্ছে কিছু একটার সম্মুখীন হতে যাচ্ছি আমরা।' হাম্মাদ তরবারী ধারণ করেছিল আগেভাগেই। আরেক হাতে ঢাল। ভেতর থেকে বিশ্বপালের কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে এলো, হাম্মাদ! হাম্মাদ! গাড়ী থেমে গেল কেন?'

হাম্মাদ ও ইসমাঈলের কারো কাছে এ প্রশ্নের কোনো জবাব নেই। এ সময় পর্দা সড়িয়ে মুখ বের করে রত্নাও ভাইয়ের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল।

হাম্মাদ গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'এখন পর্যন্ত এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার সময় আসেনি। গরু এমনিতেই থেমে গেছে।'

ইসমাঈল সিট থেকে নেমে গরুর কান পরীক্ষা করে হাম্মাদকে বলল, হাম্মাদ! আশেপাশে কোনো হিংস্র প্রাণী লুকিয়ে আছে। অচিরেই আমরা সেই প্রাণীর হামলার সম্মুখীন হতে চলেছি। বিপদ আসন্ন বুঝলে গরু এগোয় না।

তলোয়ারের বাট মজবুতভাবে ধারণ করে হাম্মাদ বললো, 'কি করে বুঝলে আমরা হামলার সম্মুখীন?'

'গরুর কান ঘামছে, সর্বাঙ্গ কাঁপছে। এ থেকেই।' বলল নিরস কণ্ঠে ইসমাঈল।

ইসমাইলের কথা শুনে রত্নার প্রাণ খাঁচাছাড়া হবার মত অবস্থা। ওর দিলমনে কাঁপন ধরল। থির থির করে কাঁপছে ওর গোলাপ পাপড়ী সদৃশ ওষ্ঠযুগল। চোখ দুটো অজানা আশংকায় ওঠছে ছলছলিয়ে। নারী সুলভ অনুভূতি নিয়ে এবার ও ভয়কাতুরে কণ্ঠে বলল, হাম্মাদ! এখন কি হবে? কি করবে তোমরা দুজনে? রত্নার কণ্ঠে হতাশা ও বিভীষিকার ছাপ। এতক্ষণ হাম্মাদের প্রতি ঘৃণায় ও কথা বলেনি। হাম্মাদও অবলা নারীর প্রশ্নের জবাব দেয়ার কারণ খুঁজে পায়নি। রত্নাও আর কথা বাড়ায়নি।

আসমানে বজ্রবিদ্যুতের আনাগোনার পাশাপাশি মুষলধার বৃষ্টিতে জমি ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। গোটা বনভূমি নিশ্চুপ নির্বিকার, যেন গভীর ঘুমে অচেতন। আচমকাই সকলকে চমকে দিয়ে গোটা বনভূমি প্রকান্ড হুংকারে কেঁপে উঠল। দুটি বাঘের দ্বৈত হুংকার কাঁপবেই বা না কেন। রহস্যের দোলাচালে বনভূমি। গরুর গাড়ীর প্রাণীগুলো থরে কম্পমান। এ যেন মানুষের ওপর জঙ্গল— রাজের হামলার দামামা।

রত্না বড় চোখ করে হাম্মাদের দিকে তাকায়। গরুগুলোও বড়চোখ করে আওয়াজ আওয়াজের দিকে চোখকান খাড়া করে তাকায়। ইসমাঈল বেচারার মূর্ছা যাবার মত অবস্থা। হাম্মাদের পরিধি বাড়ানো হাসি সকলকে হতবাক করে। মুচকি হেসে বলে ও, ইসমাঈল! ইসমাঈল!! ভয় পেও না, নীচে নেমে আমি গরুর সামনে চলছি। তুমি মশাল উঁচিয়ে রেখো। আমার পেছনে পেছনে গরু চালাতে চেষ্টা কর। মনে রেখ! এ কেবল আমার প্রতিজ্ঞা নয় তোমার আমার ঈমান-আকীদার পরীক্ষাও। নিজকে সামলাও। আমি বেঁচে থাকতে তোমাদের কারো ভয় নেই।'

বিশ্বপাল উঠে বসল। বললো, 'হাম্মাদ। অবতার তোমাদের কথা শুনেছি। সতর্কতার সাথে নীচে নেমো। হায়! আমি যদি যখমী না হতাম। আহা! এ সময় যদি তোমার সাথে আমিও নামতে পারতাম।'

হাম্মাদ নীচে নামতে গেলে ইসমাঈল ওকে বারণ করে বললো, আমি তোমাকে একাকী নামতে দেব না।' হাম্মাদ তাকে সতর্ক করে দিয়ে বললো, 'ইসমাঈল! এখন থেকে আমি যেভাবে নির্দেশ দেব সেভাবে কাজ করলে তোমাদের সকলের ভাল হবে। হিংস্র প্রাণী খুব সম্ভব দু'টি হবে। আমার উদ্দেশ্য, নর ও মাদী। তোমাকে গাড়ীতে রাখার উদ্দেশ্য, আমার অনুপস্থিতিতে বিশ্বপাল ও রত্মাকে তুমি দেখে রাখবে।'

হাম্মাদ গরুগাড়ী থেকে নামল। নেমেই আত্মরক্ষার জন্য বুক বরাবর ঢাল রাখল। ডান হাতে শক্ত করে চেপে ধরল তলোয়ার। গরু দুটির মাথায় স্নেহ পরশ বুলিয়ে সামনে চলতে লাগল। ইসমাঈল উঁচিয়ে ধরল মশাল। পরক্ষণে গরু হাঁকাল। হাম্মাদের পেছনে গরু দুটি চলতে আরম্ভ করল। কদ্দুর যাওয়ার পর হাম্মাদ পূর্ণ শক্তিতে চিৎকার দিয়ে বলে ওঠল, ইসমাঈল! ইসমাঈল। গরু থামিয়ে দাও!

হাম্মাদের চিৎকারে ইসমাইল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। মশাল আরো উঁচিয়ে সে ভীতবিহ্বল হয়ে বললো, কি হলো হাম্মাদ ভাইয়া! তার কথা শেষ হতে না হতেই বিশ্বপাল আর্তনাদ করে বললো, 'কি দেখেছো হাম্মাদ ভাই!'

হাম্মাদ ক'কদম আগে বেড়ে বললো, বাঘ দেখেছি বাঘ। একটা মনে হচ্ছে। তোমরা চিন্তা করোনা। রত্মা ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠল, হায় রাম! একি হলো।' বিশ্বপাল রত্মাকে সান্ত্বনা দিল। হাম্মাদ বলল, ইসমাইল! মশাল আরো উঁচিয়ে ধরো। চারিদিকে নজর বুলাও। বাঘ এক্ষণে আমার সম্মুখে। হতে পারে ওর মাদীটাও আশেপাশে কোথাও আছে ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে তোমাদের ওপর চড়াও হবার অপেক্ষায়।

ইসমাঈল মশাল উঁচিয়ে ধরলে সকলে দেখল প্রকান্ড এক গাছের গোড়ায় বিশাল বপুধারী এক বাঘ দাঁড়িয়ে। তার চোখ দুটো ভাটার মত জ্বলছে। মশাল আলোর চেয়ে বাঘের চোখের আলো অনেক বেশী, অনেক তীব্র। আচমকা ব্যঘ্র হুংকার দিয়ে হাম্মাদ সকলকে দুঃসাহসী করতে গিয়ে বললো, বিশ্বপাল! রত্মা! ইসমাইল! তোমরা হুঁশ হারাবে না। বাঘতো মাত্র একটা। কসম খোদার! ওর মাদীটা সাথে থাকলেও আমি ভয় পেতাম না।'

হাম্মাদ বাঘের সাথে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে ইতোমধ্যে। ও বললো, 'তোমরা দেখছো জন্তুটা আমার বিরুদ্ধে আক্রমন করতে চাইছে। দেখ আমি ওকে কি করে শেষ করি। লৌহমানব আগে বাড়ছে। যেন প্রকাণ্ড পাহাড়ের ঘটছে স্পন্দন। ইসমাঈল হারিয়ে যাচ্ছে ভাবনার অচিনপুরীতে। এতো সেই রূপকথার রাজকুমার।

হাম্মাদ এগিয়ে চলছে বাঘের দিকে। বিলকুল নেপথ্যচ্যুত ধূমকেতুর মত। অতি মানবীয় গতিতে। ইসমাঈল, রত্না ও নিশ্চল কিংকর্তব্যবিমূঢ়। বাঘ তার স্বস্থানে ভয়াল থাবা ও রুদ্রমূর্তিতে বৃত্তাকারেই টহল দিচ্ছে। ঘোড়াগুলো আছে থমকে। গরু দুটো নিথর নিস্তব্ধ।

বাঘটি আচমকাই হুংকার মেরে হাম্মাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। রত্না আর্তনাদ করে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলল। বাঘ ও হাম্মাদ উভয়েই মাটিতে নিপতিত হয়ে ধস্তাধস্তি শুরু করল। উঁচানো মশালের আলোতে ইসমাইল ওকে দেখতে সচেষ্ট হল কিন্তু হাম্মাদকে দেখা যাচ্ছিল না। বাঘের হুংকার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। মনে হচ্ছে শিকারকে সে চেটেপুটে খাচ্ছে। ওদের ধারনা হাম্মাদ বুঝি এজগতের সফর শেষ করেছে। এ সময় ইসমাঈল চিৎকার দিয়ে বলল, হাম্মাদ! হাম্মাদ তুমি কৈ? রত্নার মুখ তখনও দু'হাতে ঢাকা। ইসমাঈলের কথায় সে মুখ থেকে হাত সরাল।

ইসমাঈলের কণ্ঠ আবারো ঝংকৃত হলো, হাম্মাদ! কথা বলছ না কেন? তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। তোমাকে নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। কথা না বললে আমি কিন্তু নীচে নেমে পড়ব। আচমকা হাম্মাদের বজ্রকণ্ঠ শোনা গেল, তুমি গাড়ীর উপরেই থাকো। আমি দুধের বাচ্চা নই যে, বাঘ আমাকে নিয়ে ছেলে খেলা খেলবে।'

ওরা দেখল হাম্মাদ এক পাশে উবু হয়ে ঢালের সাহায্যে আত্মরক্ষা করে যাচ্ছে। হাম্মাদ ওদেরকে লক্ষ্য করে বলল, 'ইসমাঈল! বাঘ পূর্ণশক্তিতে হামলা চালিয়েছে। এবার পালা আমার। হাম্মাদ ঢাল দ্বারা আত্মরক্ষা করে মূলতঃ বাঘের পেটে তলোয়ার ঢুকানোর অপেক্ষা করছে। কিন্তু বাঘও তো কম যায় না। শত হলেও মানব শক্তি বাঘের কাছে অতি দুর্বল। যদিও কৌশলে মানুষ সেরা। বাঘটি চূড়ান্ত আঘাত হানতে প্রচন্ড এক লাফ মারল। হাম্মাদ এতক্ষণ এই সুযোগে ছিল। ঢাল ফেলে দু'হাতে তলোয়ারের বাট মাটিতে ধরে কেচকি মেরে নিজের দেহটাকে একপাশে সড়িয়ে নিল। বাঘটি এসে সোজা তলোয়ারের উপর পতিত হতেই ধারাল তলোয়ারের আগা তার পেটে ঢুকে গেল। বিকট আওয়াজে ঝনভূমি প্রকম্পিত হল। হাম্মাদ দ্রুত তলোয়ারটি বের করে বাঘের কোমড় বরাবর চূড়ান্ত আঘাত করে দু'ভাগ করে ফেলল। মরণ গোঙানীর সাথে বাঘের জীবনাবসান হলো।

হাম্মাদের গোটা শরীরে বাঘের নখরাঘাত। দর দর করে রক্ত ঝরছে। টলতে টলতে ও গরু গাড়ীর কাছে ফিরে এলো। হাম্মাদ গরু গাড়ীতে বাধা ঘোড়ার জিন থেকে শিঙ্গা নিল। দু'টুকরো হয়ে নিথর পড়ে থাকা বাঘের দেহে উঠে বিকট শব্দে ও শিঙ্গায় ফুঁক দিল। এটা ওর জয়ধ্বনি। প্রতিটি বিজয় ক্ষণে এরকমটি করে থাকা ওর অভ্যাস। শিঙ্গাধ্বনি রেখে ও এবার আসমানের দিকে দু'হাত উঠাল। বিনয়াবনত হয়ে বলল, আয় মাওলা! কি শব্দে তোমার শোকর আদায় করব। আমার উদ্দেশ্য তুমি সফল করেছ। তুমিই তো আমাকে এমন শক্তি দান করেছ যার সামনে বাঘ-বকরী সমান মনে হয় আমার কাছে।'

এবার ও গরুর গাড়ীতে এলো। ইসমাঈল ওকে বুকে চেপে ধরল। বললো, দোস্ত! জীবনে না দেখলে হয়ত বিশ্বাস-ই করতে পারতাম না যে, মানুষে বাঘে লড়াই হয় আর তাতে মানুষ-ই জেতে।

বিশ্বপালের চোখে মুখে আনন্দদ্যুতি। ও হাম্মাদের হাতে দু'ঠোঁট নামিয়ে বলল, হাম্মাদ তুমি মানুষ নও অবতার, দেবতা। বাঘ হত্যার মাধ্যমে তুমি আমাদের জীবনের মূল্য আরেক দফা বাড়ালে। তুমি না থাকলে আমরা হয়ত এবারও মারা পড়তাম।'

'অত বলো না বিশ্বপাল! দায়িত্ববোধে তাড়িত হয়েই একাজ করেছি আমি।' ইসমাঈলের মনে এখন প্রচন্ড সাহস। গরু হাঁকানোর যে সাহস ইতোপূর্বে সে হারাতে বসেছিল এখন তা ফিরে পেল। কদ্দুর যাওয়ার পর ইসমাঈল জিজ্ঞাসা করল, হাম্মাদ! খামোশ হয়ে গেলে কেন কিছু বলো।'

'কি বলব?'

'কিছু শোনাও?

'ভয়াল এই রাতের এক ঘেয়েমি কাটতে যা বলা দরকার তা বলার ভাষা আমার নেই যে।

'কোন আরবের সাথে এই আমার প্রথম সাক্ষাৎ। কাজেই কোরআন না হয় খানিক তেলাওয়াত করেই শোনাও।

ইসমাঈলের কথায় হাম্মাদ সূরা নাযিয়াতের শুরুর কিছু আয়াত শুনিয়ে গেল।

ছায়ানীড়ে

গভীর রাত।

সাথীদের নিয়ে হাম্মাদ ভীমসেন তীরবর্তী কাঠের সাঁকো পার হলো। সাঁকো পার হবার পর হাম্মাদ গরুর গাড়ীর ভেতরে তাকাল। বিশ্বপাল গভীর ঘুমে অচেতন। রত্নাও তার পাশে ছই-এ ঠেস লাগিয়ে ঘুমন্ত। ভাইবোনের চোখে মুখে উদ্বিগ্নতার কোন ছাপ নেই।

হাম্মাদ গাড়ীর পর্দা ফেলে দিল। ইসমাঈলের কানে কানে বললো, 'ইসমাইল! ইসমাঈল! ভীমসেনস্থ বিদ্যানাথের বাড়ী চেনো?'

ইসমাঈল বললো, 'কোন বিদ্যানাথ? ভীমসেন পরগনার ঠাকুর প্রধান কি?'

'জানি না সে কি করে? কেন ওখানে অন্য কোন লোক ওই নামে আছে কি?'

'হ্যাঁ! আরেকজন আছে। সে কর্মকার।'

'না সে হতে পারে না। ব্যবসায়ী বিদ্যানাথ বলে কাউকে জানো তুমি!'

ইসমাঈল গভীর নযরে হাম্মাদের দিকে তাকাল, 'তোমার কথা ঠিক। ব্যবসায়ী বিদ্যানাথ যিনি তিনিই ঠাকুর। ধনকুবের সওদাগর। ভারতবর্ষের এমন কোন প্রদেশ নেই যেখানে তার ব্যবসা নেই। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সবকিছু তার কাছে পাওয়া যায়।

হাম্মাদ সিদ্ধান্তমূলক কণ্ঠে বললো, 'তবে তার বাড়ীর উদ্দেশ্যেই চলো।'

হাম্মাদ খামোশ হয়ে গেল। গরু গাড়ী চলছে। ভীমসেন পরগণায় ওরা পৌছুল। বিশাল এক হাবেলীর সামনে এসে ইসমাঈল বললো, 'এই তোমার বিদ্যানাথ জিলা।'

গাড়ী থেকে নেমে হাম্মাদ বললো, 'তোমার গাড়ী এখানেই রেখো। আমি দরজা খোলাচ্ছি।'

আগে বেড়ে ও হাবেলীর দরোজার কড়া নাড়ল। দরোজার ভেতর থেকে কাউকে এগিয়ে আসতে শোনা গেল। ক্ষণিকের মধ্যে নিকটেই কুকুরের মারাত্মক ডাক শোনা গেল।

হাবেলীর ভেতরে আলো জ্বলে ওঠল। শোনা গেল কারো জলদ গম্ভীর আওয়াজ, জ্ঞান! জ্ঞান! ওঠো দেখো! দরোজার কড়া নাড়ল কে?'

দূর থেকে কেউ বললো, এই দেখছি মহাজন!

'দেখো প্রথমে কুকুর বেধেই তবে দরোজা খুলো।'

'জি তাই করছি মহারাজ!'

খানিক বাদে কপাটের ফাঁক থেকে কেউ কম্পিত আওয়াজে বলল, 'কে?'

দরোজায় মুখ লাগিয়ে হাম্মাদ বলল, দরোজা খোলো। আমার কাছে গরুর গাড়ী আছে। আমি তোমাদের মহাজন বিদ্যানাথের সাক্ষাৎপ্রার্থী।

বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছিল কেউ কুকুরগুলো ধরে নিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর জনৈক তাগড়া জোয়ান দরোজা খুলে দিল। হাম্মাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি? আপনি কোত্থেকে এসেছেন? 'আগে আমাকে তোমার মহাজনের কাছে নিয়ে চলো। ঐ দেখো আমার গরুর গাড়ী, আমার সঙ্গী-সাথীরা শীতে কাঁপছে।

ফটক খুলে জোয়ান বললো, 'আপনার গাড়ী ভেতরে নিয়ে আসুন।'

হাম্মাদ বললো,'না এখনই গরু গাড়ী ভেতরে যাবে না। আগে তোমার মহাজনের সাথে কথা হতে হবে। আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো। জোয়ান ওকে নিয়ে ভেতরে গেল। হাবেলীর ভেতরের দিকটা তিনফুট মাটির নীচে মনে হলো। প্রথম তলায় যেতে পাঁচ ধাপ সিঁড়ির নীচে নামতে হয়। সিঁড়ির গোড়ায় মাঝবয়সী এক লোক জ্বলন্ত মশাল হাতে দন্ডায়মান। পাশে তার অভিজাত স্ত্রী এবং সুন্দরী এক যুবতী।

জোয়ানকে সাথে নিয়ে হাম্মাদ তিনজনের কাছেই গেল। ওই লোকটাকে দেখে হাম্মাদ বলে ওঠল, আমি ভুল করে না থাকলে যার সাথে আমাকে দেখা করতে বলা হয়েছে তিনিই সেই। আপনি বিদ্যানাথ সওদাগর।

মশালধারী মশালের অগ্রভাগ হাম্মাদের মুখের কাছে এনে বললেন, এই চট পরিহিত আরব যুবকের অপেক্ষায়-ই আমি।'

হাম্মাদ চমকে উঠল, কি বললেন?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ! খালদূনের বেটা। গত দু'দিন ধরে তোমার অপেক্ষায় আমি। আমি সুনিশ্চিত বলছি, তুমিই হাম্মাদ বিন খালদূন।'

হাম্মাদ হতবাচাকা খেয়ে বললো, 'আমার পরিচয় আপনি কোত্থেকে কার কাছে পেলেন?

'কি যে বলো! ওই হাম্মাদকে আমি চিনব না, যে তোমালুক শহরে নাসীরুদ্দীনের প্রকান্ড বৃক্ষের মোটারশি ছিড়েছে।'

হাম্মাদের পেরেশানী এবার বিস্ময়ে রূপ নিল, 'সত্যিই আপনি দেখছি সাক্ষাৎ গণক। তাহলে কি আমি বুঝে নেব...।'

হাম্মাদের কথা শেষ করতে না দিয়ে বিদ্যানাথ বললেন, 'জাতির কর্ণধার পুত্র আমার! আমার আর নাসীরুদ্দীনের মাঝে দ্রুতগামী অশ্বারোহীর মাধ্যমে যোগাযোগ আছে। আমার দৈনন্দিনের খবরাখবর তিনি রেখে থাকেন। আমার নামে নাসীরুদ্দীনের কোন পত্র তোমার কাছে থেকে থাকবে।'

হাম্মাদ সকলের সামনে কথা বলতে ইতস্তত বোধ করছিল। ওর এই ইতস্ততঃ বোধটা বিদ্যানাথের দৃষ্টি এড়ায় না। তিনি সকলের পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে

বলেন, 'তুমি চিন্তা করো না। এ হচ্ছে জ্ঞান চন্দ্র। আমরা ওকে জ্ঞান নামেই ডাকি। ইনি আমার স্ত্রী সাবিত্রী। আর এ মেয়েটা আমার কলিজার টুকরা বিমলা। ওদের নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না। আমরা সকলেই মুসলমান। এ ঘরের সকলেই মুসলমান। আমাদের প্রকৃত নাম তোমার না জানলেও চলবে এ মুহূর্তে। এদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সমস্ত গোয়েন্দাদের হেড কোয়াটার আমার এই বাড়ী। আমি সকলের আমীর। আমার বাড়ীর সকলকে তোমার কথা আগেভাগেই বলে রেখেছি। এমনকি তুমি যে আমাদের নয়া আমীর হতে চলেছ তাও। তোমার আদেশ পালন করার নির্দেশ আছে আমার ওপর।'

কথার মোড় ঘুরাতে গিয়ে হাম্মাদ বললো, আমি একটি গরুর গাড়ীতে করে এসেছি। এতে আপনার ভাগ্নে-ভাগ্নী রয়েছে।

বিদ্যানাথ চকিতে বললেন, আমার ভাগ্নে— ভাগ্নি?'

হাম্মাদ তাঁর বিস্ময় কাটতে ওদের কাহিনী বলে গেল।

হাম্মাদ খামোশ হয়ে গেলে তিনি বললেন, তোমাকে আরেকটি কথা বলতে চাই। শোন, শৈশবেই আমার মেয়ে বিমলার সাথে বিশ্বপালের বাগদান হয়েছিল। এক্ষনে ওই বাগদান ভাংতে হবে।কেননা কোন হিন্দু ছেলের সাথে মুসলিম মেয়ের বাগদান হতে পারে না। হলেও তা ঠিক নয়। শোন! আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। তুমি বিশ্বপাল ও রত্নার জীবন বাঁচিয়েছ। এখানে কাজ করতে গেলে কেউ তোমার পরিচয় ও অবস্থানস্থল জানতে চাইলে বলো, তুমি আমার কামলা। আমার ব্যবসায়ী কাজ শহরে বন্দরে করে থাকো।'

হাম্মাদ এবার ওর মূল মিশনের দিকে ইংগিত করে বললো, 'আইলাক খানের সম্পর্কে কি–।' মশাল হাতে সিঁড়ির থেকে নামতে নামতে বিদ্যানাথ বললেন, 'এ সম্পর্কে তোমার সাথে নিরিবিলিতে কথা বলব। এসো প্রথমে বিশ্বপাল ও রত্নাকে ভেতরে নিয়ে আসা যাক। ওরা দুজন উদ্বিগ্ন।'

হাম্মাদ বললো, 'ওদের চিন্তা আপনাকে না করলেও চলবে। ওরা গাঢ় নিদ্রায় বিভোর।' জ্ঞান, সাবিত্রী ও বিমলাও ওদের পিছু পিছু চলছিল।

বিদ্যানাথ খোদ নিজেই গরুর গাড়ীতে প্রবেশ করলেন। এবং সর্বাগ্রে রত্নাকে ওঠালেন। ঘুমের ঘোরে বড় চোখ করে রত্না তাকাল। ওর চোখে মুখে বিস্ময়। বিদ্যানাথকে চোখের সামনে দেখে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল পরক্ষণে তার বুকে মিলে গেল। এক্ষনে মুখের কথা চোখের পানির দ্বারা প্রকাশ করলও। অতঃপর বিদ্যানাথ বিশ্বপালকে জাগালেন। মামাকে দেখে বিশ্বপাল হাত জোড় করে প্রণাম করল এবং উঠে বসতে কোশেশ করল। কিন্তু যখমের দরুন বসতে পারল না। হাম্মাদকে ইসমাঈলকে ডেকে বলল—

'ইসমাঈল! ইসমাঈল!! গাড়ী হাবেলীর ভেতরে নিয়ে চলো।'

রশি মুঠে পুরে ইসমাঈল তার স্বভাবজাত কথা দিয়ে গরুগুলো ভেতর হাবেলীতে নিয়ে গেল। ইতোমধ্যে রত্না, বিমলা ওর মায়ের সাথে আলাপে আলাপে অকৃত্রিম হয়ে ওঠল।

ভেতর হাবেলীতে প্রবেশ করতে গিয়ে ইসমাঈল তার গরুগুলো থামাল। কেননা হাবেলীর ভেতরে যেতে সিড়ি বেয়ে নামতে হয়। বিমলা ও সাবিত্রী রত্নাকে নিয়ে অন্দরে চলে গেল। জ্ঞান হাবেলীর ভেতরে গিয়ে ক'জন গোমস্তাকে ডেকে জাগাল।

দু'গোমস্তা ভেতর হাবেলীর অন্দরে একটি পালংক বিছাল। বিশ্বপালকে ওরা ওই পালংকে শুইয়ে দিল। পরে জ্ঞান আরেকটি পালংক বিছাল। রত্না বিমলার দিকে তাকিয়ে বলল, এখানে আমার বিছানা দিও না। ভাইয়ার কাছে মামা কিংবা অন্য কাউকে শুইয়ে দাও। রাতের বেলা ওরা ওর প্রতি লক্ষ্য রাখবে। আমি সফরের দরুন একেবারে নেতিয়ে পরেছি। আমার শরীরের যা অবস্থা তাতে বোধহয় বেশিক্ষণ জাগতে পারব না।'

বিমলা মুচকি হেসে বলল, 'তুমি আমার ও মায়ের সাথে শোবে। এ কামরায় বাবা ও ভাইয়া শোবে।'

রত্না চকিতে প্রশ্ন করল, 'তোমার ভাই কে?'

'হাম্মাদ বিন খালদূন। যিনি তোমাদের গরুগাড়ীতে করে নিয়ে এসেছেন। রত্না উদ্বিগ্নতা প্রকাশপূর্বক বলল, 'তুমি হাম্মাদকে চেন কি করে!'

বিশ্বপাল ওদের কথা শুনছিল। এ কথা শুনছিল কামরার কোনে দাঁড়ান হাম্মাদ, বিদ্যানাথ ও রত্না। বিমলা রত্নার শতদল সুকোমল হস্ত দুখানি হাতের মুঠোয় পুরে মৃদু চাপ দিয়ে বলল, 'হাম্মাদ ভাই বাবার ব্যবসায়ী পণ্য নিয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ান। বলতে পার তিনি আমাদের ব্যবসার অংশীদার।'

রত্না বিস্ময়ে বলল, 'তাহলে তিনি একথা আমাদের কাছে প্রকাশ করেননি কেন! বিমলা বললো, 'হয়ত তুমি জানতে চাওনি আর তিনি জানাতেও চেষ্টা করেননি।'

রত্না এবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দানপূর্বক বললো, তিনি এ কামরায় থাকতে পারেন না। বিমলা বলল, কেন?'

গোস্বা সংযত করে রত্না আরো কড়া সুরে বললো, 'তিনি এ হাবেলীতেই থাকতে পারবেন না। তিনি ম্লেচ্ছ ও দলিত শ্রেণীর লোক। একরাতে তিনি শুদ্রদের বসতিতে থেকে খাদ্য গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলেন। আমাদের জীবনরক্ষক হওয়া সত্ত্বেও আমি তাকে ঘৃণা করি। তার যদি এখানে থাকতেই হয় তাহলে চাকর-বাকরদের সাথেই থাকবেন। খাদ্য গ্রহণ করবেন ওদের পাত্রেই।

সাবিত্রী ওর কথা শুনে হতবাক। বিশ্বপাল ক্ষোভে-দুঃখে ঠোঁট কামড়ায়। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বের করল না সে। বিদ্যানাথ অগ্রসর হয়ে রত্নাকে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু হাম্মাদ তাকে জোরপূর্বক বাইরে নিয়ে গেল। বলল, 'আমার কথা রাখুন।'

জ্ঞানও ওদের সঙ্গ দিল। তিনজন ছাদে ওঠার সিঁড়িপথে চলল। ওখানে হাম্মাদ কানে কানে বলল, এ ব্যাপারে আপনি মুখ না খুললেই ভাল। নয়ত সন্দেহের বীজ দানা বেধে ওঠবে এবং আমি খোলামনে কাজত করতে পারবনা। এ বসতিতে আমাকে শুদ্র হিসেবেই থাকতে দিন। জ্ঞানের পাশেই আমার বিছানা করে দিন।'

বিদ্যানাথ ওর কথায় বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, 'কিন্তু তা হয় কি করে। সুলতান মুহাম্মদ ঘুরীর ও গভর্নর নাসীরুদ্দীনের দূত এবং নিশাপুরের লৌহমানব চতুর্থশ্রেণীর কর্মচারীর ঘরে থাকবে? শোন লৌহমানব! শুদ্রের সাথে তোমার থাকা চলবে না। মোটেই না।'

হাম্মাদ তার কথার মাঝপথে বলে ওঠল, 'আপনি রত্নার কথাই মেনে নিন। ও জেদী ও ধার্মিকা কট্টর তরুণী। ও ক্ষেপে গেলে ঘটনা তাল গোল পাকিয়ে যাবে। এমনকি ও আপনার বিরোধীও হয়ে যেতে পারে। সেমতাবস্থায় কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাঁপ বেরিয়ে পড়তে পারে। আমি জ্ঞানের কামরায়ই থাকব।'

বিদ্যানাথ আহত কণ্ঠে বললেন, 'এটা কি তোমার নির্দেশ?'

বিদ্যানাথের হাত ধরে হাম্মাদ বললেন, 'না, এ আমার মিনতি।'

তিনি ভেতরে যেতে যেতে বললেন, 'তুমি এখানে থাকো। ভেতরে একটা নির্দেশনা দিয়ে আসছি আমি।'

ভেতরে গিয়ে বিমলাকে ডাক দিয়ে বললেন, 'বিমলা! বিমলা!! বিশ্বপালের পাশে আমার বিছানা করে দাও। আর তোমরা মা-বেটি রত্নাকে তোমাদের কাছে নিয়ে যাও। আর শোন! রত্নার কোন আবদার উপেক্ষা করো না যেন। হাম্মাদের ব্যাপারটা ওর সামনে তোমরা চেপে যেও। ও জ্ঞানের সাথেই থাকছে।'

সাবিত্রী ও বিমলা কিছু বলতে চাচ্ছিল কিন্তু ওদের কোন কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে তিনি দ্রুত ওখান থেকে চলে এলেন।

হাবেলীর গোমস্তারা ঘোড়া ও গরুগুলো আস্তাবলে এনে রাখল। গরুর গাড়ী এনে দাঁড় করাল আস্তাবলের ঠিক সামনে। বিদ্যানাথ হাম্মাদের হস্ত ধারণ করে বললেন, এসো আমার সাথে।'

তিনজনই আস্তাবল লাগোয়া কামলাদের কামরায় প্রবেশ করল। হাম্মাদ ও বিদ্যানাথ একই বিছানায় বসল। জ্ঞান অতি তাড়াতাড়ি রেশমী চাদর নিয়ে এলো। ওটি পাশের একটি খাটে বিছিয়ে হাম্মাদকে ডেকে বলল, 'আগন্তুক মেহমান এখানে বসবেন। হাম্মাদ ও বিদ্যানাথ ওই খাটে বসল। জ্ঞান বসল ওপাশের একটি জীর্ন খাটে।

হাম্মাদ তার মূল মিশন নিয়ে এবার আলোচনা শুরু করল। বলল, আইলাক খান সম্পর্কে কোন খবরাখবর আছে কি?

বিদ্যানাথ মাথা নেড়ে বললেন, 'আমার লোকেরা তার সন্ধানে নেমে সুখবর নিয়ে এসেছে। আইলাক খান সাধুর বেশে তার জনৈক কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করতে মথুরা গেছে। তার ওই কর্মকর্তা হিন্দুর ছদ্মবেশে মথুরার রাজদরবারে চাকুরীরত। সে আস্তাবলের দায়িত্বে। আইলাকের সাথে জনৈকা নও মুসলিম যুবতীও আছে। সে নগরকোটের বড় মন্দিরের নর্তকী ও দেবদাসী ছিল। বস্তুত সে নগর কোট থেকে মথুরার তীর্থ যাত্রী দলে শামিল ছিল। সে দেশের অনেক গোপন খবরাখবর জানে। কেননা নগর কোট ও তৎপার্শ্ববর্তী রাজা-মহারাজা পুরোহিত প্রধানের পরামর্শ নিয়ে চলে। ওই নর্তকীকে পুরোহিত খুবই ভালো চোখে দেখতেন। নাম তার উমা। এর কারণ দুটি প্রথমতঃ সৌন্দর্যে সে অনন্যা। দ্বিতীয়তঃ মন্দিরের সে সর্বাপেক্ষা অধীক নাচে পারঙ্গম।

আইলাক খানও মথুরার মুসলিম গোয়েন্দা থেকে ওখানকার রাজাদের প্রতিরক্ষা খবর জানতে চাচ্ছিল। কেননা এ সময় একটা খবর রটেছিল যে, গজনীর প্রশাসক মুহাম্মদ ঘুরী খুব শীঘ্র ভারতবর্ষে আক্রমন শানাবেন। এজন্যে এখানকার রাজা মহারাজারা আজমীরের রাজা পৃথ্বিরাজের পতাকাতলে হাসনাপুরে জমায়েত হচ্ছেন। এরা তাকে এ মুহূর্তে বড় গুরু সাব্যস্ত করছে। আইলাক খান অতি দ্রুত জানতে চাইছে, কোন্ রাজা কত সৈন্য ও প্রতিরক্ষাশক্তি নিয়ে পৃথ্বিরাজের পতাকাতলে সমবেত হচ্ছেন।

একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই তার মথুরা আগমন। সে রাজ প্রাসাদের আস্তাবলে চাকুরীরত গোয়েন্দা সইসের কাছে অবস্থান নেয়। সাথে ছিল সুন্দরী উমাও।

এরা তিনজন গভীর রাতে আস্তাবলে যখন গোপন আলোচনায় লিপ্ত তখন গ্রেফতার হয়ে যায়। জনৈক হিন্দু সইস ওদের পুরো কথা শুনতে পেয়ে রাজ প্রহরীদের খবর দেয়ায় ওরা ধরা খেয়ে যায়।

মথুরার জনৈক মুসলিম কর্মকর্তা আইলাক খান ও উমাকে পলায়নের সুযোগ করে দেন এবং তিনি নিজেই রাজসৈনিকদের পথ আগলে দাঁড়ান। তুমুল লড়াই করে তিনি শহীদ হয়ে যান। আইলাক খান উমাকে নিয়ে নগরকোটে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। মহারাজা ওদের দুজনকে পাকড়াও করতে বাহিনী নামান। তারা ওদের ঘোড়ার পায়ের ছাপ অবলম্বনে পশ্চাদ্ধাবন করে। আইলাক খান ও উমা নগরকোট মন্দিরে প্রবেশ করতেই রাজসৈনিকরাও সেখানে প্রবেশ করে। উভয়কেই শেষ পর্যন্ত গোয়েন্দাবৃত্তি ও গাদ্দারীর অপবাদে পাকড়াও করা হয়। সেপাহীরা আইলাককে ধরে মথুরা নিয়ে যায়। অবশ্য পুরোহিত প্রধান উমাকে তার কাছে রেখে দেন। পুরোহিতের কথা হচ্ছে, দেশে এ মুহূর্তে লোভ ও বিবাদের সয়লাব বয়ে যাচ্ছে। কাজেই মহাদেব এক্ষনে মানুষের রক্ত চাইছেন। শোনা যাচ্ছে, উমার বলিদান কার্যকর হবে। তাকে বলি দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ মেননের পা ধোয়া হবে। পুরোহিত সর্বত্রই ঘোষণা করেছেন, উমার দেহের রক্তে মহাদেবের পা ধোয়াতে পারলে ভারতবর্ষ ম্লেচ্ছ মুক্ত হবে।'

বিদ্যানাথ খানিক থামলেন। দম নিয়ে আবার বলতে শুরু করেন।

'উমাকে কেল্লাকৃতির মন্দির থেকে উদ্ধার করা এক্ষণে সম্ভব নয়। কেননা মন্দিরটির অবস্থান পাহাড়ের শীর্ষচূড়ে। এর তিনদিক জুড়েই দেয়াল। নীচে কলকল নাদে প্রবাহিত নদী। মন্দিরে প্রবেশের জন্য কেবল পূর্ব প্রান্তটিই খোলা। সেখানেও এমন নিচ্ছিদ্র প্রহরা যে, একটা পাখিও প্রবেশ করতে পারে না। এতদসত্ত্বেও আইলাক খান মথুরার জনৈক লোককে উমাকে উদ্ধার কল্পে প্রেরণ করেছে। এ লোক আমাদের দলভুক্ত একজন সক্রিয় কর্মী। নাম তার পরমানন্দ। তিনি পন্ডিতের ছদ্মবেশে ওখানে প্রবেশের প্রত্যাশী। যমুনা তীরবর্তী 'নারায়ণ আশ্রমে' তিনি থাকেন। তার সাথে আছে আরো দুঃচারজন। ওরা আইলাক খানকে রেহাই করার চেষ্টা করে যাবে।'

হাম্মাদ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'এর অর্থ এই যে, আমার পরবর্তী টার্গেট মথুরা এবং পরে নগরকোট।' হাম্মাদ পাঁ উঁচিয়ে অলসতা প্রকাশ করে বললো, এক্ষণে আমি একটু বিশ্রাম নিতে চাই। সকালে শুনবেন আমার চূড়ান্ত প্রোগ্রাম।'

বিদ্যানাথ উদ্বিগ্নতার সাথে বললেন, 'তুমি খানা খাবে না?'

'না আমি খানা খেয়েই এসেছি।'

'তোমার গাড়োয়ান কৈ? ইসমাঈল না কি যেন তার নাম!'

হাম্মাদ গায়ে লেপজড়ে বললো, 'আপনি ও আমি যখন সিড়িপথে চলছিলাম তখন আপনারই গোমস্তারা ওকে নিয়ে গেছে। আমার যদ্দুর ধারনা, সে এতক্ষণে ঘুমিয়ে নাক ডাকছে।'

জ্ঞান বললো, 'আপনার ধারণা যথার্থ। যখন আপনার খানার এন্তেযাম করছিলাম তখন আস্তাবল সংলগ্ন কামরায় লেপের তলে ঢুকে দিব্যি সে নাক ডাকতে শুরু করে। আমি তাকে জাগাতে চেষ্টা করিনি। আমাদের লোকেরা তাকে খানার প্রস্তাব দিলে তিনি খেতে অস্বীকৃতি জানান।

বিদ্যানাথ দেখেন হাম্মাদের চোখ ঢুলুঢুলু। তিনি কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে যান। হাম্মাদ আশ্রয় নেয় লেপের কোলে। মুহূর্তেই ওর দু'চোখে আসে রাজ্যের ঘুম।

দুই.

গভীর ঘুমে অচেতন হাম্মাদ।

জ্ঞান ওর মাথায় হাত রেখে ঘুম ভাংতে চেষ্টা করলে হাম্মাদ পার্শ্ব পরিবর্তন করল। ঘুমের ঘোরেই বলে ওঠল, 'হাসান! হারেস! ছাড় আমাকে! আম্মিজান! হাসান ও হারেসকে নিষেধ কর। দিনান্তের ক্লান্তিশেষে একটু ঘুমিয়েছি, কিন্তু ওরা ঘুমুতে দিচ্ছে না।'

জ্ঞান সোজা হয়ে দাঁড়াল। বড্ড নরমসুরে বলল, 'জাতির ত্রাণকর্তা হে! জাতির এ মহাক্রান্তিকালে তোমার এমন দীর্ঘঘুম মানায় না। যে মাকে তুমি ডাকছ, তিনি সুখে থাকুন। যে ভাইদের ডাকছ তারা শান্তিতে থাক। পরে আবার হাম্মাদের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, মনিব উঠুন!

এবার হাম্মাদ চোখ খুলল। তাকাল জ্ঞানের দিকে। জ্ঞান বলল, 'মনিব! উঠুন। সকাল হয়েছে। ফজরের ওয়াক্ত চলে যাবার উপক্রম।'

'তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ। না ডাকলে নামায কাজা হয়ে যেত যে।'

'আমি আপনার জন্য গরম পানির ব্যাবস্থা করেছি।'

জ্ঞানের সাথে হাম্মাদ বেরিয়ে গেল। গোসলখানায় ঢুকে প্রথমে গোসল করল। রুমে এসে বলল, 'আমার উযুর পানি দাও।'

'আসুন! উযুর পানিও আমি বদনা ভরে রেখেছি।'

জ্ঞান হাম্মাদকে উযু করিয়ে দিতে ভক্তিভরে পায়ের কাছে বসতেই হাম্মাদ তার হাতধরে বলল, 'জ্ঞান! খোদার আসমানের নীচে, যমীনের উপরের সব মানুষই সমান। আমার সবকাজ যখন আমি করতে পারি তখন তোমাকে উযু করিয়ে দিতে হবে কেন?' হাম্মাদ নিজেই উযু করতে লাগল। ততক্ষনে বিদ্যানাথ এসে হাজির। হাম্মাদ উযু সেড়ে উঠে দাঁড়াল। দেখল আসমানের অবস্থা। বৃষ্টি থেমে গেছে। ঘোলা মেঘের রেশ নেই। নীল আকাশ উঁকি মারছে। তারকারাজি হাসছে মুচকি। কামরায় এলো হাম্মাদ। জায়নামায পেতে দিল জ্ঞান। হাম্মাদের ইমামতিতে নামাযে দাঁড়াল সকলেই।

বাদ নামায বিদ্যানাথ ও জ্ঞান বেরিয়ে গেল। হাম্মাদ বসল গিয়ে ওর বিছানায়। বাইরে কনকনে ঠান্ডা। এক্ষণে মনে পড়ছে ওর নিশাপুরের কথা। মনে পড়ছে ঘরবাড়ী ও বাবা মায়ের কথা।

চিন্তার জগতে ঘুরপাক খেতে খেতে এক সময় ও উঠে দাঁড়াল। ফুঁ দিয়ে নেভাল কুপি। এলো বাইরে। ঠান্ডার ঝাপটা খেলে গেল তনুমনে। সূর্য উঁকি মারছে তার সোনালী আভা নিয়ে। সন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে নিল চারদিকেই। লক্ষ্য করল হাবেলীর অবস্থান। বিদ্যানাথের হাবেলী সে এক কেল্লা। বামে আস্তাবল। ডানে চাকরদের রুম। হাবেলীর সামনে পেছনে নাম না জানা দেশী-বিদেশী ফলের গাছ।

হাটতে হাটতে এক সময় ও আস্তাবলের নিকটে এসে দাঁড়াল। ইসমাঈল ওখানে পূর্ব হতেই দাঁড়ানো ছিল। উভয়ে মোসাফাহা শেষে কুশল বিনিময় করল। ঘোড়ার পিঠে থাপপড় মেরে হাম্মাদ আপনার উপস্থিতি জানাল। সূর্যের তাপ খানিক বাড়লে হাম্মাদ হাবেলীর ভেতরে এল। জ্ঞান উদাসীন নযরে ওর দিকে তাকাল। হাম্মাদের দিকে তাকিয়ে ভাঙ্গা গলায় বললো, 'আসুন! নাস্তা খাবেন।'

হাম্মাদ তার সাথে কামরায় এলো। কামরার মেঝেতে চাটাই বিছানো ছিল। প্লেটে তিন চারখানা চা-পাতি রুটি। একটি পিরিচে সবজি।

হাম্মাদ গভীর নযরে জ্ঞানের দিকে তাকিয়ে বললো, 'তুমি নাস্তা করেছ কি।

জ্ঞান খানিক রুষ্ট হয়ে বললো, 'মনিবের যে বোনঝিকে নিয়ে গতকাল আপনি এখানে এসেছেন বড্ড কমিনা সে। তার আপাদমস্তকে কেবল ঘৃণা আর ঘৃণা। এ রকম মেয়ে মানুষ আমি জীবনেও দেখিনি বাবা। দেখতে অনিন্দ সুন্দরী হলেও মেয়েটা বজ্জাতের শিরোমনি!

হাম্মাদ মুচকি হেসে বললো, 'সে তোমাকে আবার কি বলেছে?'

'সে তো এসেই নারী মহল দখল করে নিয়েছে। আজ সকালে নাস্তা আনতে গিয়ে দেখি রান্নাঘরের পুরোটাই তার দখলে। বিমলা বোনও ওর সাথে ছিল। আমি নাস্তা চাইলে বিমলা দিতে গেল। কিন্তু রত্না মাঝপথে বাদ সেধে বললো, 'বিমলা! তোমাকে দিতে হবে না। চাকর-বাকরদের নাস্তার ব্যাপারটা আমিই দেখব।' আমি আপনার ও ইসমাঈলের নাস্তা চাইলে সে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে বলল, 'তুমি বাপু তোমারটা নিতে পার। ওদেরটা ওরা এসেই নিয়ে যাবে। এমনকি সে আপনাদের পাত্রও নিয়ে আসতে বলেছে। কারণ আপনারা নাকি ম্লেচ্ছ। কাজেই এ বাড়ির পাত্র ব্যবহারের অযোগ্য আপনারা। মনিব বিশ্বপালের জন্য হেকিম ডাকতে গেছেন। তার কাছে অবশ্যই এই ধৃষ্টতার প্রতিকার চাইব। এ ধরনের কট্টর হিন্দুমেজাযী উগ্র মেয়ে এ হাবেলীতে বসবাস করতে পারে না।' জ্ঞানের কণ্ঠে অভিযোগের সুর।

হাম্মাদ তার পিঠে হাত রেখে বললো, 'তুমি গোস্বা করো না এবং বিদ্যানাথের কাছে ওর বিরুদ্ধে নালিশও করো না। তোমার মনিবের কাছে রত্নার ব্যাপারটা আমি পুরোপরি বলে রেখেছি। ও জেদী তরুনী। এই মুহূর্তে ওকে খেপালে পরিণতি আমাদের কারুর জন্যই ভাল হবে না। আমাদের সকলের ঐক্যমত্যতা জানলে সেক্ষেত্রে থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়বে। আমাদের ঐকমত্যের কারণ জানতে চাইলে সেক্ষেত্রে গোটা মিশন ফেল মারবে। তুমি চিন্তা করো না। আমি নিজে গিয়ে ইসমাঈল ও আমার খানা না হয় নিয়ে এলাম। স্রেফ এতটুকু বলো, খানা আনতে হবে কোত্থেকে!'

লজ্জানম্র কণ্ঠে বললো, 'হাবেলীর পিছনে আবনুস কাঠের দরোজা আছে। চাকর-বাকররা ঐ পথেই নাস্তা এনে থাকে।

কামরা থেকে বেরিয়ে বড় গাছের বৃহৎ দুটি পাতা ছিড়ে চটের জামার মুছে জ্ঞানের বলা পথের দিকে অগ্রসর হোল।

আবনুস গাছের দরোজায় এসে হাম্মাদ করাঘাত করল। খানিকবাদে দরোজা গেল খুলে। সামনে ভেসে ওঠল সৌন্দর্যের পিরামিড রত্না। কতকটা শ্লেষ বিমিশ্রিত কণ্ঠে সে বলল, 'নাস্তা নিতে এসেছেন বুঝি।'

হাম্মাদ তার দিকে না তাকিয়েই বললো, 'হ্যাঁ!'

রত্না রেশমী কোমল হাত দুখানি বাড়িয়ে বলল, পাত্র কৈ? আপনি আমাদের মহাপোকারী। আর এ বাড়ী হিন্দুদের। এখানে আপনার অবস্থান এক ম্লেচ্ছের মতই হবে।' হাম্মাদ বললো, 'এই পাতায় আমার ও গাড়োয়ানের খাবার দিন।'

'এক মহাপোকারী হিসাবে আমি আপনার জন্য যরপরনাই সেবা করতে রাজী ছিলাম। কিন্তু ম্লেচ্ছ বস্তিতে আপনি আমাদের জ্ঞান-মান সব ধুলোয় মিশিয়ে নিজকে একজন ম্লেচ্ছই সাব্যস্ত করেছেন এবং আমাদেরকেও ম্লেচ্ছ বানাতে চেষ্টা করেছেন। কাজেই এর সাজা আপনাকে পেতেই হবে। আপনি এখানে যতদিন আছেন ততদিন ম্লেচ্ছই থাকছেন। যাতে ঐভুল বুঝতে পারেন এবং প্রায়শ্চিত্তও হয়ে যায়। শুনুন! আমি সবকিছু বরদাশ্ত করতে পারি কিন্তু অধর্মকে সহ্য করতে পারি না। মানবদেহের চেয়ে ধর্ম অনেক দামী। প্রথমে মানবদেহ পঁচে তারপর পঁচে ধর্ম। আপনি সত্যিই অশ্রুতপূর্ব শক্তির অধিকারী যুবরাজ। প্রতিটি রণাঙ্গনে আপনি জয়লাভ করার শক্তি রাখেন জানি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমাদের ধর্মের অপমান করে আপনি সফল হতে পারবেন না।'

হাম্মাদ গোস্বায় লাল হয়ে বললো, 'তোমার এ ধারণা ভুল রত্না। আমি এখানে ম্লেচ্ছ হয়ে থাকছি না। স্বাধীনচেতা মানুষ আমি। আজই এখান থেকে রওয়ানা করছি। শোন! আগুন দ্বারা যেভাবে আগুন নেভানো যায় না সেভাবে তোমার কথা আমার গোস্বা নিবারণ করতে পারবে না। আসমানের উচা স্বরূপ আমার পথ। আমার চিন্তা-চেতনার ফারাক তোমার থেকে ঠিক ততটাই। আর যা কিছুই হইনা কেন আমি একজন মানুষ তো,মানবিক চাহিদামুক্ত নই। তাই তোমার কথা আমাকে রাগালেও এ মুহূর্তে তর্কে যেতে চাইনে।'

থামল হাম্মাদ! পরক্ষণে দম নিয়ে জলদ গম্ভীরস্বরে বলা শুরু করল, 'তুমি দুষ্টের শিরোমনি। তোমরা ধর্ম কর্ম খুব একটা মানো না। এজন্যই তোমার এই দশা। আমি তোমার ভাইকে সাহায্য করেছি। তোমার ইজ্জত বাঁচিয়েছি। উপরন্তু ঝড়-বাদলের রাতে তোমাদের জানবাযী রেখে এখানে পৌঁছিয়েছি। তোমার উচিত ছিল আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া। উল্টো সেখানে তুমি আমাকে ম্লেচ্ছ সাব্যস্ত করছ। তুমি নিজকে একজন হীনমন্য হিন্দু মেয়ে প্রমাণ করছ। হিন্দু ধর্ম তোমার মত হলে বলব হিন্দু ধর্মটাই ম্লেচ্ছ। আর তুমি সেই ধর্মেরই একজন জঘন্য নারী। হায়! তুমি যদি ব্রাহ্মণের ঘরে পয়দা না হয়ে কোন ম্লেচ্ছের ঘরে পয়দা হতে। তাহলে নিজকে একজন মানুষ ভেবে অন্যকেও সাধারণ মানুষ মনে করতে পারতে।'

রত্না বড্ড শক্ত ভাষায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলল, আমি তোমাকে ঘৃণা করি। মনে রেখ, এজনমেও আমার থেকে তোমার ঘৃণাভাব দূর হবে না।

হাম্মাদ বলল, 'তুমি আমাকে যতটা ঘৃণা কর তারচেয়ে তোমাকে ১০গুন বেশী ঘৃণা করি। তুমি সত্যিই নীচ, হীন ও দুষ্ট। হায়! তোমার সাথে যদি আমার সাক্ষাৎ না হত। রত্না ঠোঁটে ঠোঁট কাটল। এতদসত্ত্বেও সে সংযত থাকল। তড়া করে পাতা দুটি নিয়ে কিছু শাকভাজি ও চাপাতি হাম্মাদের হাতে তুলে দিল।

হাম্মাদ নাস্তা হাতে নিয়ে রাগতস্বরে বলল, 'আগামীতে আমার বিরুদ্ধে টু শব্দটি করেছ কি তোমার জিভ্ কেটে নেব।'

রত্না শ্লেষ বিমিশ্রিত কণ্ঠে বলল, 'যা যা! আমার জিভ্ কাটনেওয়ালা। তোমার মত কতজন এল আর গেল। মুর্খ আর অধার্মিকের পক্ষে আমার জিভ্কাটা ছেলের হাতের মোয়া নয়। যেদিন তুমি আমার জিভ কাটবে সেদিন হবে তোমার জীবনের শেষ দিন। চলে যাও আমার সম্মুখ থেকে। তোমার মুখও দেখতে চাইনে আমি।'

হাম্মাদ কামরায় ফিরে এল। জ্ঞান ও ইসমাঈল চাটাই পেতে বসা। জ্ঞানের আনা খানা তখনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। হাম্মাদ এসে ওদের মাঝখানে বসল। পরক্ষণে খাওয়া শুরু করল।

ওদের কথা বলার মাঝপথেই বিদ্যানাথ এসে গেলেন। তিনি হাম্মাদকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমরা নাস্তা শেষ করেছ?'

জ্ঞান দাঁড়িয়ে বলল, হ্যাঁ মনিব! আমরা নাস্তা শেষ করেছি।'

হাম্মাদ বিদ্যানাথকে লক্ষ্য করে বলল, 'আপনি ছিলেন কোথায়?'

'আমি বিশ্বপালের জন্য হেকিম আনতে গিয়েছিলাম। তিনি ওর ক্ষতে পট্টিবেধে চলে গেছেন।' পরে জ্ঞানকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তুমি ঘোড়া ও গরুগুলোকে ঘাস খাইয়ে তাজাদম করে নাও। ও হ্যাঁ! সাথে ইসমাঈলকেও নাও।'

জ্ঞান ইসমাঈলকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

বিদ্যানাথ যিনি একজন কট্টর মুসলমান, নাম আবুল ফাতাহ' হাম্মাদকে লক্ষ্য করে বললেন, 'এক্ষনে বলো তোমার পরিকল্পনা কি?'

হাম্মাদ অনুচ্চস্বরে বললো, 'আজ সন্ধ্যার পর মথুরার উদ্দেশে রওয়ানা করব। রাতে সফর করে অধিকাংশ পথ অতিক্রম করতে চাই। আমি আইলাক খানকে অসহায় অবস্থায় মরতে দিতে চাইনে। তাকে বাঁচানোর যার পরনাই চেষ্টা করব।

বিদ্যানাথ বললেন, 'মথুরা উপনীত হয়েই নারায়ণ আশ্রমের পন্ডিত পরমানন্দের সাথে দেখা করো। তোমার আগমনের পূর্বেই সে যে পরিকল্পনা নিয়েছে তা জানতেই তোমার দেখা করা। ইসলামের খেদমত করতে এসেছ। কাজেই অনেক বাধা-বিপত্তি বুকে আগলে চলতে হবে। মানুষেরা তোমাকে তাদের অধীনে নিতে চাইবে। তোমার সুন্দর দেহ ও যৌবনের সুযোগও নিতে চাইবে কেউ কেউ। তারা সুন্দরী ললনাদের তোমার পেছনে লাগাতেও দ্বিধাবোধ করবেনা। বুদ্ধিমত্তার সাথে পথ চল। এতে ব্যক্তি, ধর্ম ও জাতি রক্ষা পাবে।'

থামলেন বিদ্যানাথ। পরে বললেন, 'নিশাপুর থেকে মথুরা কতদুর' কথাটা মনে রেখেই কাজ করো। মনে রেখ! দূর পাল্লার এই পথে তুমি কেন এসেছ! ভারত ললনাদের সৌন্দর্য সুষমা যেন তোমার আকাশসম মিশনকে ভেস্তে না দেয়। যৌবনের পথটা বড্ড পিচ্ছিল, বড় ধোঁয়াটে। এই ধোঁকা ও মায়া-মরিচিকা মানুষের জীবনকে ধ্বংস করে দেয়।'

হাম্মাদ বিনয়াবনত চিত্তে বলল, 'মুহতারাম! মিশন সফল করতে জীবন দেয়া লাগলেও আমি পিছপা হব না। আপনি বিদ্যানাথ– একথাই সকলে জানবে।

কোনদিনও আপনার মূল পরিচয় কারো সামনে তুলে ধরব না। অঙ্গীকার করছি, আমার কাজে কখনও শৈথিল্য আনব না। অভিষ্ঠ লক্ষ্য পুরনে হবনা পিছপা। এ সরেজমিনে ওয়াদাপুরনের এক নয়া ইতিহাস কায়েম করতে চাই আমি।

হাম্মাদ আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল। এসময় জ্ঞান কামরায় প্রবেশ করল। বলল, বিশ্বপাল আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছে। বিদ্যানাথ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'ওর সাথে দেখা করে নাও। অনেকক্ষণ ওর সাথে তোমার দেখা নেই। রওয়ানা দেবার আগে আরেকবার তোমার সাথে দেখা করতে চাই।' হাম্মাদ বেরিয়ে গেল।

তিন.

খাটে শায়িত বিশ্বপাল।

জ্ঞানের সাথে হাম্মাদ কামরায় প্রবেশ করল। বিশ্বপাল হাতের ইশারায় জ্ঞানকে বেরিয়ে যেতে বলল। হাম্মাদকে লক্ষ্য করে বিশ্বপাল বলল, 'হাম্মাদ দরোজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিন এবং আমার কথা শুনুন।'

দরোজার ছিটকিনি লাগিয়ে বিশ্বপালের বিছানায় বসে হাম্মাদ বললো, 'হ্যাঁ বলো, কি বলতে চাও।

ভাবনার অথৈ সাগরে ডুবে গেল বিশ্বপাল। হাম্মাদ দেয়ালে টাঙ্গানো মুর্তিগুলোর দিকে দৃষ্টি ফেরাতে লাগল। সহসাই বিশ্বপালের কথায় হাম্মাদ চককে ওঠল, 'হাম্মাদ! হাম্মাদ! তুমি কি সত্যি সত্যিই এ হাবেলীতে সর্বদার জন্য থাকছ।'

হাম্মাদ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বিশ্বপালের দিকে তাকিয়ে বলল তুমি এ হাবেলীতে খুব কমই দেখতে পাবে। ইতোমধ্যে হয়ত জেনে গেছ আমি আজ সন্ধ্যায় এখান থেকে রওয়ানা করছি।'

'কোথায়?'

'মথুরা।'

'কেন? কি কাজে?'

'আমার কাজ শহরে বন্দরে ঘুরে তোমার মামুর ব্যবসা দেখা।'

'ফিরছো কবে?'

'এক্ষণে তা বলতে পারছিনা। হতে পারে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস আমাকে ঘুরে ফিরতে হবে। মথুরা থেকে আমাকে নগরকোটও যাওয়া লাগতে পারে।' বলল হাম্মাদ।

হাম্মাদের হাত নিজের হাতের মুঠোয় পুরে বিশ্বপাল বলল, 'হাম্মাদ! হায়। এই হাবেলী ছাড়া ও যদি অন্য কোথাও তোমার সাথে কথা বলতে পারতাম। আমার ভাই! আমার মোহ্সেন। আমাকে পবিত্র কোরআনের সেই বাণীটুকু আবার শোনাও যা সেই রাতে শুনিয়ে ছিলে। আহা! ইসমাঈলের মত যদি আমিও তোমার সঙ্গ দিতে পারতাম। কি অসহায় মানুষ আমি।'

হাম্মাদ বিশ্বপালের এই কাকুতি-মিনতির তলা খুঁজে পেল না। বিশ্বপাল বলল, তুমি যে তেলাওয়াত করেছিলে ওটা তোমাদের খোদার পক্ষ থেকে রাসূল মোহাম্মদের প্রতি অবতীর্ন ঐশী বাণী?'

হাম্মাদ বিশ্বপালের মনের ভাবটা এবার খানিক উদ্ধার করতে পেরে মোবাল্লেগের সুরে বলল, হ্যাঁ! বিশ্বপাল। খোদা তা'আলার থেকে অবতীর্ণ। এটা কোন মানব রচিত কিতাব নয়।

'জানো হাম্মাদ! আমাদের হিন্দুধর্মের লোকদের বিশ্বাস মুসলমানদের খোদার কোন অস্তিত্ব নেই।

হাম্মাদ রেগে উঠল। বলল, আমাদের খোদা আছে। তিনি সর্বত্রই বিরাজমান। সে কোন শক্তি যে সৌর পরিবারকে পরিচালনা করছেন, কে এই আসমানকে বিনা খুটিতে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন? কে এই পাহাড়গুলোকে সুউচ্চ ও যমীনকে সুবিন্যস্ত করেছেন? শুষ্কপ্রায় যমীনে কে প্রাণের সঞ্চার করেন?

বিশ্বপালের তনুমন শিহরণ খেলে যায়। আচমকা সে ডান পার্শ্বের মূর্তিগুলোর দিকে বলল, এগুলোর ব্যাপারে তোমার মন্তব্য কি?

হাম্মাদ বিনয়তা প্রকাশপূর্বক বলল, 'আমি কারো ধর্ম নিয়ে মন্তব্য করার পক্ষপাতি নই। তবে এ মূর্তিগুলো অন্ধ ও বধির। ওদের কোন অনুভূতি শক্তি নেই। তারপরও এগুলো কি করে খোদা হয়? যাদের অস্তিত্ব মানব হাতের নিপুণ ছোঁয়ায় তারা কি করে খোদা হয়?'

বিশ্বপাল দৃঢ়তার সাথে বলল, 'হাম্মাদ! আমি তোমাদের ধর্মে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বলো কি করলে তোমার ও ইসমাঈলের মত মুসলমান হতে পারব?'

হাম্মাদের ঠোঁটে মুচকি হাসি খেলে গেল। পরক্ষণে বিশ্বপালের মুখে শোনা গেল কলেমা-ই তায়্যিবার উচ্চারণ। 'হাম্মাদ! আজ থেকে তুমি আমার ভাই। আমার বন্ধু। মোহসেন ও দিশারী।'

বিশ্বপালের ইসলাম গ্রহণ পর্ব সমাপ্ত হতেই সে বলল, 'হাম্মাদ! তুমি তো আজই মথুরা যাচ্ছ। শুধু ইসমাঈলকে বলো আমি মুসলমান হয়েছি। তবে ব্যাপারটি যেন এখন গোপনই থাকে। আমি পুরোপুরি সেড়ে না ওঠা পর্যন্ত সে যেন এখানেই থাকে। আমি ওদের বসতিতে যাব। হেকিম আবু বকরের সান্নিধ্যে ইসলামের বিস্তারিত যা জানার জানব। 'তুমি চিন্তা করো না। ইসমাঈলকে যা বলার সবই বলে দেব।'

বিশ্বপাল আরো যেন কি বলতে যাচ্ছিল এ সময় দরোজার ছিটকিনি নড়ে ওঠল। ওরা গেল খামোশ হয়ে। হাম্মাদ দরোজা খুলে দিলে রত্না ভেতরে প্রবেশ করল। ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাম্মাদ দ্রুত প্রস্থান করল। রত্না গেল ভাইয়ের পাশটিতে বসে।

দিনান্তের ক্লান্তি শেষে সূর্য পশ্চিম আকাশে অস্ত গেল। ঝাকছাড়া পাখি আবারো ঝাকে ঝাকে উড়ে এলো স্ব-স্ব নীড়ে। জমকালো আঁধার পর্দা নেমে এল পার্বতাঞ্চলে। বিদ্যানাথের কুঠি থেকে বিদায় নিয়ে স্বরসতীর কিনারা ধরে হাম্মাদ এগিয়ে চলল। এক সময় পুলের ওপর চড়ল। পেছনে ভীমসেন বসতি।

নিশুতি রাতের বুক চিরে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে হাম্মাদের ঘোড়া। শেষ রাতে ও একটি ঘন জংগলে প্রবেশ করল। ওর চোখের সামনে আবছার মত ভেসে ওঠল পুকুর। সহসাই থেমে গেল ওর চলার গতি। ফজরের ওযু করতেই খুব সম্ভব ওর থেমে যাওয়া। ঘোড়ার জিন থেকে দানা খুলে ওকে খেতে দিল। খানিক বাদে তাজাদম হতে ঘোড়াকে নিজ ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিল ঘাস খেতে।

ওযু সেড়ে হাম্মাদ উঠে দাঁড়াল। পরিষ্কার একস্থানে ও নামাযে দাঁড়াতে যাবে ঠিক সে মুহূর্তে পাশেই কি একটা আওয়াজে ওর প্রতিরোধ শক্তি সজাগ হয়ে ওঠল। আওয়াজটার গতি-প্রকৃতি আঁচ করতে ওর ললাটের চামড়ায় ভাঁজ পড়ল। আওয়াজটা কোনো অশরীরী আত্মার। হয়তবা ওকে লক্ষ্য করে হামলা করতে এগিয়ে আসতে চাইছে। মুহূর্তেই তলোয়ারের বাটে ওর হাত চলে গেল।

চারিদিকে সন্ধানী দৃষ্টি বুলায় হাম্মাদ। আচমকা একটি ভাল্লুকের প্রতি নজর পড়ায় ও অট্টহাসি দিয়ে ওঠে। 'তাহলে তুই-ই এতক্ষণ আওয়াজ করেছিস।' অবজ্ঞার হাসি টেনে বলল হাম্মাদ।

হাম্মাদ তলোয়ার উত্থিত করতেই ভাল্লুকটি পালিয়ে যায়। এবার নিশ্চিন্তে ও নামাযে দাঁড়াতে যায়। আচমকা হালকা ঘোড়ার পদধ্বনি ওর কানকে সচকিত করে তোলে। হাম্মাদ বলে ওঠে, এই অন্ধকারে কারা আমার পশ্চাদ্ধাবন করে ফিরছ সাহস থাকে তো সামনে চলে এসো।'

জংগলের ভেতর থেকে পরিচিত কণ্ঠে কেউ বলে ওঠল, 'মনিব! আমি জ্ঞান! বিদ্যানাথ আপনার সহযোগিতায় আমাদের চারজনকে প্রেরণ করেছেন। আমরা এতক্ষণ দূরত্ব বজায় রেখে আপনার পেছনে পেছনে এতদূর এসেছি।'

হাম্মাদের ঠোঁটে মুচকি হাসি ফুটে ওঠল। নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে সবুজ গালিচার বুকে পরম সান্নিধ্যে দাসত্বের সত্ত্বা বিলিয়ে ফজর আদায় করল হাম্মাদ। পরক্ষণে ওর ঘোড়া ছুটল গন্তব্য উদ্দেশ্যে।

দুই.

কোন এক সন্ধ্যায় হাম্মাদ যমুনার উপকুল ধরে চলছিল। প্রচন্ড ঠান্ডার দারুন নদীতীর শুষ্ক ছিল। মাঝনদীতে জেলে মনের সুখে ভাটিয়ালী গান ধরে জাল ফেলছিল। হাম্মাদ ছুটে চলছে তো চলছে।

এক সময় ও নারায়ণ আশ্রমের সামনে এসে দাঁড়াল। ঘোড়া থেকে অবতরনের পূর্বে ও ওই প্রাচীন— ইমারতের প্রতি নজর বুলিয়ে নিল যার গায়ে প্রৌঢ়ত্বের ছাপ। ঘোড়া গাছে বেধে ভেতরে ঢুকল হাম্মাদ। আশ্রমটি বৃহৎ ও রহস্যপূর্ণ। ছাদের চুনগুলো খসে পড়েছে। গাত্রে গাত্রে দেব দেবী সাঁটানো। হাম্মাদ রহস্যপূর্ণ এই আশ্রমের ভেতরে ঢুকে চলেছে। বেশ খানি ঢুকে পড়েছে। ওর পরনে হিন্দু ক্ষত্রীয়দের মত চটের ছদ্মবেশী পোশাক। বিদ্যানাথ-ই ওকে এই ছদ্মবেশ ধারণ করতে বলেছিলেন। দেখা দৃষ্টিতে ওকে মনে হচ্ছিল জনৈক ক্ষত্রীয় যুদ্ধংদেহী।

কদ্দুর যাওয়ার পর জনৈক বুড়া পণ্ডিতের সাথে ওর দেখা। হাম্মাদ তার পথ আগলে বলল, মহারাজ!'

পণ্ডিত মশাই থমকে দাঁড়ালেন। হাম্মাদকে লক্ষ্য করে বললেন, 'বলো খোকা, কি বলতে চাও!'

হাম্মাদ বড্ড বিনয়সহকারে মাথা নীচু করে বলল, 'মহারাজ! আমি পণ্ডিত পরমানন্দের সাথে সাক্ষাৎপ্রার্থী। পণ্ডিত মশাই কড়া কণ্ঠে বললেন, 'তুমি পণ্ডিত পরমানন্দজিকে চেন কি করে?'

'তিনি আমার দেশী।' নম্র লাজুক কণ্ঠে বলল হাম্মাদ।

'তুমি কি ভীমসেন থেকে এসেছ?'

'জী হ্যাঁ। ভীমসেন থেকে। আমি বিদ্যানাথের গোমস্তা। মথুরা এসেছি ব্যবসায়ীক সফরে। এসেছি এখানকার বাজারের অবস্থাদি জানতে। তাই ভাবলাম পণ্ডিতজির সাথে সাক্ষাৎ করে যাই। পণ্ডিত মশাই ইশারা করে বললেন, সামনের তিনটি কামরার পরেরটাতেই পরমানন্দের বাস।

হাম্মাদ ওই কামরার সামনে এসে দাঁড়াল। আধাভেজা দরোজা খুলে দেখল কামরার মাঝে জনৈক অশীতিপর বৃদ্ধ হরিনের চামড়ায় পরম স্থীরচিত্তে ধ্যানে মগ্ন। আশে পাশের কোন অনুভূতি নেই তার। আশে পাশে কেউ নেই। হাম্মাদ নির্দ্বিধায় ভেতরে ঢুকে বলল. 'আমার দৃষ্টিভ্রম না হলে আপনি নিশ্চয়ই পণ্ডিত পরমানন্দ।'

ধ্যানভঙ্গ পণ্ডিত ঘাড় ফিরিয়ে রক্তলাল চোখে বললেন, 'মুর্খ কোথাকার! কে তুই! কেন আমার ঐশ্বরিক ধ্যানের বুকে লাথি মারলি?'

হাম্মাদ কথা না বাড়িয়ে খোলাখুলিই বলল, 'আমি ভীমসেন থেকে এসেছি। বিদ্যানাথ আমাকে প্রেরণ করেছেন। তার জরুরী পরগাম নিয়ে আমাকে আসতে হয়েছে।

'তিনি আমার নামে পয়গাম প্রেরণ করেছেন?'

হাম্মাদ তরবারীর খাপ থেকে পত্র বের করে তার হাতে দিল। বলল, প্রতিটা ছত্রই আপনার কাছে আমার আগমন, কর্ম ও পরিচিতি তুলে ধরবে নিঃসন্দেহে।'

পরমানন্দ পত্র পাঠ করে যার পরনাই খুশী জাহির করে কালো হরিনের চামড়ার দিকে ইশারা করে বললেন, 'আসুন মহারাজ! বসুন!'

হাম্মাদ সস্থানে দন্ডায়মান। সে কানে কানে বলল, 'আমি বসব না। আমাকে আইলাক খান সম্পর্কে কিছু বলুন।

পরমানন্দ ভক্তিভরে বললেন, 'আমাদের দেব-ভূমিতে কর্তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলাপ করবেন আর পুরোহিত বসে থাকবে- তা কি করে হয়। আপনি হরিনের চামড়ায় বসুন। এটা আমার জন্য সৌভাগ্যের বিষয় হবে।' ক্রমশঃ পরমানন্দের সুর পাল্টে যেতে লাগল।

হাম্মাদ কালো হরিণের চামড়ায় বসে পড়ল। পরমানন্দ বলতে লাগলেন, 'আইলাক খান এখানকার স্থানীয় রাজ-কারাগারে বন্দী। তাঁকে নিশ্চিদ্র কারাগারে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে বলে প্রকাশ। রিমাণ্ডে তাঁর মুখ থেকে এদেশে আর কে কে গুপ্তচর বৃত্তিতে লিপ্ত আছে তা জানতে চাওয়া হচ্ছে। যতদূর শুনেছি আইলাক খান মুখ খোলেননি আজো। তার জবাব কেবল একটিই— আমি কিছু জানিনা। হাম্মাদ উদ্বিগ্নতার সাথে বলল, 'আইলাককে কি করে উদ্ধার করা যায়। নিশাপুর থেকে আমার মথুরা আগমনের হেতু কেবল তাঁকে উদ্ধার।'

'আমি বহুমুখী চেষ্টা করে বিফল হয়েছি। প্রতিটি মিশনই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।' পরমানন্দের কণ্ঠে হতাশার সুর, তবে আপনি চেষ্টা করলে তাকে মুক্ত করা সম্ভব।'

হাম্মাদ আশাব্যঞ্জক কণ্ঠে বলল, 'তা কি করে?'

তিনি খানিক ভেবে বললেন, 'রাজপ্রহরীরা প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্বে গরু গাড়ীর পেছনে বেঁধে আইলাক খানকে শহরে প্রদক্ষিণ করায়। চাবুক কষে। বেচারা বড্ড কষ্টে বেঁচে আছে। তাকে তৃষ্ণার্ত রাখা হয়। এতদসত্ত্বেও তথ্য ফাঁস না করার ব্যাপারে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ওরা তাকে যখন প্রকাশ্য রাজপথে নামায় তখন তাঁকে মুক্ত করার একটা পরিকল্পনা আপনি নিলেও নিতে পারেন। অন্যথা তাঁর মুক্তির কোন পথ খোলা আছে বলে আমার মনে হয় না।

হাম্মাদ সস্থানে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি সার্বিক পরিস্থিতি বুঝে গেছি। চিন্তা করবেন না। আমার খোদা চাইলে কাল হবে আইলাক খানের কারাজীবনের শেষ দিন। আজকের মত চললাম। রাতটা কোন সরাইখানায় কাটিয়ে দেব।

ঝড়ের বেগে বেড়িয়ে গেল হাম্মাদ। নদীর কিনারা দিয়ে চলছিল ওর ঘোড়া। আচমকা চার ঘোড় সওয়ার ওকে ঘিরে নিল। হাম্মাদ এজন্যে আগে ভাগেই প্রস্তুত

ছিল। কারণ এরা শত্রু নয় মিত্র। জ্ঞান ও তার সঙ্গী সাথী। জ্ঞান অগ্রসর হয়ে বলল, 'এক্ষণে কী নির্দেশ মান্যবর আমীর! মন্দিরে পণ্ডিত পরমানন্দের কাছ থেকে কোন সংবাদ পেলেন কি?'

হাম্মাদ খানিক অগ্রসর হয়ে জ্ঞানের কানে কানে বলল, 'শোন! আজকের রাতটা আমরা মথুরা শহরে পৃথক পৃথক সরাইখানায় কাটাব। রাজপ্রহরীরা আইলাক খানকে প্রত্যহ বিকাল বেলায় গরু গাড়ীতে বেধে শহর প্রদক্ষিণ করায়। এর দ্বারা ওদের উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ দুটি। প্রথমতঃ গুপ্তচরদের মনে ভীতির সৃষ্টি করা। দ্বিতীয়তঃ তার কষ্ট বৃদ্ধি করা এবং তথ্য ফাঁসে বাধ্য করা। ওরা জানতে চায়, এমন গুপ্তচর আর কে কে আছে যারা গজনীর মুসলমানদের হয়ে কাজ করছে। আইলাক খান দাঁত কামড়ে আছে। এখন পর্যন্ত তিনি কোন তথ্য ফাঁস করেননি। কাল ওরা তাকে নিয়ে নিয়ম মাফিক বেরোবে। আমি কোন না কোন বাহানায় ওই গরু গাড়ী থামাব। তুমি তোমার সাথীদের নিয়ে সুবিধেমত স্থানে ওঁৎপেতে থাকবে যেখান থেকে তাকে উঠিয়ে নির্বিঘ্নে পালাতে পারব।

তোমরা আমার নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবে। যখন তোমাদের দিকে ডান হাত উঁচিয়ে ইশারা করব তখনই তোমরা রাজ সেপাইদের ওপর তীর চালাবে। কিছু তীর দর্শকদের উদ্দেশ্যেও ছুঁড়বে। এতে ওখানে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। এই ফাঁকে আমি আইলাককে নিয়ে পালাব। আমি ওকে নিয়ে পালাতে সফল হয়েছি দেখামাত্রই তোমরাও যথাসম্ভব দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করবে। শহর থেকে বেরিয়ে তোমরা ভীমসেনের উদ্দেশ্যে ছুটবে না। কারণ এতে আমাদের ও বিদ্যানাথের জন্য মারাত্মক কোন বিপর্যয় নেমে আসার শংকা রয়েছে। আমাকে লক্ষ্য করেই তোমরা ছুটবে।

আমি শহর থেকে বেরিয়ে যমুনা উপকূল ধরে ছুটব। যাব দক্ষিণমুখো। ওখান থেকে কিছুদূর গিয় স্বরসতী ও ভীমসেনের মধ্যবর্তী অঞ্চল ধরে যাব পূর্বদিকে। রাজ সেপাইরা আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করলে ধোঁকা খেয়ে যাবে। এবং আমাদের পেছনে কেবল যমুনার উপকূল ধরেই ছুটতে থাকবে। আমি ওই পথে কদ্দুর অগ্রসর হয়ে যমুনা পার হয়ে সাধারণ পথ ছেড়ে পাহাড় জংগল হয়ে ভীমসেন যাব।

হাম্মাদ নিশ্চিন্ত হতে জ্ঞানকে বলল, 'আমার পরিকল্পনা বোধগম্য হলো কি তোমার!

জ্ঞান সম্মতিসূচক মাথা হেলে বলল, "আপনি কোন চিন্তা করবেন না মনিব! আমাদের কর্মতৎপরতা আপনার নির্দেশ মোতাবেকই পাবেন।

হাম্মাদ ওদের থেকে পৃথক হয়ে মথুরার পথ ধরল। জ্ঞানেরাও পৃথকভাবে শহরমুখো হল।

তিন.

মন্দিরের শহর মথুরা।

পরদিন। রথাকৃতির গরুগাড়ীতে আইলাক খানকে বেধে রাজপথে নামানো হলো।

আইলাক খান স্বাস্থ্যবান অতিকায় এক জোয়ান। জমকালো একরাশ চুলের অধিকারী এই আইলাক, টানা টানা ভ্রু। মাঝারী গোছের রথের পেছনে সে বাধা। অসুরাকৃতির একলোক তাকে চাবকে চাবকে পিঠের ছাল তুলে নিচ্ছে। তার সাথে নির্দয় পশুর মত ব্যবহার চলছে। রথের দুপাশে দু'লোক জল্লাদকে সাহায্য করে চলেছে।

আইলাককে চেনার কায়দা নেই। উস্ক খুস্ক চুল। ছেড়াফাটা জামা। চেহারায় অমানাবক নির্যাতনের ছাপ। এত নির্দয় অত্যাচারের মুখেও বেচারা নিশ্চুপ নির্বিকার। ওরা তাকে গালি দিয়ে চলেছে সমানে। দশর্কদের বিশাল এক সারি এদৃশ্য উপভোগ করছে এবং রথের পিছু পিছু ছুটছে। দিচ্ছে যাচ্ছে তাই গালী। কেউ কেউ মারছে পাথরও।

জনাকীর্ন বাজার ছেড়ে রথ এক সময় খোলা স্থান অতিক্রম করছিল। দর্শকদের মধ্য থেকে দু হিন্দু জোয়ান আচমকা পেছনে থেকে আইলাক খানকে ধরে রাখতে ব্যপৃত হল। এদিকে আইলাক খানও ঝুঁকে ওদের সাথে শক্তি পরীক্ষা করল। এক্ষণে এক ধরনের ধস্তাধস্তি শুরু হল। ওই দু'জোয়ান রথ থামাতে চাইল। কিন্তু তারা ব্যর্থ হল। কেননা আইলাক খানের পাশের দু'জোয়ান রথকে জোড়ে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল।

এ সময় হাম্মাদ ঘোড়ায় চেপে ধুমকেতুর মত আবির্ভূত হল। রথের কাছে এসে তিন হিন্দু জোয়ানকে পেছনে সড়ে যেতে বলল। তিন জোয়ানই পিছু হটে দর্শক সাড়িতে ঢুকে গেল।হাম্মাদ অগ্রসর হোল এবং রথ থামিয়ে দিল। আইলাক খান অবাক হয়ে পেছনে তাকাল। তার আত্মজিজ্ঞাসা, কে এই জোয়ান?

সে আগন্তুককে একাকীই রথের গতি বন্ধ করতে দেখে রাগে পুর্নশক্তিতে রথকে সামনে ঠেলতে ব্যপৃত হল। কিন্তু ব্যর্থ হল। হাম্মাদ রথকে এভাবে থামিয়ে দিল যেন সে এক মস্ত পাহাড়।

দর্শক সাড়িতে উত্তেজনা। যেখানে তিন জন লোক আইলাকের সাথে রথ থামাতে ব্যর্থ সেখানে আগন্তুক কি করে একাই এই রথ থামাল। আগন্তুকের গায়ে যেন অসুরের শক্তি। আইলাক খান শক্তি পরীক্ষায় হাম্মাদের সাথে পেরে উঠল না। কন কনে শীতের মওসুমেও তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে ওঠল। হাম্মাদ জোরে রথ চালিয়ে একস্থানে নিয়ে গেল। আইলাকও রথ পেছনে না নিয়ে সামনে টানতে চেষ্টা করল। কিন্তু এবারও সে ব্যর্থ।

রথ চালক রাজপ্রহরীরা আইলাকের শরীরে কোড়াঘাতপূর্বক বলল, 'গাদ্দার! কুত্তা, হারামী এবার জোর দাওনা। হাম্মাদ অগ্রসর হয়ে রথচালককে বলল, 'মহারাজ। অনুমতি দিলে বেটাকে একটু পরখ করে দেখতাম।'

রথচালক বলল, 'অবশ্যই! চেষ্টা করো। হাম্মাদ বলল, 'প্রথমে তার বন্ধু সেজে কার্যোদ্ধার করব। আমি ব্যর্থ হলে তাকে রথ থেকে আলাদা করে শায়েস্তা করব এবং তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা করব। বেটাকে আজ এমন শাস্তি দেব যাতে ওর পেটের সব কথা বের হয়।'

রথচালক সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে হাম্মাদের দিকে তাকাল। বলল, 'তুমি এমনটা পারলে বড় একটা উপকারই হবে। এতে রাজা মশাইয়ের কাছে আমাদের পদমর্যাদা বাড়বে বৈ কমবে না।

হাম্মাদ এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, 'আপনাদের সহকারীদের অল্প সময়ের জন্য একটু দূরে সড়িয়ে দিন। ওদের উপস্থিতিতে আমি তথ্যোদ্ধারে ব্যর্থ হতে পারি। রথ চালক নীচে নামল এবং সহকারী ও দর্শকদের খানিক দুরে সড়ে যেতে নির্দেশ দিল।

ঘোড়ার লাগাম কষে হাম্মাদ এবার আইলাক খানের কাছে এলো। অনুচ্চস্বরে বলল, আইলাক খান! আইলাক খান! আমি তোমার দুশমন নই। তোমার দোস্ত ও ভাই আমাকে দেখো! আমার বাড়ী মথুরা নয়– নিশাপুর। তুমি বিদ্যানাথকে চেন না যার প্রকৃত নাম আবুল ফাত্‌হ।' আইলাক খান হাম্মাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করে একে একটা চাল মনে করল। কাজেই সে বলল, 'আমি নিশাপুর ও আবুল ফাত্‌হ বলে কাউকে চিনি না। তুমি আমার থেকে কোন কথাই উদ্ধার করতে পারবে না।

হাম্মাদ আশাহত কণ্ঠে বলল, 'আইলাক আবেগ ছাড়ো। পরিবেশ পরিস্থিতির প্রতি নজর বুলাও। চোখের পর্দা সড়াও। আমাকে দেখো।' বলে হাম্মাদ আইলাক খানের ঘাড়ে হাত বুলাল। আত্মসম্ভ্রমবোধ সম্পন্ন জাতির ভাই আমার! তুর্কি আত্মভিমানী সন্তান হে! তোমার দেহের উত্তাপ ও ঈমানী শক্তির মহড়া প্রদর্শন করো। এসো উভয়ে মিলে হাবিল-কাবিল নাটকের মহড়া করি। এবং দুশমনকে মৃত্যুর তীরে উপনীত করি। পরক্ষণে সটকে পড়ি এই নরকপুরী থেকে।

হাম্মাদের কথায় আইলাক খানের ভেতরের সিংহ পৌরুষটা সজাগ হয়ে ওঠল। সে মাথা নোয়াল। ডুবে গেল ভাবনার অথৈ সাগরে। এতদসত্ত্বেও সে বলল, হিন্দুচেতনায় তুমি আমাকে ডুবাতে যেও না যুবক।' হাম্মাদ এবার খানিক কড়াকণ্ঠে বলল, 'আইলাক খান! মনে রেখো, আমি তোমার সামনে কোন প্রকার হিন্দু চেতনা দিতে আসিনি। বলো তোমার বিশ্বাস অর্জনের জন্য কোন অভিব্যক্তি তুলে ধরব আমি। তুমি আমার কথা না মানলে আমার ধৈর্য্যচূতি ঘটবে কিন্তু। এরা তোমাকে এমনিভাবে মেরে-কেটে মৃত্যুর দুয়ারে উপনীত করবে। ওদের অভিধানে দয়ামায়া শব্দটি নেই জেনো। তুমি আমার জাতির বীর। এসো বন্ধু! এসো ভাই! উভয়ে মিলে এই নির্দয়দের বিরুদ্ধে হুংকার মারি। ওদের যখমে যখমে কুপোকাত্ত করে এখান

থেকে বেরিয়ে পড়ি। আমার ঘোড়া দেখছ না। এতে চেপে আমরা সহজেই এস্থান ত্যাগ করতে পারব।

আইলাক খান নিশ্চুপ নির্বিকার। পথহারা পথিকের ন্যায় সে সন্দিহান। না জানি এর কথা কতটুকু সত্য এমন একটা সন্দেহ সংশয়ের দোলাচালে সে দোল খেতে থাকে।. . .

হাম্মাদ দয়ার্দ্রকণ্ঠে বলল আমার সহকর্মী হয়ে আঘাত হানতে প্রস্তুতি নাও আইলাক খান। কিসের ভাবনায় ডুবে যাচ্ছ তুমি। আত্মজিজ্ঞাসার সময় নয়, এখন সময় দুশমনকে আঘাত করে ফেরারী হবার। কসম খোদার। তুমি তুর্কি জাতির গৌরব। তুমি আমার সঙ্গ দিলে দুশমনকে রক্ত পাথারে ফেলে আমরা বেরিয়ে পড়ব।'

থামল হাম্মাদ। খানিক পর দম নিয়ে বলল, কসম সিদরাতুল মোনতাহা ও জাবালে ফারানের যেখান থেকে সর্বপ্রথম হকের মশাল উদগীরন হয়েছিল। যদি তুমি আমার কথা না শোন তাহলে তোমার ব্যক্তিত্বের প্রতি আমি অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে বাধ্য হব। এবং তোমাকে এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাব। মনে রেখ। আমি তোমার চেয়ে দুর্বল নই। তোয়ালুক শহরে পাইন গাছে বাধা যে রশি তুমি ছিড়েছিলে সেটা ছিড়েছি আমিও। নাসীরুদ্দীন-ই আমাকে সেই রশি ছিড়তে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনিই আমাকে তোমার মদদের জন্য প্রেরণ করেছেন।

আইলাক খানের চেহারা চকচক করে ওঠল। তার কাছে ব্যাপারটা পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে গেল। দূরীভূত হল সন্দেহের পর্দা। হাম্মাদ বলল, আইলাক খান! তোমাকে আমি মথুরার নরক পুরীতে ধুঁকে ধুঁকে মরতে দেব না। এসো! দুশমনকে কচুকাটা করি। এসো মূল্যবান সময় আর অপচয় করো না। সময় এসে গেছে তোমার পলায়নের। সময় এসেছে তোমার মুক্তির।

আইলাক খানের ঠোঁটে মুচকি হাসি খেলে গেল। কিন্তু ধৈর্য্যের পিরামিড এই যুবক কোন কথাই বলল না। হাম্মাদ বলল, 'আইলাক খান! দেখ! শূন্যে আমার ডান হাত উঁচিয়ে তোমাকে উদ্ধারের মিশন শুরু করছি। দেখ! তোমার শত্রু কি করে ধুলোয় লুটোপুটি খায়। ফেরাউন-নমরূদের পরিণতি দেখার প্রস্তুতি নাও বন্ধু।'

হাম্মাদ মুহূর্তে তার ডান হাত শূন্যে উঁচিয়ে ধরল। নিকট দুরে ওঁৎপেতে থাকা জ্ঞান ও তার সাথীরা বেপরোয়া বেশ কটি তীর নিক্ষেপ করল। রথচালক ও তার সহকর্মীরা পয়লা আক্রমনেই মৃত্যুর দুয়ারে উপনীত হল। এবার ওরা দর্শকসাড়িতে কিছু তীর মারল। উপস্থিত দর্শককূলে ভীতি ছড়িয়ে পড়ল। সেখানে কিছু মরল তীরাঘাতে আর কিছু হুলস্থুলে পদতলে পিষ্ঠ হয়ে।

হাম্মাদ তৎক্ষণাৎ তলোয়ার দ্বারা আইলাকের রশি কেটে দিল। পরক্ষণে এক লাফে ঘোড়ায় চাপল। আইলাক খানও ক্ষুধার্ত শার্দুলের মত হাম্মাদের পেছনে চেপে বসল। আইলাক এই প্রথম স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'জানি না তুমি কে। এতদসত্ত্বেও তুমি জাহান্নামে নিয়ে গেলেও আমার আপত্তি নেই। আমি তোমার সাথে আছি থাকব।'

হাম্মাদ আপনার ঢাল-তলোয়ার আইলাকের হাতে তুলে দিল। বলল, এগুলো তোমার কাছে রাখো। চলার পথে কেউ বাধ সাধলে এস্তেমাল করো। আমি ঘোড়া হাঁকাচ্ছি।

পাক্কা শিকারী আইলাক তলোয়ার উঁচাল। কেউই ওদের পথ আগলানোর সাহস পেল না। ঘোড়া ছুটে চলছে উর্দ্ধশ্বাসে। যে-ই ওদের সামনে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছে আইলাকের কোপে তার মাথা কাটা পড়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা শহর রক্ষা প্রাচীর মাড়িয়ে যমুনার তীরে উপনীত হল। জ্ঞান ও তার সঙ্গীরা ভিন্ন ভিন্ন পথে শহর থেকে বেরিয়ে যমুনার তীর উদ্দেশ্যে ছুটতে থাকল।

চার.

জমকালো রাত্রী নেমে আসে। প্রকৃতিতে নিঝুম নিস্তব্দতা। যমুনার তীর বেয়ে হাম্মাদ পূর্ণশক্তিতে ঘোড়া ছুটিয়ে চলছে। তার ঘোড়াও প্রভূর উদ্দেশ্য ও পরিস্থিতি আঁচ করে ভয় লেশহীন গতিতে চলতে থাকে। চাঁদবিহীন রাত্রীতে শোনা যায় কেবল বিলীয়মান ঘোড়ার পদধ্বনি।

যমুনার উপকুল ধরে মাইল পাঁচেক চলার পর হাম্মাদ তার ঘোড়া পানিতে নামিয়ে দিল। হ্রেষাধ্বনি দিয়ে ঘোড়া হাটুপানিতে নামল। আস্তে আস্তে দেহের পুরোটাই পানির কাছে সোপর্দ করে ওপারে নিয়ে ওঠল প্রভুভক্ত অবলা প্রাণীটি। জ্ঞানও তার সঙ্গীদের নিয়ে হাম্মাদের অনুসরণ করল। ওপারে গিয়ে হাম্মাদ এদের অপেক্ষায় থাকল। খানিকবাদে ওরা হাম্মাদের সঙ্গে মিলিত হল।

আপনার ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে জ্ঞান আইলাক খানকে বলল, 'আয় আমির। আপনি আমার ঘোড়া নিয়ে নিন। ওর জিনে বাধা আছে মামুলী তলোয়ার ও ঢাল। আমি আমার সঙ্গীদের একটার পিঠে না হয় চাপলাম।'

আইলাক খান জ্ঞানের ঘোড়ার পিঠে চেপে হাম্মাদকে লক্ষ্য করে বলল, আপনি এখনও আপনার পরিচয় দেননি। কে আপনি? কোথায় আপনার বাড়ী?' নিশাপুরের সাথে আপনার সম্পর্ক কিসের? নাসীরুদ্দীনের সাথে আপনার পরিচয় কিভাবে এবং বিদ্যানাথের প্রকৃত নাম আবুল ফাতহ সে কথাই বা আপনি জানলেন কি করে?'

হাম্মাদ মুচকি হেসে বলল, 'এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় হয়নি এখনও। আমাদেরকে অতি দ্রুত এই স্থান ত্যাগ করতে হবে। এর উত্তর তুমি স্বয়ং বিদ্যানাথ ও জ্ঞান-এর থেকেই জেনে নিতে পারবে। ওরা দুজন আমার সব রহস্যের সবজান্তা। বলে হাম্মাদ ঘোড়া হাঁকাল। আইলাকও কথা না বাড়িয়ে ওর পিছু নিল। ওদের ঘোড়া এগিয়ে চলছে বন-বাদাড় মাড়িয়ে দ্রুত। অপেক্ষাকৃত সরু পথে চলতে গিয়ে ওরা বেশ সমস্যার সম্মুখীন হল। ওখান থেকে প্রায় মাইল পাঁচেক ঢাল বেয়ে নেমে ভীমসেন এ প্রবেশ করল। ততক্ষণে পূর্ব আকাশে শুক্লাদ্বাদশীর চাঁদ ফুটে ওঠে। চাঁদের কিরণ রশ্মিতে বিরান জংগল ভয়াল হয়ে উঠছে। গা ছমছম করছে। মনে হচ্ছে দুরে কোথাও কেউ কেঁদে ওঠছে। কেউ যেন নেপথ্যে করে ওঠছে আর্তনাদ।

আচমকা সকলকে অবাক করে হাম্মাদ থমকে দাঁড়ায় এবং গভীর নযরে সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বলে, 'থামো! ওর আওয়াজে এক ধরনের নির্দেশ যাতে সকলেই চমকে ওঠে এবং বুঝতে পারে আগুয়ান কোন সম্ভাব্য বিপদের অশনি সংকেত। হাম্মাদ ছোট্ট এই শব্দটির দ্বারা যেন তার সাথীদের ওই বিপদ থেকে বাঁচাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, পরক্ষণে বড় চোখ করে এবং কুঁচকানো ললাটে সামনের দিকে তাকায়। আইলাক খান ওকে লক্ষ্য করে বলে,

আপনি থামলেন কেন? ভীতিকর কিছু দেখলেন কী?'

হাম্মাদ কানে হাত রেখে বললো, 'আইলাক খান। শোন গভীরভাবে কান লাগিয়ে শোন। জংগলে অনবরতঃ ঘোড়ার খুরধ্বনি শোনতে পাও কি।'

আইলাক খান মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করল, পরে বলল হ্যাঁ! আপনার অনুমান যথার্থ। নিবিড় অরন্যে ক্রম আগুয়ান ঘোড়ার খুরধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। এর মতলব, ওরা আমাদের উদ্দেশ্যেই দ্রুত ছুটে আসছে।'

ঘোড়ার খুরধ্বনি এবার আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হাম্মাদ বলে, 'শোন আইলাক! আগন্তুক সওয়ারদের সংখ্যা কোনক্রমে দশের অধিক হবে না। আর এতেও কোন সন্দেহ নেই যে মথুরার থেকে তুমি নিরুদ্দেশ হবার পর সরকার তার খোজারু বাহিনী লাগিয়ে দিয়েছে। তাই ওরা জালের মত ছড়িয়ে পড়েছে। আর হ্যাঁ। আমার শরীরে শেষ ফোঁটা রক্ত বিন্দু থাকা পর্যন্ত আমি ওদের রুখে যাব। আইলাক খান, দোস্ত আমার! কোন অবস্থায়-ই হতোদ্যাম হবে না।'

আইলাক খান সীনাটান করে বলল, ভীনদেশী অপরিচিত দোস্ত! দুশমনের মুখোমুখি হলে দেখবে তাদেরকে আমি ফুল দিয়ে বরণ করছি না। আইলাক খান ৫/৭ জনকে না মেরে নিজে মৃত্যু আলিঙ্গন করছে না। আইলাক খান রনাঙ্গনে মহাপোকারীর প্রতিদান দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি কোনদিনও।

আইলাক খানকে খামোশ হতে হল। কেননা ততক্ষণে কিছু সওয়ার জংগল থেকে বেরিয়ে এসেছে।

আইলাক খান গণনা করে দেখল হাম্মাদের কথা ঠিক। এরা সংখ্যায় দশজন। সে আরো লক্ষ্য করল, হাম্মাদ এক হাতে তলোয়ার আরেক হাতে গুর্জ ধারণ করেছে। আইলাক ও তার সাথীরা ততক্ষণে অস্ত্র ঠিক করে ফেলেছে। হাম্মাদ আগন্তুকদের লক্ষ্য করে বলল,

'তোমরা কারা? আর আমাদের পিছু নেওয়ারই বা হেতু কী?'

জনৈক আগন্তুক আইলাককে লক্ষ্য করে বলে ওঠল, 'মথুরার ওই কয়েদী এত সহজে একাকী এতদূর পালিয়ে আসতে পারে না। তোমরা ওকে ছিনতাই করে এনে ধর্ম ও দেশের প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রকাশ করেছ। কাজেই আমাদের হাতে মরার পূর্বেই বলো, তোমাদের এই গাদ্দারীর শেকড় কোথায় এবং তোমরা কোন দেশের অধিবাসী?

ক্ষুধার্ত বাঘের মত হাম্মাদ হুংকার মেরে ওঠল। কড়া কন্ঠে সে বলল, ' তোমাদের কথা এমন খোকলা ও অন্তঃস্যারশূন্য যে, তা প্রলাপোক্তির মত শোনাচ্ছে। তোমাদের চেহারায় দেখছি নির্বুদ্ধিতা হতাশা ও ক্লেদের ছাপ। তোমরা এতদিন হাতজোড় করা মানুষের সাথে লড়েছ। এবার তোমাদের লড়াই এমন এক জাতির সাথে যাদের ডায়েরীতে পরাজয় ও রণাঙ্গনে পশ্চাৎপদতা নেই।

ঘিরে নেওয়া মথুরা সৈনিকেরা হামলার প্রস্তুতি নিল। হাম্মাদ হাতের গুর্জটি চক্রাকারে ঘোরাল। সেই সাথে লফন কুর্দন করে ওঠল ওর প্রিয় ঘোড়াটি। ওর প্রচন্ড গতির আক্রমনে খেই হারিয়ে ফেলল দুশমনেরা। পয়লা আঘাতে মাথা মাটিতে গড়াগড়ি খেল।

আইলাক খান, জ্ঞান ও তার সাথীরাও একযোগে দুশমনের ওপর ঝাপিয়ে পড়ল। আইলাক খানের প্রচন্ডতম আক্রমনে দু'জনের মুণ্ডুপাত ঘটল। হাম্মাদের বীরত্বে আইলাকের চোখ ছানাবড়া। হাম্মাদ নারায়ে তাকবীর দিয়েই প্রতিবার আক্রমণ সানায়। এতে চেতনা খুঁজে পায় তার সাথীরা। আইলাক বলে 'দোস্ত! বলো বলো। ওই তাকবীর বলে যাও।'

আইলাক হাম্মাদের সঙ্গীদেরকে বলে ' দোস্ত! তোমরাও তোমাদের নেতার অনুসরণে তাকবীর লাগাও।'

জ্ঞান ও তার সঙ্গীরা আইলাক খানের সঙ্গে মিশে এমন প্রচন্ড তাকবীর দিল যাতে গোটা বনভূমি কেঁপে ওঠল। ওদিকে ততক্ষণে হাম্মাদ আগন্তুকদের ধরাশায়ী করে ছেড়েছে। এদের মধ্যে মাত্র তিনজনা কোনক্রমে হামলা করে যাচ্ছিল। আইলাকের আঘাতে একজন, বাদবাকী দুজনা জ্ঞান ও তার সাথীদের আঘাতে মারা গেল।

চাঁদনী রাত।

আইলাকখান হাম্মাদের কাছটিতে এল।

হাম্মাদের চটের বস্ত্র ও দেহ রক্তাক্ত। আইলাক শ্রদ্ধাবনতচিত্তে ওকে বলল,

'আমার মোহসেন! দোস্ত আমার। খোদার দিকে চেয়ে বলুন, আপনি কে? কি আপনার পরিচয়? কোথায় আপনার বাড়ী? যিন্দেগীতে এই প্রথম আপনার মত বিস্ময়কর এক যুদ্ধংদেহী দেখলাম। আপনার থেকে আমার অনেক কিছু জানার আছে। আপনিইতো বোধহয় মথুরার রাজপথে আমার রথকে থামিয়ে আমায় উদ্ধার করেছিলেন।

হাম্মাদ ঘোড়াসহ আইলাকের কাছে এসে দাঁড়াল। তার কাঁধ থাপড়ে বলল, 'আইলাক খান! তুমি অত ভাবতে যেওনা। ভীমসেনে গিয়ে বিদ্যানাথের হাবেলীতে তোমাকে সবকিছু বলব। তোমার নামে হেরাতের গভর্নর নাসীরউদ্দীনের দেয়া একখানা ফরমান আমার কাছে রয়েছে। তার আগে এসো সকলে মিলে বিক্ষিপ্ত লাশগুলো মাটিচাপা দিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করি যাতে পরবর্তীতে কেউ আমাদের পদাংক অনুসরণ না করে।

সকলে মিলে লাশগুলো দাফন করে ফেলল এবং পা দিয়ে মাড়িয়ে রক্তের ছাপ মুছলো। পরে পশ্চিম-উত্তর মুখো ভীমসেনের উদ্দেশ্যে এদের কাফেলা তীব্র গতিতে ছুটে চলল।

পাঁচ.

শেষ রাত।

বিদ্যানাথের হাবেলীতে কড়া নড়ে ওঠল। জ্ঞান সকলের সামনে। কড়ানাড়ার কাজটা সেই সমাধান করল। হাম্মাদ আইলাক ও সঙ্গীরা তার পেছনে। কড়ানাড়ার সাথে সাথে ভেতর হাবেলী থেকে কুকুরের ঘেউ ঘেউ আওয়াজ কানে এল। জনৈক নওকর কুকুর বেধে সামনে এগিয়ে এলো বলে মনে হল। দরজা খুলে গেল। সকলেই হাবেলীতে প্রবেশ করল। ঘোড়াগুলো নিয়ে যাওয়া হলো আস্তাবলে। জ্ঞান হাম্মাদ ও আইলাক খানকে নিজের কামরায় নিয়ে গেল। খানিকবাদে বিদ্যানাথ মশাল হাতে বেরিয়ে এলেন।

দরোজা খুলেছে যে নওকর তাকে ডেকে তিনি বললেন, 'হাবেলীর দরোজার কড়া নাড়ল কে?'

নওকর সহাস্য বদনে বলল, 'জ্ঞান ও তার সাথীরা এসেছে মনিব।'

'হাম্মাদও কি ওদের সাথে এসেছে?' বিদ্যানাথের চোখে মুখে খুশীর ছাপ।

'স্রেফ হাম্মাদ নয়, আমীর আইলাক খানও।' নওকর বলল।

'আমার জানা ছিল নিশাপুরের লৌহমানব যেখানেই যাবে সেখানেই সফল হবে।' কামরার দিকে পা বাড়াতে গিয়ে বিদ্যানাথ বললেন।

হাম্মাদ, আইলাক খান ও জ্ঞান পরস্পরে কথা বলছিল এমতাবস্থায় বিদ্যানাথ ওদের ওখানে প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখামাত্রই আইলাক খান দাঁড়িয়ে জড়িয়ে ধরল। বলল, আমি আপনার অপেক্ষায়-ই ছিলাম।' পরে হাম্মাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি তার সম্পর্কে জানতে উদগ্রীব। নিজের পরিচয়টুকুনও তিনি আমায় দেননি।'

বিদ্যানাথকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই হাম্মাদ তার মাথার পাগড়ী খুলে একটি পত্র বের করে আইলাকের হাতে তুলে দিল। বলল, পড়ে দেখ তোমাদের নামে লেখা নাসীরুদ্দিনের পত্র। আইলাক ও বিদ্যানাথ উভয়েই পত্র খানা আলোতে মেলে ধরল। পড়া শেষে আইলাক মাথা নীচু করে ফেলল। পরক্ষণে হাম্মাদের দুহাটু চেপে ধরে বলল, আজ হতে আপনি আমার আমীর আমি আপনার অধীনস্ত নগণ্য সেপাই মাত্র।'

হাম্মাদ বিনয়াবনত চিত্তে বলল, 'না। এখানকার কর্তৃত্ব তোমার হাতেই থাকবে। আমি তোমারই অধীনে কাজ করতে পারলে নিজকে ধন্য মনে করব।' 'কিন্তু তা কি করে সম্ভব। আপনার উপস্থিতিতে আইলাক কর্তৃত্ব করে কিভাবে? সে একাজের

যোগ্যও না। শক্তি অভিজ্ঞতা ও রণনৈপুণ্যে আপনি আমার চেয়ে ঢের বড়। উল্টো আমিই আপনার মত কমান্ডার পেয়ে নিজকে মনে করছি ধন্য।

'কসম খোদার! আইলাক খান হুকুম দেওয়ার জন্য নয় সৃষ্টি হয়েছে হুকুম পালন করতে।'

হাম্মাদ দাঁড়িয়ে গেল। আইলাকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ফজরের নামাযের সময় আসন্ন। এসো প্রথমে নামায আদায় করে নিই, এর পরে না হয় স্ব-স্ব অভিযানে বের হলাম।' বিদ্যানাথ পেরেশান কণ্ঠে বলল, 'নতুন আবার কোন অভিযান?'

'নগরকোটে আমার জাতির এক অসহায় তরুনী ওখানকার পুরোহিতদের হাতে বন্দী। যদি সে বেঁচে থাকে তাহলে তাকে অতি অবশ্যই বাঁচিয়ে আনতে চেষ্টা করব। পক্ষান্তরে যদি সে মারা গিয়ে থাকে তাহলে খোদা তাআলার দরগাহে দোয়া করব-সে যেন সুখী হয়।

থামল হাম্মাদ। খানিক থেমে আবারো বলল, 'মুসলমান মেয়েটির কি নাম যেন। তোমার বলা সে নামটি এ মুহূর্তে মনে করতে পারছি না।'

বিদ্যানাথ বললেন, তার নাম উমা। নগরকোটের মন্দিরে সে দেবদাসী ছিল। খুবই ধৈর্য ও ধীমান এই যুবতী। ওরা শরীরের চামড়া ছিলে ফেললেও সঙ্গী সাথীদের রহস্য একটুও ফাঁস করবে না। ওর ওপর পুরোপুরি আস্থা রাখা যায়। করা যায় ওকে নিয়ে গৌরব বোধও।

হাম্মাদ দোয়াচ্ছলে বলল, খোদা যেন ও জীবিত থাকা অবস্থায়ই আমাকে ওখানে পৌছান। সময়মত পৌছুতে পারলে ওকে অতি অবশ্যই জিন্দা বের করে আনতে চেষ্টা করব।'

'ওই মেয়ে সত্যিই রহস্যপূর্ণ।' বললেন বিদ্যানাথ

'রহস্য? হাম্মাদের ভ্রু কুচকানো প্রশ্ন।

বিদ্যানাথ রহস্যপূর্ণ দৃষ্টিতে আইলাক খানের দিকে তাকালেন। সেই সাথে ফুটে ওঠল তার মুখে এক চিলতে হাসি। হাম্মাদকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, 'উমার সাথে হৃদ্যতা রয়েছে আইলাকের। আইলাকও মনে মনে ওকে চাইত। আমিও খুব দ্রুত ওদের বিবাহের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছিলাম। ইতোমধ্যে ঘটে গেল এক ভয়াবহ ট্রাজেডি।

হাম্মাদ রহস্যপূর্ণ হাসি হেসে আইলাককে লক্ষ্য করে বলল, চিন্তা করো না। আমরা ওকে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করতে যাচ্ছি। ফিরে এলে তোমার সাথে ওর বিবাহ দেব। সে এ হাবেলীতে বউ হিসাবেই প্রবেশ করবে।'

বিদ্যানাথ বললেন, 'আপনি কখন নগরকোট রওয়ানা হচ্ছেন? আমি খাবার তৈরি করছি।'

'ফজরের নামায পড়েই রওয়ানা করলে কেমন হয়। আমার সাথে স্রেফ আইলাক খানই যাবে। এসো দেরী হয়ে যাচ্ছে। নামায পড়ে নিই।' সকলে ওযু করল। বিদ্যানাথের ইমামতিতে সকলেই ফজরের নামায পড়ল।

প্রেমের সমাধি

বেশ ক'দিন সফর করার পর হাম্মাদ ও আইলাক খান নগরকোটের কেল্লারূপি মন্দিরের পাঁচ মাইল দুরে এসে দাঁড়াল। সূর্য তখন মাথার ওপরে। ওদের ঘোড়ার গতি শ্লথ। ওরা আঁধার রাতে মন্দিরের ওপর চড়াও হবার পরিকল্পনা করছিল। এ মোতাবেকই গিরিপথ ধরে আস্তে আস্তে এগুচ্ছিল।

সূর্যাস্তের সময় মন্দিরের উত্তর পার্শ্ব দিয়ে ওরা এগুল। মন্দিরের দক্ষিণ পাশ দিয়ে সুরমা নদী প্রবাহিত। উপকুল ঘেষা পাহাড়ের ওপর জমকালো মন্দিরটি দন্ডায়মান। এক সময় ওরা মন্দিরের পাদদেশে এসে দাঁড়াল। জমকালো আঁধারে ঢাকা পাহাড়ী প্রকৃতি। প্রকান্ড একটি গাছে ওরা ওদের ঘোড়া বাধল। উভয়েই এশার নামায আদায় করল। হাম্মাদ ওর পাঞ্জা বের করল। মজবুত একটা রশি বের করে উঁচু মন্দিরের দিকে ছুঁড়ে মারল। আইলাক খান বড্ড শখ ও কৌতুহলবশে এদৃশ্য দেখে যাচ্ছিল।

আইলাক খানের বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই হাম্মাদ ওর পাঞ্জা মন্দির লক্ষ্য করে শূন্যে ছুঁড়ে মারল। ওই আংগুলরূপি নখদার পাঞ্জা মন্দিরের দেয়ালে গেঁথে গেল। হাম্মাদ ওই পাঞ্জার গায়ে লাগানো রশিটেনে গেঁথে যাওয়া শক্তির আন্দায করল অতঃপর ওর ঘোড়ার কাছে এল। তূণ ভর্তি তীর কোমড়ে বাঁধল। ঢাল-তলোয়ার চাপাল কাঁধে। আইলাক খানও হাম্মাদের দেখাদেখি অস্ত্রে সজ্জিত হল এবং দ্বিতীয়বারের মত রশির কাছে এসে দাঁড়াল।

উভয় হাতে রশি পড়ে হাম্মাদ লাফ মারল। খানিক উঠে দু'পা দ্বারা রশি খামচে ধরল। আইলাক খানকে লক্ষ্য করে বলল, 'আইলাক খান! আমি যেভাবে বাদুড় ঝোলা হয়ে উপরে ওঠছি সেভাবে ওঠো তুমিও। খেয়াল রেখো, কোন প্রকার আওয়াজ যেন না হয়। কেননা আওয়াজ হলে আমাদের অভিযান ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। ওরা দ্রুত রশি বেয়ে মন্দিরের উপর উঠে যায়।

পাথুরে প্রান্তরে গিয়ে আটকে ছিল হাম্মাদের নিক্ষিপ্ত পাঞ্জা। হাম্মাদ এদিক ওদিক তাকিয়ে স্থানটি পর্যবেক্ষণ করে নিল। পরক্ষণে ওর চোখ দুটি ভাটার মত জ্বলে ওঠল। কারণ যে স্থানটিতে পাঞ্জাটি গাঁথা, এর পাশেই উঁচু একখানা পাথর পতিত। আইলাক কে ইশারায় ওখানে ডেকে নিল। ওই পাথরের ওপর পাঞ্জা গেঁথে ছিল। পাথর থেকে পাঞ্জাটি খুলে ওরা পুনরায় পাঞ্জাটি আরো উপরে ছুঁড়ে মারল। ওটি প্রকান্ড একটি পাথরে গেঁথে গেল। এবারেও ওরা বাদুড় ঝোলা হয়ে উপরে উঠে গেল। পাহাড়ের চূড়ায় উঠে হাম্মাদ রশি ও পাঞ্জা নীচে ছুঁড়ে দিল। পরে হাম্মাদ

আইলাক খানকে অনুচ্চস্বরে বলল 'আইলাক! আইলাক! আমরা মন্দিরের পেছন দিকটায় রয়েছি এক্ষনে। এখানে পাহারাদার থাকাটা অসম্ভব কিছু নয়। এখন আমরা যমীনে উবু হয়ে চলব।

মুহূর্তে উভয়ে উবু হয়ে চলা শুরু করল। আইলাক খান হাম্মাদকে লক্ষ্য করে বলল, 'আমীর সাহেব! আমি এই মন্দিরের প্রতিটা কোন সম্পর্কে পরিচিত। আপনার ধারণা যথার্থ। এ দিকটা পাহারাদার মুক্ত নয়। হামাগুড়ি দিয়ে আমি চলছি, আপনি আমার অনুসরণ করুন।'

হাম্মাদ একথায় একমত পোষণ করে বলল, 'তোমার ঢালটা পিঠে বেঁধে অগ্রসর হও, এতে যমিনে চলায় কোন শব্দ হবে না।'

হাম্মাদরা এগিয়ে চলছে। মন্দিরের পাষাণ প্রাচীরে এসে পৌছুলে হাম্মাদ আইলাক খানের পিঠে হাত রেখে বলল, থামো। থেমে যাও। দেখো উভয়দিক থেকেই সশস্ত্র পাহারাদাররা আসছে। তোমার মাথা নীচু কর। একেবারে যমীনে মিশে যাও। শ্বাস ছাড় অতি আস্তে।' হাম্মাদ ও আইলাক খান উভয়ে মাটিতে উবু হয়ে শুয়ে পড়ল। ওদের দৃষ্টি অবশ্য পাহারাদারদের ওপর নিবদ্ধ।

পাহারাদাররা দু'দলে ভাগ হয়ে গেল। ওরা দূরে চলে গেলে হাম্মাদ বললো, 'আইলাক! এই পাহারাদাররা মন্দিরের পেছনের দিক পাহারা দিতে যাচ্ছে, অচিরেই আবার ফিরে আসবে। মনে রেখ। ওরা ফিরে এলে তুমি বাদিক থেকে আগত পাহারাদারদের ওপর চড়াও হবে। লঘু পায়ে ওদের অনুসরণ করবে। প্রথমে দু'একজনকে ধরে মুখে কাপড় গুঁজে দেবে এরপর এক কোপে মাথা কেটে ফেলবে।'

আইলাক খান বললো, জী আচ্ছা আমীর সাহেব! আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আপনার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করব।

খানিক পরে উভয় পাহারাদার ফিরে এল এবং স্ব-স্ব স্থানে টহল দিতে লাগল। হাম্মাদ ওঁৎপাতা স্থানে ক্ষুধার্ত শাদুলের মত গো গো করতে লাগল। শিকারের আশায় লঘু পায়ে ওদের পেছনে ছুটে চলল। এক সময় পেছন থেকে ওরা পাহারাদারদ্বয়ের মুখ চেপে পিঠে খঞ্জর ঢুকিয়ে দেয়। ফিনকি দিয়ে ছোটে রক্ত। ওদের লাশ ওরা পেছনে টেনে এনে পরিস্থিতি অবলোকন করে। পাশেই একটা ঝাড় দেখে লাশ ফেলে রাখে। এবার ওদের গতব্য মন্দিরের অন্দর।

মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্ব থেকে ওরা পূর্বদিকে অগ্রসর হয়। এ পথেই মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। পূর্ব দরোজা দিয়ে হাম্মাদ মন্দিরের ভেতরে ঝুকে দেখল। অসংখ্য থাম দিয়ে তৈরি উঁচু পাহাড়ী এ মন্দির। এর মাঝ দিয়েই অন্দরে যাওয়ার রাস্তা। মন্দিরের পাষাণগাত্রে দপ দপ করে জ্বলছে মশাল। দু'পাহারাদার ওই পথে দিচ্ছে টহল। হাম্মাদ ও আইলাক পিলার আড়াল করে এগুতে লাগল। এক সময় চতুর্ভুজ একটা পিলারের পাশে ওঁৎপেতে থাকল। ওরা ওই থামের কাছে আসতেই দু'জনেই ঝাঁপিয়ে

পড়ে পেছন থেকে মুখ চেপে ধরল এবং টেনে হিচড়ে মন্দিরের বাইরে এনে ভবলীলা সাঙ্গ করল। লাশ দুটো ফেলে রাখল একান্ত এক পাথরের আড়ালে।

পুনরায় ওরা মন্দিরে প্রবেশ করল এবং পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। হাম্মাদ আইলাক খানকে বলল, 'আইলাক! ও কোথায় থাকতে পারে, তোমার এ ব্যাপারে কিছু মনে আসে কি?

আইলাক খামোশ থেকে বলল, 'ওকে দেব-দেবীদের বেদীমূলে কোরবানী না দিলে খাজাঞ্চীখানায় রাখা হতে পারে।

'খাজাঞ্চীখানা কোন দিকে? এখানে খাজাঞ্চীখানা একটি নয়—অনেক। ওখানে একবার অপরিচিত কেউ ঢুকলে পুনরায় বেরোতে পারে না। আমার যাদ্দুর ধারনা তাকে বোধহয় পুরোহিতজির হেরেমে রাখা হয়েছে। তুমি ওই হেরেম চিনতে পারবে তো!' জিজ্ঞাসা হাম্মাদের।

'হ্যাঁ আমীর! আমি ওটা চিনি। ইতোপূর্বে দেখেছি।' বলল আইলাক।

'তাহলে শোন! লঘুপায়ে ওই হেরেমের দিকে চল। আমি আছি তোমার পেছনে।' দেয়াল ঘেঁষে ওরা এগুতে লাগল। হেরেমের দরজা ভেজানো। ওদের গায়ে লেগে একটা কপাট খুলে গেল। আইলাক খান কানে কানে বলল,

'কুদরত আমাদের পুরোপুরি সঙ্গ দিচ্ছেন। নয়ত হেরেমের দরজা এভাবে খুলে থাকার কথা নয়। আসুন আপনি আমার পেছনে পেছনে।' উভয়ে দরোজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করল এবং পূর্ববৎ দরজা বন্ধ করে দিল। এবার ওরা যেখানে দাঁড়ান সেখানটা সিড়ির উপরিভাগ। ওখান থেকে নীচে নেমে গেছে সিড়ি। সিড়ির গায়ে দপদপ করে মশাল জ্বলছে। মশালের আলোতে সিড়ি পথ হয়ে ওঠছে আলোকোজ্জ্বল।

শিকারী বিড়ালের মত ওরা নীরবে এগুতে থাকে। গজ বিশেষ অতিক্রান্ত হবার পর মোটা কালো কার্পেটে ওদের পা পড়ল। পশ্চিম দিকে একটা পথ গেছে বলে অনুমিত হল। খানিক চলার পর দেখল বেশকিছু পথ করিডোর এদিক ওদিক চলে গিয়ে বিভিন্ন কামরায় গিয়ে মিশে গেছে।

এদিক ওদিক ঘুরে ওরা এবার একটি আলোকোজ্জ্বল কামরার সামনে এসে দাঁড়াল। কামরাটি রাজকীয়। কামরার মাঝে বিশাল একটি মূর্তি। মুর্তির পেছনে বিশালকায় একটি মশাল জ্বলছে। সামনে বৃহৎ একটি ঝাড়ে জ্বলছে অসংখ্য মোম। নানান সুগন্ধিতে কামরাটি করছে মৌ মৌ। হাম্মাদ ও আইলাক দেখল মূর্তির বেদীমূলে পুরোহিত প্রণাম করে আছে। সুন্দরী এক দেবদাসী মূর্তিকে সেবা করছে। পুরোহিত চোখ বুঝে করজোড় করে বসা। মনে হয় সেও এক পাষাণ মূর্তির রূপ নিয়েছে। মূর্তির চারপাশে মানুষের বলিদানের স্থান। ওই খানে উমা বন্দী অবস্থায় পড়ে আছে। আইলাক খান ইশারা করে বললো-আমীর হে! যে মেয়েটা বন্দী অবস্থায় দেখছেন ও-ই উমা।'

হাম্মাদ দেখল উঁচুকায় অতি মানবীয় সৌম্যকান্তির জনৈকা তরুণী শক্ত রশির দুশ্ছেদ্য বাঁধনে বন্দী। বন্দীনির চোখ বাঁধা। বোধহয় তাকে বেশ কিছুদিন ঘুমুতে দেয়নি।

হাম্মাদ ও আইলাক খান পরস্পরের মুখ চাওয়া চাউয়ি করল। চোখে চেয়েই ওরা পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। পরক্ষণে ওরা বীর বিক্রমে ঝাপিয়ে পড়ল। আইল্যাক দরাম করে বন্ধকরে দিল দরোজা। মন্দিরের দেবদাসী এদৃশ্য দেখে হতবাক। তার আপাদমস্তকে ভূ-কম্পন ওঠল। হাম্মাদ তলোয়ারের ডগা দেবদাসীর বুকের ওপর ধরে কড়াস্বরে বললো, চিৎকারের চেষ্টা করেছ কি মরেছ। তলোয়ারটা আমূল ঢুকিয়ে দেব।'

দেবদাসী কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সে মূর্ত্তির কাছে এসে বেতসপত্রের মত কাঁপতে লাগল। উমা চোখ খুলল। হেরেমে আইলাক খানকে দেখে সে চমকে ওঠল। ওর হতাশাঘন চেহারায় ফুটে উঠল তারকার দীপ্তি। একটু আগে যেখানে ওর বেঁচে থাকার আশা ছিল অকল্পনীয় এক্ষণে সেখানে বর্ণালী জীবনের হাতছানি।

সাধনা ও আরাধনার সাগরে আকণ্ঠ পুরোহিতও চোখ খুললেন। হাম্মাদ ও আইলাক খানের প্রতি তাকালেন তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে। তার চোখে মুখে বিস্ময়ের পাশাপাশি ফুটে ওঠল বিরক্তির ছাপ। বললেন, 'তোমরা? কেন এই পবিত্র স্থানে, কিসের আশায়?'

হাম্মাদ পুরোহিতের দিকে তাকিয়ে আইলাক খানকে কড়া ভাষায় নির্দেশ দিয়ে বলল, আইলাক খান! উমার বাধন খুলে দাও এবং ওই স্থানে দেবদাসীকে বেধে রাখ। আর হ্যাঁ দেবদাসীর মুখে এক টুকরা কাপড় গুঁজে দিতে ভুল করো না। আইলাক খান কম্পিত বদনে দেবদাসীকে ধরে উমার কাছে নিয়ে গেল এবং উমার বাধন কাটতে লাগল। পুরোহিতজি ভুত দেখার মত চমকে ওঠলেন। তার দেহমনে বিদ্যুৎ ঝলক খেলে গেল। তিনি পূর্বের চেয়েও জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, 'বলছি কী বোঝনি! তোমরা কারা? কেন এসেছ এই মহাপবিত্র মন্দিরে! তোমাদের তনুমনে দেখছি ক্লেদাক্ততার ছাপ। জেনেবুঝে কারো পক্ষে হুট করে এই মন্দিরে প্রবেশ করার কথা নয়।'

হাম্মাদ ক্ষুধার্ত শার্দুলের মত পুরোহিতের দিকে এগিয়ে গেল, যেভাবে শিকারের দিকে এগিয়ে যায় শিকারী। পুরোহিতজি ততক্ষণে দাঁড়িয়ে গেছেন। হাম্মাদ বলল, 'তোমাদের ননীর পুতুল প্রহরীরা আমাদেরকে এখানে প্রবেশ করতে বাধা দিতে পারেনি।'

এই প্রথম আইলাক খানের প্রতি তিনি মনোনিবেশ করলেন। তুচ্ছ জ্ঞান পূর্বক বললেন, 'ওহ্ হো! তুমিও এসেছ। আমাদের ধর্মের মুখে চুনকালী দিয়ে উমাকে এখান থেকে তুলে নিয়ে ছিলে। ও হ্যাঁ তোমার তো মথুরায় বন্দী থাকার কথা। ওখান থেকে মুক্তি পেলে করে, কিভাবে?'

হাম্মাদ পুরোহিতের চেহারায় ঠাস করে একটি চড় কষে দিল, বলল, 'মথুরার জিন্দানখানা থেকে এক মহৎ উদ্দেশ্যে ও বেরিয়ে এসেছে।'

পুরোহিত ক্ষোভে দুঃখে বলে ওঠেন, 'মহাশয়! মুখ সামলে কথা বল। নয়ত এই মন্দিরে এমন কষ্ট দেব যাতে বিনা দিয়াশলাইতেই কাঠে আগুন লেগে যাবে। তোমার এই সাথী দেবমন্দিরের দাসীর সাথে এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার করতে যাচ্ছে কেন? দেবদাসী দেবতাদের প্রিয় পাত্র। তাদের চরণ সেবার জন্যই সে পূজারিনী সেজেছে। ওর সাথে বেয়াদবী করলে দেবতা তোমায় ক্ষমা করবে না মুর্খ, উমা নামে যে দেবীর বাঁধন কাটছে ও, তাকে দেবতার উদ্দেশ্যে বলিদান করার সিদ্ধান্ত করেছি আমরা। এ ধরনের অপয়া মেয়ে নিয়ে তোমাদের কোন লাভ নেই। আমরা দেবতাদের খুশী করতে ওর রক্ত ঝরাব। তাহলেই কেবল দেশ ও জাতি দেবতাদের কোপানল থেকে বাঁচবে।

'আহাম্মক পুরোহিত শুনে নাও! তার আগেভাগেই তো আমি তোমার জন্য যমদূতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছি। আমার হাত থেকে তোমাকে বাঁচাতে পারে এমন কোন দেবতা থাকলে তাকে ডেকে দেখতে পার।' বলল হাম্মাদ।

'শোন মহাশয়! ধৈর্য্যধরে আমার কথা শোন। মনকে একাগ্র কর, আত্মা শুদ্ধ কর। এখান থেকে ভালোয় ভালোয় বেরিয়ে পড়। নয়ত এমন স্থানে পাঠাব যেখানে থাকলে এজনমের স্বাদ যাবে তেতো হয়ে।' বললেন পুরোহিত।

রহস্যপূর্ণ মন্দিরে হাম্মাদের ফের আওয়াজ শোনা গেল, 'হায় তুমি যদি মন্দিরের পুরোহিত না হয়ে নিম্নবর্ণের হিন্দু হতে! আমরা ধর্মপুরুষদের শ্রদ্ধা করি নয়ত এতক্ষনে তোমার মাথা যমীনে গড়াগড়ি খেত। আমার কিছু প্রশ্নের উত্তর দাও। সঠিক উত্তর দিতে গড়িমসি করলে তোমার মাথা কেটে নেব।

পুরোহিত ঘৃণামিশ্রিত কণ্ঠে বললেন, তুমি এখনও বালক। যা খুশী তাই করতে পার আমি তোমার কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজী নই। আর তোমার শক্তির সম্মুখে আমার শক্তিরও তেমন কোন বড়াই নেই।'

হাম্মাদ ওর তলোয়ার পুরোহিতের গর্দান ছুঁয়ে বলল, দেখতে চাই, তুমি আমার প্রশ্নের জবাব কি করে না দিয়ে পার।' পুরোহিতের আপদমস্তক ভয়ে কেঁপে ওঠল। রুদ্ধ হয়ে গেল তার কণ্ঠ। শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল জিহ্বা। বড্ড কষ্ট করে তিনি যবান খুললেন। কম্পিতকণ্ঠে বললেন, 'রাজন! আমি নগণ্য এক সেবক। আপনার যে কোন আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেব। তারপরও আমাকে কতল করবেন না মহারাজ!' 'ক্ষমা করুন মহারাজ! আমিও তো মানুষ। আমারও তো ভুল হতে পারে।

হাম্মাদ তলোয়ার নামিয়ে বলল, 'আমি যা কিছু জিজ্ঞাসা করব তার সঠিক জবাব দেবে। না হয় এই নির্জন কক্ষে তোমার মুণ্ডহীন দেহটা পড়ে থাকবে।

'বলুন মহারাজ! আপনি কি জানতে চান। আমি এক বর্ণও মিথ্যা বলব না।' পুরোহিতের চোখে চোখ রেখে হাম্মাদ জিজ্ঞাসা করল, গজনীর কোন শাসক হিন্দুস্থান হামলা করলে এখানকার রাজা-বাদশাহ্‌রা কী পরিমাণ সৈন্য সমাবেশ করতে পারে।

'৪০ হাজারের মত। মথুরা ও থানেশ্বর থেকে ১৫ হাজার। কাশ্মীর ও উত্তর সীমান্ত থেকে ২৫ হাজার। সর্বমোট ৮০ হাজারের মত সৈন্য।'

খামোশ হয়ে গেল হাম্মাদ। পরক্ষণে পুরোহিতের গলে তলোয়ার উঁচিয়ে বলল, সেই বধ্যভূমিতে চল যেখানে আমার কওমের এক বেটিকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলে। শোন পুরোহিত! তোমাকে ও এই দেবদাসীকে আমি ক্ষমা করে দিতাম কিন্তু তুমি আইলাক খানকে চিনে ফেলছো যে। এজন্য দু'জনকেই হত্যা করা জরুরী হয়ে পড়েছে। বধ্য ভূমির দিকে যেতে গিয়ে পুরোহিত রাম নাম জপ করতে থাকে।

হাম্মাদ তলোয়ার চালিয়ে পুরোহিতের মুণ্ডুপাত করে ফেলে। অপরদিকে আইলাক রশিতে বাধা দেবদাসীর বাধন খুলতে থাকে। মন্দিরের বাইরে তখন শুরু হয় শোরগোল। হাম্মাদ বলে, আইলাক! তুমি উমাকে নিয়ে আমার পেছনে এসো। খুব সম্ভব পুরোহিতের আওয়াজ মন্দিরের বাইরে পৌছে গেছে। ওরা অবশ্যই এখানে আসবে। উমাকে নিয়ে দ্রুত আমার পেছনে এসো।

হাম্মাদ দৌড়ে সিড়িপথের দিকে অগ্রসর হলো এবং দপদপে জলন্ত মশালগুলো নিভিয়ে দিল। সিড়ি ঘরে একটি থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে পরবর্তী পরিস্থিতির আশায় রইল ওঁৎপেতে। আইলাক ও উমা সিড়ি টপকে উপরে এল। ততক্ষণে সিড়ি ঘরে দেখা গেল চার সেপাইকে। হাম্মাদ, আইলাক ও উমা কোনক্রমে দেয়ালে পিঠ ঠেকে দাড়িয়ে রইল। কাজেই ওদেরকে কেউ দেখতে পেল না। ওরা সামনে অগ্রসর হতেই আইলাক খান পেছন থেকে হামলা করতে উদ্যত হলে হাম্মাদ ওকে বারণ করল।

চার প্রহরী সিড়ি টপকে অন্দর মহলের দিকে এগিয়ে যেতেই হাম্মাদ সিড়ি মুখের দরোজা খুলে বাইরে তাকাল। বাইরের পরিবেশ বিলকুল নিরব নিথর। কানে কানে ওদেরকে পিছনে আসতে বলল। সিড়িপথ থেকে বেরিয়ে বাইরে থেকে দরোজার ছিককিনি আটকে দিল। দক্ষিণ গেট লক্ষ্য করে অন্ধকারে ছুটলো ওরা। হাম্মাদ ওদের দুজনকে দ্রুত নীচে নেমে যেতে বলল। সাথে সাথে নিজেও নামতে লাগল।

আচমকা মন্দিরের পূর্বপাশ থেকে চিৎকার করে ওঠল জনৈক প্রহরী। 'ধর ধর' 'ওই যে পালাল'। নীচে নামার রশিটির কাছে এসে হাম্মাদ বলল, আইলাক খান তুমি উমাকে নিয়ে নীচে নেমে যাও। আমি আগুয়ান শত্রু সৈন্যের পথরোধ করার চেষ্টা করছি। আইলাক খান ভক্তিভরে বলল, 'আমীর হে! আমি আপনাকে একাকী দুশমনের মুখে রেখে যেতে পারি না। আপনার পাশে থেকে যুদ্ধ করে মরতে চাই।

হাম্মাদ কঠোর আওয়াজে বলল, 'আইলাক খান। এটা আমার হুকুম। তুমি উমাকে নিয়ে নীচে নামো। এখান থেকে যুৎসই কোন স্থানে আমার অপেক্ষা কর।

আইলাক খান প্রথমে উমাকে রশির সাহায্যে নীচে নামাল। পরক্ষণে নামল নিজেও।

আইলাক খান উমাকে বলল, 'উমা! উমা! তুমি আস্তেধীরে ওই খোলা প্রান্তরে গিয়ে দাঁড়াও। আমি এখানটায় আমীর সাহেবের অপেক্ষা করি। হামলাকারীদের সংখ্যা বেশী হলে আমি তার সাহায্যে উপরে যাব।'

উমা বললো, 'ইনি আবার কোন আমীর? এবং এসেছেন কোত্থেকে?

ভারতবর্ষের সকল গোয়েন্দার প্রধান। গজনী প্রশাসন তাকে প্রেরণ করেছেন। বাড়ী নিশাপুর। নাম হাম্মাদ বিন খালদূন। সময় নষ্ট করো না। জলদী নেমে যাও। ওখানে কোন মুসিবতে পড়লে দেখবে দুটি ঘোড়া বাঁধা আছে। যে কোন একটায় সওয়ার হয়ে তখন রওয়ানা হয়ে যাবে। বলল আইলাক।

এদিকে মন্দিরের প্রহরীরা হাম্মাদের উদ্দেশ্যে তীর বৃষ্টি শুরু করলে হাম্মাদ একটি পাথরের আড়ালে বসে গেল। সাঁ সাঁ করে ওর মাথার ওপর দিয়ে এক পশলা তীর ছুটে গেল। হাম্মাদ ওর তূনের কিছু তীর এবার এস্তেমাল করল। পাঁচ তীরন্দায চিৎকার দিয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ল। অপর দু'জন ওর দিকে তেড়ে আসতে চাইলে তারা ওর শিকারে পরিণত হল। প্রতিপক্ষ শক্তিধর মনে করে প্রহরীরা মন্দিরে লুকোলো।

নীচে বসে অইলাক খান দেখছিল, মন্দিরে প্রহরীরা ঢোকার সাথে সাথে পেছন থেকে ৫জন প্রহরী হাম্মাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আইলাক খান দ্রুত রশি বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে বলল, আমীর! পেছনে লক্ষ্য করুন!

হাম্মাদ দ্রুত তার ঢাল উঁচিয়ে হামলা প্রতিহত করতে ব্যপৃত হল। ততক্ষনে আইলাকও ওর সাহায্যে হামলাবাজদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়। ওরা যখন শত্রুদের একের পর এক কচুকাটা করতে থাকে তখন নারীকণ্ঠের বিকট চিৎকারে কেঁপে ওঠে ওদের মন। ওরা বুঝতে পারে এ কণ্ঠ উমার। দ্রুত নীচে নেমে দেখতে পায় উমা একটি পাথরের ওপর উপুর হয়ে পড়ে রয়েছে।

হাম্মাদ দ্রুত ওর কাছটিতে এগিয়ে যায়। শীরায় হাত দিয়ে দেখতে পায় উমা জীবিত তবে বেহুশ। আইলাককে লক্ষ্য করে বলে, 'আইলাক ওকে তোমার ঘোড়ার পিঠে চড়াও আমি রশিটা নিয়ে আসছি। দ্রুত এখান থেকে পলায়ন করতে হবে। যেতে হবে ওপারে। ওপার গিয়েই আমরা বিশ্রাম নেব।

হাম্মাদ রশি নামিয়ে পাক দিতে থাকে। আইলাক ততক্ষণে পাজাকোল করে উমাকে ঘোড়ার পিঠে চাপায়। নদীর কিনারে এসে ওর চোখে মুখে পানির ছিটে দিয়ে হুঁশ করতে চেষ্টা করে কিন্তু উমার হুঁশ ফেরে না। ক্ষীণশ্বাস তখনও ওর নাক মুখ দিয়ে বেরোয় অতিকষ্টে। উমাকে ভাল করে বসিয়ে হাম্মাদের এন্তেযার করতে থাকে।

খানিক বাদে হাম্মাদ এসে পৌঁছায়। ওর কাধে প্রকান্ড সেই রশি। হাম্মাদ বলে, 'তোমরা আমাকে অনুসরণ করে। পাহাড়ী এই নদী খুব একটা গভীর নয়। তিন/চারহাত পানি হতে পারে। তোমার ঘোড়া অতি সাবধানে নামাও।

ওপারে গিয়ে ওরা দক্ষিণ মুখো চলতে থাকে। দরিয়ার কিনার ধরে ওরা দ্রুত ছুটতে থাকে। আইলাক খান একহাতে ঘোড়ার লাগাম আরেক হাতে উমার নাড়ীর স্পন্দন দেখে। উমার নাড়ী সচল।

মাইল পাঁচেক চলার পর আইলাক চিৎকার দিয়ে বলে ওঠে, 'হাম্মাদ! হাম্মাদ!! থামুন! উমার নাড়ীর স্পন্দন নেই। হাম্মাদ চমকে ওঠে এবং নীচে নেমে পড়ে। আইলাক খানের ঘোড়া থেকে উমাকে যমীনে নামিয়ে শুইয়ে দেয়। উমার শারীরিক অবস্থা তখন হতাশাজনক : তার নাড়ীর স্পন্দন থেমে গেছে এবং আখেরী দম নিতে থাকে সে। আইলাক কে অকুল পাথারে ভাসিয়ে উমা এ জগতের সফর শেষ করে। আইলাক বলে, 'আমীর হে। ও মরে গেছে। ওর মরে যাওয়াই ভাল।' হাম্মাদ ওর নাড়ীতে হাত দিয়ে বলে ওঠে, ইন্না লিল্লাহে ওয়াইন্না ইলায়হে রাজেউন। আইলাকের চোখ পানিতে ভরপুর। হাম্মাদ দেয় সান্ত্বনা। উভয়ে মিলে কুড়াল দিয়ে টিলার উপর কবর খুদে উমাকে চির নিদ্রায় শায়িত করে। প্রেয়সীর সমাধীর দিকে এক নযর রেখে পরবর্তী মঞ্জিল উদ্দেশ্যে ছুটে চলে আইলাকের ঘোড়া। সেই সাথে চলে ঘোড়া হাম্মাদেরটাও।

অপ্রত্যাশিত

স্বরসতির উপকূল ধরে হাম্মাদ ও আইলাকের ঘোড়া ছুটে চলেছে। ভীমসেন থেকে মাইল পাঁচেক দূর থাকতে ঘোড়া তাজদম করতে খানিক যাত্রাবিরতি করল ওরা। নামাযের সময় হয়ে এলে নদীতে নামল উযু করতে। মাগরিবের নামায আদায় করে পুনরায় ঘোড়পৃষ্ঠে সওয়ার হোল। উভয়ের মুখ কালো। উমার অপ্রত্যাশিত মৃত্যুই এই হতাশার কারণ।

গাঢ় অন্ধকারে ওরা বিদ্যানাথের হাবেলীর সামনে এসে দাঁড়াল। তাঁর স্ত্রী সাবিত্রী ও কন্যা বিমলা ওদের অভ্যর্থনা জানাল। হাবেলীতে রত্না ও বিশ্বপালের দেখা নেই। হাম্মাদ ওদের কামরার উদ্দেশ্যে ছুটলে বিদ্যানাথ বললেন, ওদিকে নয় এদিকে আসুন।

'কেন?' প্রশ্ন হাম্মাদের।

'রত্না ও বিশ্বপাল এখানে নেই।' বললেন বিদ্যানাথ।

'কোথায় ওরা?' ওর প্রশ্ন।

'বলছি সবকিছু।' বিদ্যানাথের চোখেমুখে একরাশ হতাশা ও উদ্বিগ্নতার ছাপ। প্রশ্নের উত্তরে যাওয়ার আগেভাগে উল্টো হাম্মাদকেই প্রশ্ন করলেন, 'উমা কৈ?'

এ প্রশ্নের জবাবে হাম্মাদ নগরকোট মন্দির থেকে উমা উদ্ধারের কাহিনী বলে গেল। বিদ্যানাথ, সাবিত্রী ও বিমলা কাহিনী শুনে ভারাক্রান্ত হলো। জ্ঞান সিং এরপর ওদের ঘোড়া নিয়ে আস্তাবলে চলে গেল। বিদ্যানাথ ওদেরকে নিয়ে বিশ্বপালের কামরায় এলেন। বিদ্যানাথ বলতে লাগলো–

'রত্নাকে আজমীরের রাজা পৃথ্বিরাজ তার লোকজন দিয়ে তুলে নিয়ে গেছে।

'কবে? কিভাবে?' হাম্মাদ আর্ত চিৎকার করে ওঠে।

'তুমি এখান থেকে যাওয়ার কিছুদিন পরে বিশ্বপাল ইসমাইলকে নিয়ে পাড়াগায়ে যায়। ইত্যবসরে রত্না আমার ভাই লক্ষরাজের বাড়ীতে বেড়াতে যায়। আমার ওই ভাইয়ের বেটা অর্জুনের সাথে ওর বাগদান হয়েছিল। সে জানত পৃথ্বিরাজ রত্নার পিছু লেগে আছে, এজন্য সে রত্নার বাবা-মাকে হত্যা পর্যন্ত করেছিল। লক্ষরাজের বাড়ীতে যাবার দুদিনের মাথায়ই পৃথ্বিরাজ তার লোকজন দিয়ে ওকে তুলে নেয়। আমার ভাই ও বাড়ীর অন্যান্য লোকজন রাজসিপাহীদের বাধা দিলে ওরা সকলকেই মেরে ফেলে।

আমি বিশ্বপালকে ডেকে পাঠাই। পরদিন বিশ্বপাল এসে পৌছায়। বোনের অন্বেষায় সে পরদিন আজমীর রওয়ানা হয়। যাবার প্রাক্কালে বলে যায়, হয় রত্নাকে

ছাড়িয়ে আনব, না হয় ওর জন্য প্রাণ দেব। মুসলমানদের প্রতি ওর অগাধ টান লক্ষ্য করেছি। হাম্মাদ বললো, 'কোন রাখঢাক না রেখে আজ বলছি শুনুন বিশ্বপাল মুসলমান হয়ে গেছে।

বিদ্যানাথ অবাক বিস্ময়ে সাবিত্রী ও বিমলার দিকে তাকালেন। পরক্ষণে বললেন, আমি বেশকিছু লোক ইতিমধ্যে আজমীর প্রেরণ করেছিলাম। তারা এসে জানিয়েছে, মাস খানেকের মধ্যে রাজা পৃথ্বিরাজের মেয়ে কৃষ্ণার স্বয়ম্বরা হতে যাচ্ছে। মেয়ের স্বয়ম্বরার পর দিনই জাঁক জমকের সাথে রত্নার সাথে তার বিয়ে। ওরা আরও বলেছে, রত্না সাধারণ এক কয়েদীর বেশে অবস্থান করছে। বিশ্বপালের কোনো খোঁজ খবর পাওয়া যায়নি। আজমীর শরীফে সে আছে, নাকি অন্য কোথাও তাও বলতে পারেনি ওরা। ওরা আবারও আজমীর যাবে। রত্নার জন্য কিছু একটা করা যায় কি-না, এজন্যই ওদের যাওয়া।

হাম্মাদ চিন্তার অথৈ সাগরে ডুবে গেল। অবশেষে বলল, রত্নাও বিশ্বপালকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া যায় না। আমি আগামীকল্যই আইলাক খানকে সাথে নিয়ে আজমীর যাব। আমার চেষ্টা থাকবে স্বয়ম্বরার পূর্বে ওকে ছাড়িয়ে আনা। যদি এতে সফল না হই তাহলে ক্ষত্রীয়ের ছদ্মবেশে স্বয়ম্বরায় অংশগ্রহণ করব। স্বয়ম্বরা জিতে রাজকুমারী কৃষ্ণাকে বিয়ে করে হলেও রত্নাকে উদ্ধার করব।'

সাবিত্রী ও বিমলা বেরিয়ে গেল। বিদ্যানাথ হাম্মাদকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমরা ওখানে গিয়ে খুব সাবধান থাকবে। কারো সাথে লড়াই করলে কোমড়ে আঘাত করবে না। কেননা, ক্ষত্রীয়রা কারো কোমড়ে আঘাত করে না। এটা তাদের ধর্মে পাপ।'

আইলাক খান বললো, 'আপনি চিন্তা করবেন না। আমীর সাহেবকে আমি আমার পূর্ণ অভিজ্ঞতা দ্বারা সতর্ক ও চৌকস রাখব।'

আইলাক এতটুকু বলে খামোশ হয়ে গেল। সাবিত্রী ও বিমলা ততক্ষণে খানা নিয়ে হাজির। সকলে খানা খেতে গিয়ে পারিবারিক আলাপ হয়।

পরদিন হাম্মাদ ও আইলাক খান আজমীরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। বিদ্যানাথ উভয়ের জন্য যথোপযুক্ত পোষাকের আঞ্জাম দেন। হাম্মাদকে বিলকুল ক্ষত্রীয়ের মত দেখা যাচ্ছিল। ভীমসেন ছেড়ে ওরা হাসনাপুর এসে পৌঁছায়। একরাত তারা ওখানে থাকে পরে ওখান থেকে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ছুটতে থাকে। একে একে ওরা ভরতপুর, জয়পুর ও কৃষ্ণগড় হয়ে আজমীরে এসে পৌঁছায়। ঠিক সূর্যাস্তের সময় ওরা শহরের প্রধান ফটকে এসে দাঁড়ায়। ভেতরে না ঢুকে উপশহরে সরাইখানায় পৃথক কক্ষ ভাড়া নেয় এবং রত্নাকে উদ্ধারের নানামুখি জাল বুনতে থাকে।

রাজপ্রাসাদ চত্বরে বিশাল তাবু, খিমা ও শামিয়ানার নীচে বসেছে রাজকুমারী কৃষ্ণার স্বয়ম্বরা অনুষ্ঠান। চত্বরের ঠিক সামনে খালি রাখা হয়েছে ক্ষত্রীয়দের

লড়াইয়ের প্রতিযোগীতার জন্য। এক পার্শ্বে রাজা মশাইয়ের সোনালী হাওদার হাতি মাহুতেরা সকলে হস্তিপৃষ্ঠে মাথা ঝুঁকে উপবিষ্ট। রাজকুমারীর স্বয়ম্বরায় উপস্থিত হয়েছে হাজারো দর্শক, শতশত প্রতিযোগী। ক্ষত্রীয় যুবকের ছদ্মবেশে হাম্মাদও ওই যুবকের মিছিলে শামিল, আইবাক খান পাঞ্জা হাতে ওর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে।

খানিক বাদে রাজা পৃথ্বিরাজ রাজমহল থেকে বেরিয়ে সোনালী হাতির রথে চাপলেন। রথটি নজরকাড়া শামিয়ানার নীচে এসে থেমে গেল। ওখানে তার বসার রাজকীয় ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে। শামিয়ানার উপরে মিনার আকৃতির কাপড় টাঙানো। মঞ্চের সম্মুখে বৃত্তাকার স্থান নির্ধারণ করেছে রাজ বেয়ারারা। ওখানেই স্বয়ম্বরা অনুষ্ঠিত হবে।

রথ থেকে প্রথমে নামলেন রাজা পৃথ্বিরাজ এরপরে রাজকুমারী কৃষ্ণা। পরনে তার চোখ ঝলসানো ঘাগড়া, চেহারায় স্বর্গীয় অপরূপার দ্যুতি। শেষ পর্যায়ে রত্না এভাবে রথ থেকে নামল যেন তাকে নামতে বাধ্য করা হয়েছে। রত্নার পরনেও দামী লেহেঙ্গা। ওর চেহারায় নিষ্পাপ ফুলের আবীরতা ও ঔদাসীন্যের ছাপ।

রাজকুমারী কৃষ্ণা ও রত্নাকে নিয়ে রাজা মহাশয় নির্ধারিত তিনটি আসনে উপবেশন করলেন। এখানে বসেই তাকে স্বয়ম্বরা বিচার করতে হবে। কৃষ্ণার হাতে রকমারী ফুলের একগাছি মালা।

স্বয়ম্বরায় উপস্থিত দর্শকদের ঠাসা ভীড়। এতক্ষণ রত্না স্বয়ম্বরা স্টেজে দাঁড়িয়ে ছিল, রাজার নির্দেশে তাকে বাম পাশে বসিয়ে দেয়া হল। রত্নার অনিন্দ্য সুন্দর রূপ-যৌবনের সামনে রাজকুমারীর রূপ ম্লান হয়ে গেল।

হাম্মাদ রত্নার নিকটেই দাঁড়িয়ে ছিল। রত্না দেখে ফেলে কি-না এভয়ে নেকাবে চেহারা ঢেকে ফেলল। হাতের ইশারায় রাজা পৃথ্বিরাজ স্বয়ম্বরা শুরু করার নির্দেশ দেন। স্বয়ম্বরা প্রতিযোগীতায় যোগদান কারী ক্ষত্রীয়রা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো। এদেরকে দু'দলে ভাগ করা হল। স্বয়ম্বরার নিয়ম ছিল, গোলাকার চত্বরে বসে সকলে বিশেষ একটি মিনারকে লক্ষ্য করে পাঁচটি তীর ছুঁড়বে। যার তীর টার্গেটে আঘাত হানবে সে বিজয়ী হবে। এক সময় পালা এল হাম্মাদের। ও রত্নার পাশ দিয়েই অতিবাহিত হল কিন্তু রত্না টের পেল না। কেননা হাম্মাদ এক্ষণে চটের পোশাক পরিহিত নয়। হাম্মাদের সম্মুখে রাজপ্রহরীরা ৫টি তীর রাখল। হাম্মাদকে মাত্র একটি তীর ওঠাতে দেখে রাজা বিস্ময়ে বললেন, তীর মারতে হবে পাঁচটা, তুমি একটা ছুঁড়তে উদ্যোগী কেন?'

হাম্মাদের মাথা নীচু। ওই অবস্থায়ই ও বলল, মহারাজ! যদি আমার বিদ্যা, যুদ্ধ ও সাধনা কসরতের একটা সফল হয় তাহলে আমি অন্য বাকী চারটি দিয়ে কী করব। এতক্ষণ যারা তীর মারল তারা তো একটাই কাজে লাগাতে পারেনি।'

'তোমাকে তো বীর-বাহাদুর মনে হচ্ছে। তা চেহারা নেকাবে ঢেকেছ কেন। চেহারা থেকে নেকাব খুলে ফেল দেখি।'

'মহারাজ! আমি শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে কসম করে বলেছি স্বয়ম্বরা না জেতা পর্যন্ত নেকাব মুখ থেকে অপসারণ করব না। স্বয়ম্বরায় হেরে গেলে নেকাব ঢাকা অবস্থায়ই মগর কোট ফিরে যাব। আমার কওম খোলা আকাশের নীচে আমার অপেক্ষা করছে।'

পৃথ্বিরাজ খামোশ হয়ে গেলেন। হাম্মাদ এই খামোশির সুযোগ নিয়ে সামনে অগ্রসর হোল। যে ধনুক হাম্মাদকে দেয়া হলো তাকে কাবু করে তীর ছোঁড়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। হাম্মাদ তীর ছুঁড়ল। তীর তার টার্গেটে গেঁথে গেল। লোকেরা সোৎসাহে তালি বাজাতে লাগল। হাম্মাদের পর আরো পাঁচ জন তীর নিক্ষেপে সফল হল। এবার এই পাঁচজন ও হাম্মাদের সাথে নেযাবাজির খেলা। পৃথ্বিরাজের এক হাত রত্না আরেক হাত কৃষ্ণার মুঠোয়।

হাম্মাদের মোকাবেলায় পাঁচ ক্ষত্রীয় জোয়ান দাঁড়িয়ে গেল। নেযাবাযীর ময়দানে একপাশে একটি বাঘ খাচায় বন্দী। হাম্মাদ নেযাবাজীর লড়াইয়ে চার জনকেই মৃত্যুর দুয়ারে উপনীত করল। বাকী একজন লজ্জায় মাথা ঝুকিয়ে রনে ভঙ্গ দিল।

হাম্মাদের জয়ে সকলে উল্লাসিত। সকলেই হরিবোল দিতে লাগল। হরিবোলের পুলকে আইলাকও হল পুলকিত। তালি বাজিয়ে সেও উল্লাস প্রকাশ করল।

পৃথ্বিরাজ দাঁড়িয়ে সোৎসাহে বললেন, 'হে ক্ষত্রীয়! তুমি বলবান ও মহাশক্তির অধিকারী। তোমার ভাগ্য সত্যিই সুপ্রসন্ন। তুমিই স্বয়ম্বরা বিজয়ী। এখন থেকে তুমি আমার মেয়ের জামাই। এবার তোমার চেহারা থেকে নেকাব হটাও।দেখতে চাই আমার কন্যার পতির চেহারা ছুরত কেমন।

হাম্মাদের গর্দান ঝুকে গেল। কতকটা বাধ্য হয়েই সে চেহারা থেকে নেকাব সড়িয়ে দিল। হাম্মাদের চেহারার প্রতি তাকিয়ে পৃথ্বিরাজ বেজায় খুশী হলেন। এ যেন তার মেয়ের কল্পনার রাজকুমার। তিনি বললেন, যুবরাজ! তোমার বাবার নাম বল, যাতে আমার আত্মীয়ের নাম নিয়ে গৌরববোধ করতে পারি।

আচমকা কারো কথায় পৃথ্বিরাজকে চমকে ওঠতে হল। কেননা তার প্রেয়সী রত্না ক্রুদ্ধফনীনির ন্যায় ফুঁসে উঠে বলতে শুরু করেছে, এ এক প্রতারণা মাত্র! রাজকুমারী কৃষ্ণার স্বয়ম্বরায় কেবল ক্ষত্রীয়দের অংশগ্রহণ করার কথা। ও না ক্ষত্রীয়, না আর্য। হিন্দুধর্মের সাথে ওর সাথে ন্যূন্যতম সম্পর্ক নেই। ও এক মুসলমান, নাম হাম্মাদ বিন খালদূন, বাড়ী নিশাপুর। হিন্দুস্তানে এসেছে ব্যবসায়ী উদ্দেশ্যে।

রত্নার অপ্রত্যাশিত কথায় গোটা স্বয়ম্বরায় পীন পতন নিস্তব্দতা নেমে এল। মনে হল সুন্দর একটি সাজানো বাগান এক ঝড়ো হাওয়া দুমড়ে মুচড়ে দিল। কৃষ্ণার চেহারায় নেমে এল রাজ্যের অন্ধকার। তবে দ্রুতই সে নিজকে স্বাভাবিক করে নেয় এবং চেহারায় মুচকি হাসির রেখা ফুটে ওঠাতে কোশেশ করে। পৃথ্বিরাজ রীতিমত স্তম্ভিত, ক্ষুব্ধ। না জানি কী ভেবে তিনি মঞ্চ থেকে নেমে এলেন।

তিনি যখন সিঁড়ি থেকে নেমে এলেন তখন ভীড়ের মধ্যে থেকে বিশ্বপাল বেরিয়ে এল এবং দ্রুত মঞ্চে উঠে গেল। ওকে দেখে রত্না উঠে দাঁড়াল। খুশী উৎফুল্লচিত্তে বলল, 'এস দাদা! বিশ্বপাল নিকটে গেল। মাহুতরা রত্নার 'দাদা' ডাক শুনে ভাই মনে করে ওকে বারণ করল না।

নিকটে যেতেই বিশ্বপালের হাত কাজ শুরু করে দেয়। সে রত্নাকে এলোপাতাড়ী মারতে শুরু করে। মারতে মারতে বলে, 'তুই আমার বোন নস্। আমার মা তোকে কোলে নেননি। নিলে আজ তোর আমার মহাপোকারীকে সকল লোকের সামনে এভাবে অপমান করতিস না। পাপীনি! তোকে বাঁচাতেই তো সে এই স্বয়ম্বরার অংশ নিয়েছিল। স্বয়ম্বরা জিতে রাজার নৈকট্যে যেয়ে তোকে উদ্ধার করাই ছিল ওর অভিপ্রায়। ওর সাথে আমার দেখা হয়েছে। আর তুই কি করলি!'

বিশ্বপাল রত্নাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে চড় থাপপড় দিয়ে যায়। আর রত্নাও তকলীফে উহ্ আহ করতে থাকে। পৃথ্বিরাজ দূর থেকে এ দৃশ্য দেখে সহ্য করতে না পেরে উপরে ওঠে এলেন। নীচ থেকেই দেহরক্ষীদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা হা করে দেখছ কি। রাজ মহলের নারীর সাথে এই বেয়াদবী যে করে চলেছে তাকে শেষ করে দাও। তিনি যেমন তেমন নারী নন পৃথ্বিরাজের বাগদত্তা।

দেহরক্ষীরা একযোগে বিশ্বপালের ওপর তলোয়ার দ্বারা হামলা চালাল। রত্না কেঁদে চলেছে এবং পাহারাদার থেকে ওকে বাঁচাতে চেষ্টা করছে। কিন্তু বারনের পূর্বেই যে আঘাতে আঘাতে বিশ্বপাল অসাড় হয়ে পড়েছে।

বিশ্বপালের মাথা কোলে তুলে নিয়ে ফোঁপানো কাঁদার সুরে বলল, দাদা! দাদা!' পৃথ্বিরাজ বিস্ময়ে হতবাক। বিশ্বপাল চোখ খুলল। মৃত্যুর তীরে দাঁড়িয়ে ও বলল, হায় তুমি যদি আমার বোন না হতে। হাম্মাদ আমাদের দুজনেরই মহাপোকারী। তুমি তাকে অপদস্ত করেছ। তিনি একটা মন্দির ও তীর্থস্থান। তুমি এই মন্দিরের দেবদাসী হলে ভাল হত। তিনি সাক্ষাৎ দেবদূত। হায় তুমি যদি তার পুজারিণী হতে। আমি হাম্মাদের সাথে তোমাকে বিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। তাকে ভালবাসতে না পারলে ঘৃণা করারও অধিকার নেই তোমার।

বিশ্বপাল তার আখেরী দম নিচ্ছিল। রত্না বলল, দাদা! আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি মানুষ আমার ভুল হওয়া স্বাভাবিক। তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী দাদা।

'আহ্! জানিনা হাম্মাদের ভাগ্যে কী আছে। ও জীবিত থাকলে ক্ষমা চেয়ে নিও। ও তোমাকে মাফ করে দিলে আমার আশরীরী আত্মা শান্তি পাবে। বলল বিশ্বপাল।

রত্না ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'দাদা! আমি আপনার কাছে দোহাই করে বলছি আমি ওর কাছে মাফ চেয়ে নেব। আপনার আত্মাকে আর তকলীফ দেব না। তার সাথে এভাবে মিলিত হব এবং প্রেম নিবেদন করব যাতে ও ওর জীবনের সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলে যায়। দাদা আমি ওকে এখান থেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করব।

দাদা তুমি না চেয়েছিলে আমাকে ওর সাথে বিয়ে দেবে। ভগবান সাক্ষী আমি ওকে পতি হিসাবে ঘোষণা করছি। সুতরাং তুমি শান্ত হও, কথা বল দাদা। আজ থেকে অর্জুনের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। ওর সাথে আমার বাগদানের সব সম্পর্ক ছিন্ন করছি।'

বিশ্বপালের থেকে কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে রত্না ওর বাহু ধরে ঝাকা দিতে থাকে। কিন্তু বিশ্বপাল ততক্ষনে এ জগতের সফর শেষ করে ফেলেছে। ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে রত্না। পৃথ্বিরাজ দেহরক্ষীদের দিকে ইশারা করেন। ওদের ক'জনা বিশ্বপালের লাশ তুলে নেয়। রত্না ওদের সাথে যেতে চায় কিন্তু রাজসৈনিকরা ওকে ওখানেই জোরপূর্বক বসিয়ে দেয়। রত্না নিজকে অসহায় ভাবে। কেঁদে যায় ভাইহারা শোকে। ও বুঝে ওঠতে পারে না, কি থেকে কি হয়ে গেল, কেন হলো?

দুই.

কুয়া আকৃতির মৃত্যুভূমিতে নামলেন রাজা পৃথ্বিরাজ। তার পেছনে উঁচু নাঙ্গা তলোয়ার ধারী সেপাই। সিড়ির একেবারে নীচে না নেমে মাঝপথে নেমে গেলেন তিনি। হাম্মাদের দিকে অগ্নি দৃষ্টি দিয়ে বললেন, রত্না তোমার প্রতি যে অপবাদ দিল তা কি সত্য! তুমি ক্ষত্রীয় না হয়ে সত্যিই কি মুসলমান?'

ঝুকানো গর্দান উঁচিয়ে হাম্মাদ বীরত্ব মুখে বলল, 'রাজন হে! মিথ্যা বলব না। ওই মেয়ের কথা সত্য। হিন্দু নই আমি মুসলমান। আর আমি ধর্মের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিনি। এ স্বয়ম্বরায় স্রেফ এজন্য... হাম্মাদের কথার মাঝখানে পৃথ্বিরাজ ষাড়ের মত ক্ষেপে ওঠলেন, স্তব্দ হও নরাধম। আমাদের ধর্মের অপমানের জন্য এটুকু যথেষ্ট যে, মুসলমান হয়েও তুমি এই স্বয়ম্বরায় যোগ দিয়েছ।'

তিনি এবার চার বীর হিন্দুর দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করে বললেন, তোমরা ওর দিকে হা করে তাকিয়ে কী দেখছ, ওকে খতম করে দাও।

রত্নার ক্রন্দন থেমে গেছে। বড্ড করুনার দৃষ্টিতে হাম্মাদের দিকে তাকায়। চার জোয়ান কোষহীন তলোয়ার নিয়ে ওর দিকে আগাচ্ছে। আইলাক খান খোলা ময়দানের একপাশে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখে শিউরে ওঠে, কিন্তু এ মুহূর্তে ও তেমন কোন আক্রমনে যাবার ইচ্ছা ত্যাগ করে, তবে প্রয়োজন পড়লে ও যে থেমে থাকবে না তা মনোভাব দ্বারা বোঝা যায়। হাম্মাদ নিজকে সামলে নেয়। ক্ষত্রীয়ের ছদ্মবেশ ত্যাগ করে দুরে ছুঁড়ে দেয়। ওর গায়ের বর্ম বেরিয়ে চক চক করে। বর্মের ভেতর থেকে ওর চটের পোষাক দেখা যায়। এ দৃশ্য রত্নার কাছে নতুন নয়। ভয়ে ও দু'চোখ বন্ধ করে। পূজারীনির মত দু'হাত জোর করে ও বলে, 'হে ভগবান! এবারেও যেন হাম্মাদের জয় হয়।'

রত্না চোখ খোলে। চার হিন্দু বীর হাম্মাদকে ঘিরে ফেলেছে। ওদেরই একজন হাম্মাদকে লক্ষ্য করে বলে, জানি তুমি বলবান, শক্তিশালী। আমরা কেউই তোমার সাথে লড়াই করতে চাইনা। আগেভাগেই পরাজয় স্বীকার করে নিলে ল্যাঠা চুকে যায়।'

পরাজয় স্বীকারে লাভ কী! তোমাদের রাজা তো আমার মৃত্যুকামী। এ বধ্যভূমিতে আমি কাপুরুষের মত মরতে চাইনা। কেউ না কেউ নিশাপুরে আমার বৃদ্ধ বাবার কাছে এ খবর পৌঁছাবে যে, তোমার গুনধর পুত্র আজমীরে মারা গেছে। বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করলে তিনি আমার প্রতি থুথু নিক্ষেপ করবেন। আর যদি তিনি শোনেন আমি লড়ে মারা গেছি তাহলে গৌরববোধ করবেন।

'তোমার মরার শখ যদি এতই প্রবল হয়ে থাকে তাহলে তৈরি হয়ে নাও। দেখি তোমার মৃত্যু খবর কে নিশাপুর পৌছায়।' বলল ওদেরই একজন।

'এসো তোমরা চারজনই একসাথে হামলা কর। যতক্ষণ আমার বাহুতে শক্তি আছে দেহে রক্ত সঞ্চালন থাকছে ততক্ষণ লড়ে যাব। তোমরা কচুকাটা হয়ে চারজনই মরতে যাচ্ছ বলে আমার বিশ্বাস।' তলোয়ার উঁচিয়ে বলল হাম্মাদ।

ওরা চারজনই হামলা চালাল। মাটিতে শুয়ে প্রথম হামলা কোনক্রমে সামাল দিল হাম্মাদ। পরের বারের আক্রমন শোয়া অবস্থায়ই ঢাল দ্বারা প্রতিহত করল। এবার ওর ভেতরের পৌরুষটা জেগে ওঠল। কাঁচা ঘুম ভাঙ্গা ক্ষুধার্ত বাঘের মত ওদের ওপর সিংহ বিক্রমে ঝাপিয়ে পড়ল। ওর পয়লা আক্রমনের ধকল সামলাতে না পেরে প্রথম দু'জনার পা কেটে গেল। গগণ বিদারী চিৎকারে ময়দান ওঠল কেঁপে। বাদবাকী দু'জন ইতোমধ্যে নিজেদের সামলে নিল। আচমকা প্রতিপক্ষের একটি কোপ হাম্মাদের বাহুতে লাগল। এই কোপ দিয়ে হাম্মাদের শরীর থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হলো। রক্তে ভিজে গেল ওর চটের পোষাক। এতদসত্ত্বেও হাম্মাদ দমল না।

হাম্মাদকে মারাত্মক যখমী দেখে রত্নার প্রাণটা ছ্যাৎ করে ওঠল। আইলাক খান এ সময় কিছু একটা করা দরকার মনে করল কিন্তু তার আগে ভাগেই প্রতিপক্ষ ওকে ঘিরে হামলার পর হামলা চালাল। হাম্মাদ এবার শুরু করল মরণ কামড়। ওর কামড়ে একজনের ভবলীলা সাঙ্গ হল। শেষোক্ত জনও বেশীক্ষণ যুৎ করতে পারল না। হাম্মাদের এক আঘাত ওর সীনা এফোড় ওফোড় করে দিল।

রত্না ও আইলাক খানের চেহারা খুশীতে ডগমগ করে ওঠল। পৃথ্বিরাজ ক্ষোভে আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। উঁচু আসন থেকে নিচে নেমে এলেন তিনি। ব্যবস্থাপকদের বললেন ক্ষুধার্ত বাঘ ছেড়ে দিতে। আরো বললেন, দেখি ব্যাটা এবার বাঁচে কী করে।

রত্নার চিন্তাজগৎ কেবল হাম্মাদকে আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধারে ঘিরে থাকল। ওর পাশে কৃষ্ণা। এক সময় কৃষ্ণাকে লক্ষ্য করে ও বলল, 'রাজকুমারী! তুমি কিছু একটা কর। ভগবানের দিকে চেয়ে ওকে বাঁচাও।' কৃষ্ণাও চুপচাপ পরিস্থিতি অবলোকন

করে চলেছে। রত্না আবারও বলল, রাজকুমারী! এ জোয়ান সৌন্দর্যের পিরামিড এবং শক্তিশালী ও তোমার স্বয়ম্বরা বিজেতা। এমনকি তোমার বাবা ওকে তোমার পতি বলে ডেকে ফেলেছেন। কী! তোমার পতিকে এভাবে মরতে দেখতে চাও।'

রাগে ক্ষোভে রত্না অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠল। কারণ এবার আর হাম্মাদের রেহাই নেই। ময়দানের ব্যবস্থাপকেরা খাঁচা থেকে ক্ষুধার্ত বাঘ ছেড়ে দিয়েছে। খাঁচা থেকে বেরিয়ে বাঘ হুংকার মেরে উঠল। এ হুংকার শিকারকে বাগে পাওয়ার। গোগ্রাসে গিলে খাবার।

ক্ষুধার্ত বাঘের চোখ দুটি ভাটার মত জ্বলে ওঠল। হাম্মাদ কোনক্রমে ময়দানের মাঝে উঠে দাঁড়াল। ঢালটি তাক করে নিল বাঘের দিকে। ওর রক্তাক্ত তলোয়ার পরবর্তী পরিস্থিতির জন্য তৈরি। রত্না বেচারীর শাসরুদ্ধ। ওর নিস্পাপ চেহারায় মৃত্যুর নিস্তব্ধতা।

বাঘ যেই মুহূর্তে হাম্মাদের ওপর ঝাপিয়ে পড়তে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে আইলাক এর লৌহ টেটা বাঘের উদ্দেশ্যে ছুটে গেল। ওই টেটা বাঘের পাঁজরে গেঁথে গেল। যখমী বাঘ উম্মাদ হয়ে পড়ল। মুহূর্তে সে হাম্মাদকে যমীনে আছড়ে ফেলল। হাম্মাদ হয়ে পড়ল অসহায়, বিলকুল মৃত্যুর মুখোমুখি। কামড় বসাতে যাবে বাঘ কিন্তু হাম্মাদ ওর মুখ গহবরে ঢাল ঢুকিয়ে দিল। এতে বাঘ আরো ক্ষেপে গেল। বাঘ পরবর্তী কাজ করার পূর্বেই তলোয়ার নিয়ে আইলাক খান ময়দানে নামল। বাঘের দৃষ্টি এবার আইলাক খানের দিকে। হাম্মাদকে ছেড়ে তাই সে এবার আইলাককে পেয়ে বসল। একলাফে হুংকার মেরে আইলাকের বুকে কামড় বসায় ক্ষুধার্ত বাঘ। যখমী হাম্মাদ কোনক্রমে যমীনে থেকে উঠে বাঘের কোমড় বরাবর কোপ বসাল। সেই কোপে বাঘ গেল দুখন্ড হয়ে। ময়দানে শোনা গেল বাঘের গগণ বিদারী আর্তনাদ। আগে বেড়ে আইলাকের নাড়ীর স্পন্দন পরীক্ষা করল হাম্মাদ। ওর মুখ থেকে শুধুমাত্র ইন্না লিল্লাহি বেরুল। কারণ বাঘের কামড় ওর প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। মনের অজান্তে বেচারা আইলাকের জন্য ওর দুচোখে বড় দুফোটা অশ্রু দেখা দিল। নিজের জীবন বাজী রেখে আমীরকে বাঁচিয়ে রাখল আইলাক।

বাঘের করুণ মৃত্যু ও শত্রুর জীবিত দৃশ্য পৃথ্বিরাজের গালে চপেটাঘাত স্বরূপ। রাগে দুঃখে তিনি মাথার চুল ছিড়ছেন। এবার তিনি রাজসেপাইদের তিনজনকে বললেন, ওকে শেষ করে দাও। নইলে কারো রক্ষা নেই। কৃষ্ণা এবার আর নিজকে সংবরণ করতে পারল না। বলল অনেক হয়েছে বাপুজী! আর নয়। ওকে ছেড়ে দাও। রাজ সেপাইরা মুখ চাওয়া চাউয়ী করল। রাজকুমারী বলল, আমি ওকে দেখব। তোমরা কেউ ওর মোকাবেলায় নামবে না।

মেয়ের প্রতি দুর্বল পৃথ্বিরাজ বললেন, এ কি করলে মা। এই বিধর্মীকে এভাবে ছেড়ে দেয়া ঠিক হল কি? ওর কারণে আমার কতগুলো লোক মারা পড়েছে। কত

প্রিয় বাঘটির প্রাণ খোয়া গেছে। তোমার স্বয়ম্বরাকে মাটি করে দিয়েছে। এর পরও তুমি ওকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছ যে।

কৃষ্ণা বলল, 'বিধর্মীটার সাজার ক্ষান্ত আছে কী। ওর সাজা আমি নিজহাতে দেব বাবা। ধুঁকে ধুঁকে মারব ওকে। বেটা টের পাবে তখন হিন্দু ধর্মের কোন আচার-অনুষ্ঠানের সাথে বেয়াদবীর পরিণাম। বাবা আপনি নিশ্চিত থাকুন ওকে এমন সাজা দেব যাতে ও বুঝবে না যে, মৃত আছে না জীবিত।'

পৃথ্বিরাজের চেহারায় মুচকি হাসি দেখা দিল। তিনি কিছু বলতে যাবেন এই মুহূর্তে দিক চক্রাবলে সেনাপতিকে দেখা গেল। সেনাপতির উদাশ চেহারা দেখে পৃথ্বিরাজ ভড়কে গেলেন। সেনাপতি কোন প্রকার ভূমিকা ছাড়াই বললেন, মহাবিপদ মহারাজ।

'কি বললে সেনাপতি! মহাবিপদ। কি সে মহাবিপদ!' পৃথ্বিরাজের কণ্ঠে উৎকণ্ঠার সুর।

'মহারাজ! গজনীর সুলতান শেহাবুদ্দীন ঘুরী হিন্দুস্থানে হামলা করেছেন। তুফানের মত তার বাহিনী সর্বত্র ধেয়ে আসছে। তার টার্গেট হাসনাপুর। এইমাত্র গোয়েন্দা মারফত খবর পেয়ে আপনার কাছে ছুটে এলাম।'

'তুমি এখনই আমাদের বাহিনীকে অগ্রাভিযানে পাঠাও। আমি আসছি। আমিই নেতৃত্ব দেব আসন্ন যুদ্ধে। সেনাপতি চলে গেলে পৃথ্বিরাজ কৃষ্ণাকে লক্ষ্য করে বললেন, বেটি। আমার অবর্তমানে দেশ পরিচালনার দায়িত্বভার তোমার। আমি ফিরে আসার আগ পর্যন্তএই মুসলিম হাম্মাদকে জিন্দা রেখ। যে সাজাই তুমি ওকে দিতে চাও আমার উপস্থিতিতেই দিও যাতে আমি তা দেখে পরিতৃপ্ত হতে পারি। আর শোন রত্নার দিকেও খেয়াল রেখ। আমি ফিরে আসার আগ পর্যন্ত ওকে বন্দী রেখ। দেখ কেউ যেন ওকে তুলে নিয়ে যেতে না পারে।

কৃষ্ণা দাঁড়িয়ে গেল। পৃথ্বিরাজের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বলল, আপনি কোন চিন্তা করবেন না বাবা। সব কাজ আপনার মর্জিমাফিকই হবে।'

পৃথ্বিরাজ তেজকদমে বেরিয়ে গেলেন। তিনি দিগন্তে হারিয়ে গেলে কৃষ্ণা রত্নাকে বলল, 'জানি তুমি এখন থেকে আমার বন্দী। তথাপিও হাম্মাদ ও তুমি একই কামরায় থাকবে যাতে ওর দেখভাল সেবাযত্ন করতে পার। কৃষ্ণা মুচকি হেসে বলল, মনে করো না আমি তোমাদের দুশমন। তোমরা যা চাইবে, পাইবে।

কৃষ্ণা হাম্মাদকে মাঠের বাইরে নিয়ে যেতে নির্দেশ দিল। সকলে ওকে নিয়ে চলল রাজমহলের উদ্দেশ্যে। উপস্থিত জনতা যে যার বাড়ী অভিমুখী হলো।

মুক্তি

গভীর রাত।

পৃথ্বিরাজ সসৈন্যে আজমীর ত্যাগ করেছেন।

রত্না ও হাম্মাদকে কারাগারে না রেখে রাজকুমারী কৃষ্ণা রাজমহলের একটি কামরায় থাকতে দিল। কামরার এক কোনে খালি চৌকিতে হাম্মাদ অসহায়ের মত পড়ে আছে। রাজবৈদ্য ওর যখমে পট্টি বেধে দিয়েছেন। যখমের ব্যাথায় ও ব্যাথাতুর। ওর বিছানার পাশে অনুতপ্ত মাথা নীচু করে রত্না বসা।

কি মনে করে রত্না এক সময় হাম্মাদের আরো কাছে এগিয়ে যায়। আস্তে প্রণাম করে ওর পায়ে। এক সময় ফোঁপানো কাঁদার আওয়াজ গুঞ্জরিত হয়। বলে, 'আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই। আমার প্রতি দয়া কর। দয়াই পরম ধর্ম। আমি যা করেছি তা ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ছাড়া আর কী। তুমি আমার দেবতা আর আমি তোমার পুজারীনি। তুমি ক্ষমা করলেই কেবল আমার সর্গীয় দাদার আত্মা তৃপ্ত হবে এবং আমার তনুমন শান্ত হবে।

হাম্মাদ এমনিতেই ওর ওপর চটে আছে। এর ওপর ওর এই মায়াকান্না ওকে আরো উত্তপ্ত করে তোলে। দ্রুত তাই ওর পা দু'খানী সড়িয়ে ফেলে। বলে, 'তুমি আমার পা ছুঁয়ো না। আমার সম্মুখ হতে দূর হয়ে যাও। আমি তোমাকে ঘৃণা করি। শুধুই ঘৃণা।

রত্না এসব কথায় তেমন একটা কান দেয় না। কারণ এটা ওর পাওনা। ও বলে যায়, 'যে রত্না তোমাকে ঘৃণা করত মারা গেছে সে। তুমি আমার প্রেমের মন্দির। তোমার জন্য আমার সংসার ধর্ম সবই ত্যাগ করতে পারি। তুমি ক্ষমা করলে আমার আত্মা অমর হবে। আমি হব সৌভাগ্যবতী, জীবনের প্রকৃত রহস্য পাব খুঁজে। তুমি ধর্মের প্রতীক। এটাই এ মুহূর্তের প্রাণের আকুতি। আমৃত্যু তোমার নাম মনে গেঁথে রাখব।

কামরায় মৃত্যুর নিস্তব্দতা। পাথরের মত নিস্তব্দ রত্না। হাম্মাদের নিরস কথায় ভগ্নোৎসাহ না হয়ে এক বুক আশা নিয়ে ও বলে যায়, 'আমাকে নিরাশ করো না, যদিও আমি নিজকে নির্দোষ বলে দাবী করতে পারছি না। দেবতারা সর্বদাই পুজারিণীকে ক্ষমা করে থাকেন। আমার প্রতি বিশ্বাস ও ভরসা করতে পার। তোমার চরণে ঠাঁই দাও। তুমি যাই কিছু বলো না কেন, ভেবে দেখো এই মুহূর্তে তুমি ছাড়া কে আছে আমার।'

হাম্মাদ এসব কথার কোন জবাব দেয় না। আস্তে আস্তে ও উঠে বসে। পিপাসার কণ্ঠতালু শুষ্ক। পানি চায় ও। রত্না দ্রুত মটকার দিকে এগিয়ে যায়। পেয়ালা ভর্তি পানি এনে ওর মুখে তুলে ধরে। রত্নার আপাদমস্তকের দিকে তাকায় হাম্মাদ। বেশ কিছু পানি পান করলেও পুরোটা সাবাড় করা ওর পক্ষে সম্ভব হয় না। অবশিষ্ট পানি ফেলে দিতে বললে রত্না তা না ফেলে পান করে। বলে, তোমার উচ্ছিষ্ট পানিটুকু আমার জীবনের পরম সম্বল। জীবনে এমন তৃপ্ত আর হয়েছি কিনা জানি না।

হাম্মাদ আস্তে শুয়ে পড়ে। এবং গভীর চিন্তায় ডুবে যায়। রত্না বলল, 'তুমি কোন চিন্তায় ডুবে গেলে?'

'সে নিয়ে তোমার ভাবনা কী?' প্রশ্ন হাম্মাদের। 'বলছিনা তোমাকে ঘৃণা করি? আমি এক কথা দু'বার বলার মানুষ নই। তোমার রাঙা ঠোঁটের গরল আমার হাহাকারে ডুকরে কেঁদে ওঠা মনে আগুন জ্বেলে দিচ্ছে। তুমি একটু থামো, আমাকে শান্তিতে ঘুমুতে দাও। না জানি ওরা আমাকে কবে মুক্তি দেবে, নাকি আদৌ দেবে না। মরার পূর্বে আমি তোমার পূঁতিগন্ধময় প্রাণের আর্তি আর লাবণ্যময় চেহারার কালশিটে দাগের সম্মুখে মাথা নোয়াতে চাই না। শোন! মন দিয়ে আমার কথা শোন! আমার প্রতিটি নিঃশ্বাস তোমাকে ঘৃণা করে।' বলে হাম্মাদ শুয়ে পড়ল এবং ঘুমাতে চেষ্টা করে।

রত্নার মুখ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। শুষ্ক মরুর মত ওর জীবনটা এ মুহূর্তে। হাম্মাদের শেষোক্ত কথাগুলো ওর হৃদয়কে চৌচির করে দিয়েছে। হাম্মাদ ঘুমিয়ে গেছে। ওর নিদ্রালু চোখ দেখে চলেছে ভবিষ্যতের সুখ স্বপ্ন। কিন্তু তারপরও কোথায় একটা বাধা একটা দ্বিধা যেন ওকে কুড়ে কুড়ে খায়।

দুই.

কারো কড়া নাড়ার শব্দে রাত্রীর নিস্তব্দতায় ছেদ পড়ে। চমকে ওঠে রত্না। আবারো আলতো টোকা পড়ে দরোজায়। রত্না দ্রুত দরোজার কাছে এগিয়ে যায়। দরোজায় মুখ লাগিয়ে ও জিজ্ঞাসা করে, 'কে?'

'রত্না! রত্না!! দরোজা খোল!' রত্না বুঝতে পারল একণ্ঠ কৃষ্ণার। তারপরও নিজের ও হাম্মাদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে বলল, 'তুমি কে?'

'কৃষ্ণা। দরোজা খোল এতেই তোমাদের কল্যাণ।' বললো আগন্তুক।

দরোজা খুলে দিল রত্না। ভেতরে ঢুকেই দরোজার ছিটকিনি লাগাল কৃষ্ণা। হাম্মাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওকি ঘুমুচ্ছে? শোন রত্না! আমি তোমাদেরকে পলায়নের বন্দোবস্ত করেছি। তবে আমার খাতিরে তুমি ওর দিকে খেয়াল রাখবে। কেননা ও যখমী। দেখ রত্না। স্বয়ম্বরা জিতে ও আমার দেহের অধিকারী হয়েছে। আমি ওকে আমার স্বামীত্বে বরণ করেছি, সেই সাথে দেবত্বেও। ও আমার জীবন-মরণের সাথী। ও সুস্থ হয়ে ওঠলে অমি ওকে ডেকে নেব। বলবে ও এক মুসলমান।

আমার বাবা না ওকে আমার পতি বলে ডেকেছেন এবং এতে বিয়ে সম্পন্ন হয়ে গেছে। এর পর আমার জানার দরকার নেই ওর কোন পরিচিতির। তুমি ওকে এখান থেকে নগরকোটে নিয়ে যাবে। ওখান থেকেই আমি ওকে ডেকে পাঠাব। আমার হাম্মাদকে তোমার কাছে আমানত রাখলাম। এক্ষেত্রে ওকে জাগিয়ে বাইরে নিয়ে এসো। আমি বাইরে দাঁড়াচ্ছি। সফরের যাবতীয় ব্যবস্থাদি করেই তবে এসেছি আমি।'

কৃষ্ণা বেরিয়ে গেল। রত্না হাম্মাদের দিকে করল মনোনিবেশ। কৃষ্ণার কথায় রত্নার মনে শুরু হোল হাতুড়ীপেটা। কী করে বরদাশত করবে ওর হাম্মাদের মধ্যে ভাগ বসিয়েছে আর এক নারী। সেও যেন তেন নয় খোদ রাজকুমারী কৃষ্ণা। কৃষ্ণার কথা যেন ওর কানে কতখানি গরম সীসা ঢেলে দিয়েছে। যেন ওর গলা চিপে দিয়েছে, আশার গুড়ে বালি ছিটিয়ে দিয়েছে। হাহাকারে ডুকরে কেঁদে ওঠে ও। শত হতাশার মাঝেও একবুক আশা নিয়ে ও আনমনে উচ্চারণ করে, 'না! কখনও হতে পারে না। ও আমার জীবন। সেই শুরু থেকেই ওর প্রতি ঘৃণা পোষণ না করলে এতদিনে হয়ত ও আমার হয়ে যেত। পরে চোয়াল দুটি শক্ত করে বলে, 'ও আমার। শুধুই আমার। কেউই ওকে আমার থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

নিজকে সংযত করে নেয় রত্না। কম্পিত পায়ে এগিয়ে যায় হাম্মাদের খাটে। মাথায় হাত রেখে বলে, 'হাম্মাদ! হাম্মাদ! ওঠো।

হাম্মাদ ধড়ফড়িয়ে উঠল। রত্নার দিকে তাকিয়ে ও হতবাক হয়ে যায়। ঝরাপাতার মত ওর দেহবল্লব। 'কি হোল! আমাকে এ গভীর রাতে জাগালে কেন? আমার মৃত্যু পরওয়ানা এসে গেছে বুঝি।' ওর চেহারায় কেমন একটা ভীতি। 'কি হোল! রাজা পৃথ্বিরাজের সাথে মিলে নতুন আবার কোন ষড়যন্ত্র শুরু করলে! আমি পৃথ্বি এবং তোমার মত পৌত্তলিকদের এ বাড়াবাড়ি হতে দেব না। তোমাদের বিলাসিতার দিন শেষ হতে চলেছে। যাও এ কামরা থেকে বেরিয়ে যাও। আমাকে মৃত্যুপ্রহর গুনতে দাও। হাম্মাদ পুনরায় বিছানায় শুয়ে পড়ল।

রত্না হাম্মাদের পা ছুঁয়ে বলল, 'ভগবানের দিব্যি। আমি ধোঁকা দিচ্ছি না। তোমার জীবনের জন্য আমার উৎকণ্ঠা। নিজের জীবনের চেয়ে তোমাকে নিয়ে চিন্তা বেশী আমার। ওঠো! শুয়ে থাকলে আমাদের উভয়েরই বিপদ। ওঠলে উভয়েরই জন্য ভাল।' হাম্মাদ উঠে বসল। বলল, 'এটা কোন ধোকা হলে তোমার গর্দান কেটে দেব।

রত্না মুচকি হেসে বলল, 'উঠে বাইরে চল। প্রতারণার গন্ধ পাওয়া মাত্রই গর্দান কেটে দিও। হাম্মাদ উঠে দাঁড়াল। দু'জনেই কামরা থেকে বেরুল। দরোজার ওপাশে কৃষ্ণা দণ্ডায়মান। হাম্মাদকে দেখে ও লজ্জায় কুকড়ে গেল। ওর শিরা-উপশিরায় যৌবনের তরঙ্গ খেলে গেল। ওদেরকে চমকে দিয়ে বলল, 'এসো আমার সাথে হাম্মাদ। রত্না ওর পেছনে চলল। উভয়কে নিয়ে কৃষ্ণা আস্তাবলে এল। ওখানে হাম্মাদ নিজের ঘোড়া দেখতে পেল। দেখতে পেল ওর সব অস্ত্রপাতি ঠিকঠাক আছে।

হাম্মাদ হয়রান হয়ে বলল, 'আমার ঘোড়া তো ময়দানে ছিল, তা এখানে এল কি করে! ঘোড়া একটা নয় আরো একটা আছে। ওই ঘোড়ায় আইলাকের জিন লাগানো।'

হাম্মাদ কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় কৃষ্ণা বলল, 'তোমরা দু'জনই এখান থেকে পালাও। বড্ড কষ্ট করে তোমাদেরকে পালাবার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। হাম্মাদ নীচু আওয়াজে বলল, রাজা মশাই জেগে গেলে আমাদের পরিণতি কী হবে?

'তিনি সসৈন্যে হাসনাপুর গেছেন। কেননা গজনীর সুলতান মুহাম্মদ ঘুরী হিন্দুস্থানে হামলা করেছেন।'

'সত্যিই কি সুলতান ভারতবর্ষে হামলা করে বসেছেন? প্রশ্ন হাম্মাদের। হাম্মাদ এর চেয়ে বেশী কিছু জানতে চাইল না। এবং তৎক্ষণাৎ ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল। রত্না চাপল আইলাকের ঘোড়ার পিঠে।

হাম্মাদ কৃষ্ণাকে লক্ষ্য করে বলল, 'আপনি আমার জন্য যা করলেন তার কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা নেই। আরেকটু কষ্ট আপনাকে দিতে চাই। স্বয়ম্বরা অনুষ্ঠানে নিজের জীবন বিপন্ন করে যে মানুষটি আমার জীবন বাঁচিয়েছে সেই আইলাক খানের লাশটি মেহেরবানী করে দাফন করে দেবেন।'

'সে চিন্তা আপনাকে না করলেও চলবে। তাকে ইসলামসম্মতভাবে আমি দাফন করেছি ইতোমধ্যেই। কৃতজ্ঞচিত্তে কৃষ্ণার প্রতি এক নজর ফেলে আস্তাবল থেকে বেরিয়ে পড়ল হাম্মাদ। বেরিয়ে পড়ল রত্নাও। এক সময় রাজমহল থেকে বেরিয়ে এল ওরা। যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ ওদের দিকে তাকিয়ে মহলে প্রবেশ করল কৃষ্ণা।

তিন.

তিনদিনের পথ দুদিনেই পেরিয়ে হাম্মাদ ও রত্না বিদ্যানাথের হাবেলীর সামনে এসে দাঁড়াল। হাম্মাদ দরোজার কড়া নাড়ল। জ্ঞান সিং দরোজা খুলে দিল। ওরা যখন ভেতর আঙিনায় প্রবেশ করেছে তখন সিঁড়ির মুখে বিদ্যানাথ, সাবিত্রী ও বিমলাকে দেখা গেল। ব্রিদ্যানাথ জ্ঞানকে ডেকে বললেন, 'জ্ঞান! জ্ঞান! কে এসেছে?'

জ্ঞান বলল, 'হাম্মাদ ও রত্না।'

হাম্মাদের গলায় জড়িয়ে ধরে বললেন বিদ্যানাথ,'আমি জানতাম খালি হাতে ফিরবে না তুমি। আইলাক ও বিশ্বপাল কোথায়?

হাম্মাদ বাক রুদ্ধকণ্ঠে বললো, 'ওরা দু'জন আজমীরে চিরদিনের তরে শুয়ে গেছে।'

বিদ্যানাথের মাথা নীচু হয়ে গেল শোকে।

তিনি ভারী কণ্ঠে বললেন, 'কি করে ওরা মারা গেল হাম্মাদ?'

'সে এক হৃদয় বিদারক ঘটনা। চলুন জ্ঞানের কামরায় গিয়ে বলব। হাম্মাদ জ্ঞানের কামরার কথা বলতেই রত্না উদ্বিগ্নকণ্ঠে বললো, 'না না মামুজান! ওকে জ্ঞানের কামরায় যেতে দিবেন না। হাবেলীতেই নিয়ে চলুন। ও মারাত্মক যখমী। ওর সেবা শুশ্রূষা করা দরকার।

আগে বেড়ে হাম্মাদের হাত চেপে ধরে বিদ্যানাথ বললেন, হাম্মাদ! সত্যিই কী তুমি মারাত্মক যখমী?

'হ্যাঁ! আমার কাঁধে মারাত্মক যখম।'

'রত্না বেটি! হাম্মাদ হাবেলীতে থাকলে তোমার দিক থেকে কোন আপত্তি নেই তো।

'না মামু! আমিই তো প্রস্তাব দিলাম হাবেলীতে থাকতে। আমিই সেবা-শুশ্রূষা করব ওর।' রত্নার এই পরিবর্তনে বিমলা ও সাবিত্রী রীতিমত অবাক।

জ্ঞান ওদের ঘোড়া দুটি আস্তাবলে বাঁধল। আর ওদিকে হাম্মাদকে নিয়ে হাবেলীর পথ ধরলেন বিদ্যানাথ। বিশ্বপালের কামরার দিকে যেতে গিয়ে বললেন, 'এসো! তোমার জামা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। তিনি নিজ বেটির দিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'বিমলা! বিমলা!! আমার এক জোড়া কাপড় নিয়ে এসো মা। ওর পোষাক পাল্টাতে হবে। যখমে বাধতে হবে পট্টি।'

'তুমি যেও না বোন। আমার থলের মধ্যে কাপড় আছে। আমি নিয়ে আসছি।' বিমলাকে বাপের পোষাক আনতে নিষেধপূর্বক বলল হাম্মাদ।

রত্না বলল, হ্যাঁ বিমলা! হাম্মাদ নয় তুমিই ওর স্থলে আস্তাবলে রক্ষিত থলে থেকে পোষাক নিয়ে এসো।'

বিমলা পোশাক আনল। অতি যত্নে বিদ্যানাথ হাম্মাদের পোষাক বদলে দিলেন। এরপর আজমীরের পুরো ঘটনা সকলের কাছে সবিস্তারে শুনিয়ে দেয় হাম্মাদ। ইতমধ্যে ফজরের আজান হয়ে যায়। হাম্মাদ নামায পড়ার জন্য জ্ঞানের কামরায় যেতে চাইলে বিদ্যানাথ বললেন, এখানেই পড়ে নাও।'

হাম্মাদ বলল, 'না।' জ্ঞানের কামরায় নামায পড়ার যাবতীয় ব্যবস্থা রয়েছে।' বলে ও বেরিয়ে গেল। জ্ঞান নিল ওর পিছু। পিছু নিলেন বিদ্যানাথও।

বিদ্যানাথ ও হাম্মাদ বিশ্বপালের কামরা থেকে বেরিয়ে গেলে সাবিত্রী বললেন, তোমরা দুবোন বসে আলাপ কর। আমি খাবার তৈরি করি।

রত্না বলল, 'না মামী। আপনি বিশ্রাম করুন। আমি ও বিমলা মিলে রান্না বান্নার কাজটা শেষ করি। সাবিত্রী বিশ্রাম কক্ষে গেলেন। ওরা গেল রান্না ঘরে।

উঠানে এসে হাম্মাদকে লক্ষ্য করে বিদ্যানাথ বলেন, 'নতুন কোন সংবাদ শুনেছ কী?

'আপনার কথার মতলব সুলতান শেহাবুদ্দীন ঘুরীর আরেক আক্রমণ কী।'

'হ্যাঁ। তোমার অনুমান যথার্থ। লাহোর সীমান্ত অতিক্রম করে আমাদের বাহিনী তুফান বেগে ছুটে আসছে।'

'আহ! আমি যদি এ মুহূর্তে যখমী না হতাম। যদি এ যুদ্ধে শরীক হতে পারতাম। কি দুভার্গ্য আমার।'

চার.

রত্না ও বিমলা যখন রান্না ঘরে কাজ করছিল তখন ওর প্রতি গভীর নযরে তাকিয়ে বিমলা বললো, 'রত্না! তুমি না হাম্মাদ ভাইকে যারপরনাই ঘৃণা করতে। ম্লেচ্ছ মনে করতে। এক্ষণে দেখছি তুমি তাকে হাবেলীতে ডাকছ। এর পরে বলছ, ওর সেবা তুমি নিজেই করবে। তাহলে কী মনে করব তোমার মাঝে পরিবর্তনের দোলা লেগেছে? তুমি হাম্মাদের মাঝে লীন হতে চলেছ বুঝি।'

রত্না তীর্যক দৃষ্টি ফেলে বাইরে বেরুল। বলল, 'আমি আসছি।'

বিমলা ওর অপেক্ষা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে রত্না তিনজোড়া চটের পোষাক নিয়ে এল। দুজোড়া অপরিষ্কার, এক জোড়া রক্তাক্ত।

বিমলা অবাক হয়ে বলল, 'একি! কী এনেছ?'

'ওর কাপড়।' রত্না বলে।

'ও আবার কে?' বিমলার দুষ্টুমিভরা প্রশ্ন। 'নাম নিতে লজ্জা করে বুঝি।'

'হাম্মাদের। ওর ছাড়া আর হবে কার।'

'কী করবে শুনি?'

'এই বলছি।' বলে সব কাপড় একত্রিত করে আগুন লাগিয়ে দিল। বিমলা চকিতে প্রশ্ন করল। এ তুমি কী করলে! হাম্মাদ ভাই রাগ করবেন তো।'

'রাগ করবেন না ছাই করবেন তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আজ থেকে সে চটের পোষাক পরতে পারবে না। আজই ওর জন্য ছ/সাত জোড়া নয়া পোষাকের বন্দোবস্ত করব।'

'তুমি এই পোষাক পেলে কোথায়?'

আগুন লাগাতে গিয়ে বলল, 'এক জোড়া ও কামরায় ফেলে গিয়েছিল, আর দুজোড়া ওর থলে থেকে এনেছি।'

এই পরিবর্তনের হেতু কী! হাম্মাদের প্রেমে পড়েছ কী! তবে হাম্মাদের কোন আকর্ষণ নেই তোমার প্রতি— সে কথাও মনে রেখ হ্যাঁ।'

'বিমলা! হাম্মাদের মত সুন্দর সুপুরুষের সাথে নিজের ভবিষ্যৎ জুড়ে দেওয়া ভাগ্যবানদের কাজ বৈকি!'

'কিন্তু তোমার সাথে তিনি যদি তার ভবিষ্যৎ জুড়তে না চান তাহলে?'

রত্না এ প্রশ্নে ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়। অকস্মাৎ নিজকে সংযত করে বলে,

'বিমলা! ও আমার আত্মার ডাক। স্বপ্নের রাজকুমার। ও বিনে জীবন-মৃত্যু বৃথা। ওকে ইতিপূর্বে যত ঘৃণা করেছি তর চেয়ে হাজার গুন বেশী ভালবাসি এখন। আমাদের সংসারে আসার পর থেকেই ওকে একটু আধটু যে ভালবাসিনি তাও কিন্তু নয়।

বিমলা! আজ থেকে ও আমার সাধনার ধন। ও আমার পতি। এ ভেবেই ওকে দেখে চলেছি। দেখবও। ওকে করায়ত্তে আনার সম্ভব সবকিছু করব। ওর কাছে হিরে, জহরত, মণি-মাণিক্য কিছু চাই না। চাই শুধু ও একবার বলুক, রত্না আমি তোমাকে ভালবাসি।'

'হাম্মাদ তোমাকে ঘৃণা শুরু করলে তখন কী করবে?'

'বিমলা! আমার মন বলছে, ও এটা পারবে না, কিছুতেই না। ও এমনটা করলে নিজ হাতে চিতা জ্বেলে ঝাপ দিয়ে মরব। ওর বিরহ আমার জন্য অসহ্য।'

শেষের দিকের কথাগুলো বলতে গিয়ে রত্নার দুচোখে পানি নামল।'

বিমলা বলল, তুমি চিন্তা করো না রত্না! তোমার মনোবাঞ্ছা বাবাকে জানাব। তিনি হাম্মাদ ভাইকে বুঝিয়ে দেবেন। এখন চলো খানা তৈরি করি। দেরী হয়ে গেল। রত্না এসে বিমলার পাশে বসে গেল। উভয়ে মিলে নাশতা তৈরিতে লেগে গেল।

পাঁচ.

আধার কেটে আলোর রেখা ফুটে ওঠল। প্রকৃতি থেকে সড়ে গেল জমকালো পর্দা। বিদ্যানাথ ও জ্ঞান হাবেলীতে ফিরে এলেন। তিনি বৈদ্য ডেকে আনলেন। বৈদ্য ওর যখমে পট্টি বেধে চলে গেলেন। বিদ্যানাথ ওর পাশে বসে আলাপে মশগুল হলেন।

রত্না দু'একবার উকিঝুকি মেরে চলে যায়, কিন্তু মামুকে পাশে দেখে ঢোকার সাহস পায় না। অতএব বাধ্য হয়ে ঢুকে যায় রান্না ঘরে।

আচমকা কী মনে করে রত্নার ওষ্ঠে মুচকি হাসি খেলে যায়। মুষল ধার বৃষ্টির পর প্রকৃতি স্বাভাবিক হবার মত ওর মনের অবস্থা। তাড়াতাড়ি সোনা-রুপার বাসনে নাশতা উঠায়। বিমলাকে লক্ষ্য করে বলে, 'বিমলা! আমি ওর নাশতা নিয়ে যাচ্ছি।'

বিমলা কিছু না বলে কেবল রত্নার ভাবসাব দেখে মুচকি হাসে।

নাশতা নিয়ে রত্না হাম্মাদের কামরায় প্রবেশ করল। ওকে দেখে শরীর উচিয়ে হাম্মাদ উঠে বসল। কাছে এসে ও বলল, 'নিন! নাশতা।'

হাম্মাদ অবাক হয়ে ওর আপদমস্তক নিরীক্ষণ পূর্বক ভারাক্রান্ত স্বরে বলল, 'দামী এ পাত্র নিয়ে যাও রত্না! তোমার দৃষ্টিতে আমি তো নীচ ও ম্লেচ্ছ মাত্র! তোমার এই পাত্র নাপাক হয়ে যাবে আমি ছুঁইলে। আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহ জন্মালে আগের সেই পাত্রে নাশতা দাও।'

'রত্না চকিতে জবাব দেয়, 'মরে গেছে সেই রত্না, যে উগ্রহিন্দু ছিল। এপাত্র তোমার শ্রেষ্ঠত্বের সামনে পায়ের ধুলোর মূল্য পরিমাণও নয়। এক নারীর কোমল হৃদয়ের প্রতি যদি আঘাত হানতে না চাও তাহলে এ পাত্রে নাশতা গ্রহণ কর। এক ভায়ের বিদ্রোহী আত্মাকে শান্তির পরশ বুলাতে যদি কুণ্ঠাবোধ না কর তাহলে পাত্রে হাত রাখো। আমার জন্য না হলেও কমপক্ষে স্বর্গীয় বিশ্বপালের দিকে তাকিয়ে এ কৃপাটুকু কর।' শেষের দিকে কথাগুলো বলতে গিয়ে রত্নার কণ্ঠ ধরে এল।

হাম্মাদ নিশ্চুপ! আক্ষেপের নযরে রত্নার দিকে তাকিয়ে নাশতায় লেগে গেল। রত্নার খুশীর অন্ত নেই। চোখ ঝিকিমিকি করে ওঠল ওর। বড্ড তৃপ্তি ও বিজয়ীনির দৃষ্টিতে হাম্মাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এক সময় মেঝেতে বসে পড়ল। হাম্মাদ লঘু আওয়াজে বলল, চাটাইতে কেন, খাটে বসো। আমার ধর্ম মানবতাকে মূল্যায়ন করে অচ্ছুৎ অস্পৃশ্যতাকে ঘৃণা করে।'

রত্না ওপাশের খাটে উঠে বসল। দেবতার সামনে পুজারিনীর বসে থাকার মত মাথা নীচু করে বসে রইল ও।

ছয়.

দু'দিন পর।

এশার নামাযান্তে জ্ঞানের কামরা থেকে বেরিয়ে হাবেলীর হেরেমে প্রবেশ করে হাম্মাদ দেখল রত্না বসে আছে। ওর চেহারায় উদ্বিগ্নতার ছাপ। কারো অপেক্ষায় যেন প্রহর গুনছে। হাম্মাদকে দেখামাত্রই রত্না উঠে দাঁড়াল। সহাস্য বদনে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, 'আসুন! আসুন! অগ্রসর হল হাম্মাদ। পালংকে বসে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, তুমি এখানে কি করছিলে?

'আপনার অপেক্ষায় প্রহর গুনছি। মামুজানের থেকে এজাযত নিয়েছি রাতেআপনার সেবা করব বলে।' এক্ষণে তুমি বলার স্থলে ও আপনি সম্বোধন করল।

'আমি পক্ষাঘাতগ্রস্ত নই যে, তোমাকে আমার সেবা করতে হবে। দেখছ না দিব্যি আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। এই মাত্র জ্ঞানের কামরা থেকে এশার নামায পড়ে বের হয়েছি। সুতরাং আমার সেবার দরকার পড়লে আমি না হয় কাউকে ডেকে নেব।'

হাম্মাদের পায়ে পড়ে রত্না বলল, 'আমি আপনার কাছে মিনতি করে বলি, আমাকে ক্ষমা করে দিন। মা-বাবা আমার শৈশবেই মরেছে। এই সংসারে ছিল একমাত্র ভাই। আমার কারণে সেও মারা গেল। এক্ষণে আপনি ছাড়া আমার কেইবা আছে।

হাম্মাদ পা ছাড়াতে চাইলে আরো মজবুতভাবে ধরে বলল, 'আপনি আমার কাছে নীল আকাশের মত পবিত্র, সাধু-সজ্জনের মত মহান। আপনার পদধুলি আমার কাছে মেশ্‌কের ন্যায়। আমার বিগত ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করে ধন্য করুন। ক্ষমা করতে না পারলে জানব আপনি পাষাণ এবং দেখবেন আমি আত্মহত্যা করে বসে রয়েছি।'

হাম্মাদ দেখল রত্না ক্রমশঃই অস্বাভাবিক হয়ে ওঠছে। ওর পায়ে গরম অশ্রুফোটা পড়ছে। ও যেন কেমন নিজকে হারিয়ে ফেলছে। বিগত দিনের স্বাবকীয় রাগ গোস্বা ধুয়ে মুছে যাচ্ছে। এ মুহূর্তে রত্নাকে মহামূল্যের রত্ন মনে হচ্ছে। কত পার্থক্য সেই রত্না আর এই রত্নার মাঝে। ধুসর প্রকৃতিতে রত্নাকে ও খুঁজে বেড়ায়। দেখতে পায় সেখানে কান্নারতঃএক চাতকীনিকে, শুনতে পায়, গুমরে কেঁদে ওঠা এক নারীমূর্তির আর্তনাদ।

ওর পায়ে ঠোঁট রেখে রত্না বলে চলেছে, 'আপনার প্রভুর দোহাই। একটিবারের জন্য হলেও বলুন! রত্না আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। তোমার প্রতি আমার কোনই অভিযোগ নেই। যদি তা না পারেন তাহলে ধনুক থেকে আমার বুকে একটা তীর নিক্ষেপ করে শেষ করে দিন।'

হাম্মাদ ভেবে পায়না কী করবে। শেষ পর্যন্ত ওর দয়ার সিন্ধু উথলে ওঠে। বড্ড প্রীত হয়ে ওর পীঠে হাত রেখে বলে, 'রত্না! রত্না!! আমি তোমাকে ঘৃণা করি না।'

রত্না চমকে উঠে দাঁড়ায়! হাম্মাদের এই বাক্যটি শোনার জন্য ওর এত সাধনা। ও তৃপ্ত। অবিরাম ধারায় বেয়ে যায় ওর খুবছুরত গন্ডে অশ্রু। হাম্মাদ বলে, 'তুমি কাঁদছ রত্না! সোজা হয়ে বস।

চোখের পানি মুছে ও বলল, 'এ আনন্দের অশ্রু। অশ্রু কৃতজ্ঞতার। আপনি আমার আরাধনার ধন, অবতার।'

'রত্না তোমাকে ঘৃণা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তুমি উগ্র হিন্দু পরিবারের মেয়ে। তোমার আমার মাঝে ধর্মের দেয়াল শক্ত প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ দেয়াল সহজে ভাংগার নয়।'

হাম্মাদের কথার মাঝপথে রত্না বলল, 'আজ থেকে আমার কোন ধর্ম ও দেবতা নেই। আপনি আমার দেবতা ও পুজা। আপনি আমার আরাধনার মঞ্জিল। আপনার সন্তুষ্টিই আমার ধর্ম। আপনার কথা আমার বাণী ও শ্লোক, আপনার চাহিদা মত আমি নিজকে বদলে নেব। আপনি যা করতে বলেন তা-ই করব। এ সরেযমীনে আমি আর থাকতে চাই না। এখানে আমার শান্তি নেই। আমার কাছে এ দেশ নরকের মত লাগছে। আমি আপনার সাথে নিশাপুর যেতে চাই।'

ভারাক্রান্ত মুখে হাম্মাদ বলল, 'রত্না! রত্না!! নিশাপুরে তুমি ওই শান্তি পাবে না যার আশা করছ। এখানে আসার পূর্বে আমি চুনা কারখানায় আমার বাপ-ভাইয়ের সাথে কাজ করতাম। প্রকান্ড পাথর টেনে ডোশকায় ঢুকাতাম। এছাড়া আমার বাবা বুড়া ও মা পক্ষাঘাতগ্রস্ত। আমার অবর্তমানে তারা তোমাকে কোন প্রকার শান্তি দিতে পারবেন না। পাহাড়ি বসবাসকারী আরব আমরা। আমাদের জীবন পাথরের মত শক্ত-কঠিন। সুতরাং আমার জীবন চলার পথে তোমার চলা সম্ভব নয়।

লজ্জানম্র দৃষ্টিতে হাম্মাদের দিকে তাকিয়ে রত্না বলল, 'আপনার সাথে বন-জংগলে কাটিয়ে জীবন চালাতে আমি এতটুকু দ্বিধাবোধ করব না। আপনার বাবা-মা

আমার বাবা-মায়ের মতই। সেই জ্ঞানেই আমি তাদের সেবা যত্ন করব। আপনার ঘরই আমার ঘর। ওই ঘরই আমার জীবন যৌবনের নীড়। এতেই তৃপ্ত থাকব। হাম্মাদ! আপনি আমার কথাগুলোকে আবেগ তাড়িত মনে করবেন না। আমার এক্ষণের সান্ত্বনা যে, আমি আজ থেকে নিঃসঙ্গ নই।'

হাম্মাদ উষ্ণভরে রত্নার কোমল মাংসল হস্ত দু'খানি নিজের হাতের মুঠোয় পুরে বলল, 'রত্না! তোমাকে নিয়ে আমি অতি অবশ্যই নিশাপুর যাব। আমার বাবা-মা তোমাকে দেখে যারপরনাই খুশী হবেন। এক নারী হয়ে তুমি যদি এ পরিমাণ কোরবানী দিতে পার তাহলে দেখবে তোমার জন্য আমি জীবন দিতে পর্যন্ত কুণ্ঠিত নই।

রত্না ভাবলেশাহীন হয়ে বলল, 'ভগবানের দিকে চেয়ে অমন কথা মুখে আনবেন না। নিছক আমার জন্য ওই পরিমান কোরবানী আমি চাই কী করে। আপনি আমার প্রাণ, জীবন ও আশা ভরসার স্থল। আপনার মাতা-পিতার সেবা আমার ধর্ম এবং এটা আমার পণও।' থামল রত্না, এক নাগারে কথাগুলো বলে হাঁপিয়ে ওঠল। পরক্ষণে বলল, আপনার বাবা-মায়ের নাম কী!'

রত্নার হাত ছেড়ে হাম্মাদ বলল, 'আমার মায়ের নাম যাবীব এবং বাবার নাম খালদূন। বোন নেই। ভাই তিনজন। হাসান ও হারেস খুবই মিশুক ও সরল। ওরাও তোমাকে দেখে বেশ খুশী হবে।

হাম্মাদের কথায় সপ্লীল জগতে প্রবেশ করে রত্না। হাসি আনন্দ ধরে রাখতে পারে না ও। কিন্তু প্রকাশ করে না। 'হারেস, হাসান আমার ভাইয়ের মত।'

'তোমার ব্যাপারটা তাহলে সহজ হয়ে গেল। এবার গিয়ে বিশ্রাম কর। আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে।'

'ওপাশের পালঙ্কে যেতে যেতে রত্না বলল, 'আমি যাব কৈ। আমি তোমার পাশেই থাকব। মামুজান এখানে থাকার অনুমতি দিয়েছেন।'

'তিনি তোমাকে আমার রুমে থাকার অনুমতি দিয়েছেন? হাম্মাদের চোখে বিস্ময়। পালঙ্কে বসে রত্না বলল, 'বিমলাকে সব বুলেছি। সে কথা মামুও জানেন। আমি তোমাকে ভালবাসি। সুতরাং অসুস্থকে সেবা করতে কারো কোন সন্দেহ জাগার কথার নয়।'

'কিন্তু তোমার বাগদান তো হয়ে গেছে সেই কবে।'

রত্না কথার মাঝে বলল, 'বিশ্বপালের সম্মুখে আমি সে বাগদান ভঙ্গ করার অঙ্গীকার করেছি। আর দাদারও খায়েশ ছিল আপনার সাথে আমার বিয়ে হওয়ার। এখন থেকে সে আমার কেউ নয়। নিছক অপরিচিত সে।

হাম্মাদ কোন জওয়াব দেয় না। খানিক বাদে গভীর ঘুমে ডুবে যায় ও। রত্না ওর পাশটিতে বসে বুনে যায় স্বপ্নের রঙীন জাল।

তরাইনের যুদ্ধ

৫৮৭ হিজরীতে সুলতান শেহাবুদ্দীন ঘুরী স্বল্পসংখ্যক সৈন্য সহকারে ঝড়োগতিতে গজনী থেকে বেরোলেন। লমগান উপত্যাকা হয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করলেন। চুড়ান্ত লড়াই-এ নামার ইচ্ছা থাকলে তিনি সামান্য সৈন্য নিয়ে আসতেন না। গেরিলা হামলার মত সামান্য তার সৈন্য।

এতদুদ্দেশে তিনি লাহোর সীমান্ত অতিক্রম করে ভাতিন্ডা অবরোধ করেন। ভাতিন্ডা তৎকালে বিশাল এক শহর ছিল। এর চারপাশে ছিল দুর্ভেদ্য প্রাচীর। সুলতান মুহাম্মদ ঘুরী একটু আধটু আক্রমন করে শক্তি সামর্থ আঁচ করে ফিরে যাবার মনস্থ করেছিলেন কিন্তু অবরোধ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হলে মিনজানিকের ব্যবহার শুরু করেন। কেল্লারুদ্ধ হিন্দু বাহিনী সুলতানের বাহিনীর অবরোধ উঠিয়ে নেয়ার সম্ভব সব পন্থা প্রয়োগ করেও ব্যর্থ হল। এদিকে সুলতান মিনজানিকের সাহায্যে প্রাচীরের একটা অংশ ভেঙ্গে ফেললেন এবং মুসলমানেরা নারায়ে তকবীর দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন।

শহরের অলি গলিতে লেগে গেল মারাত্মক রক্তক্ষয়ী লড়াই। ভাতিন্ডার সৈন্যরা মুসলমানদের সামনে বেশীক্ষণ টিকতে পারলেন না। মুসলমানরা ওদের কচুকাটা করল। ভাতিন্ডা দখল করে প্রশাসনিক অবকাঠামো ঠিক করতে যাবেন সেই মুহূর্তে গোয়েন্দারা খবর দিল, আজমীর থেকে হাসনাপুরসহ অন্যান্য এলাকার রাজারা বিশাল এক বাহিনী নিয়ে ধেয়ে আসছে। এদিকে মুহাম্মদ ঘুরী প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন গজনী ফেরৎ যেতে।

ভাতিন্ডা আসলে আজমীরের রাজা পৃথ্বিরাজের করদাতা ছিল। তিনি ঘুরীর ভাতিন্ডা দখলের খবর শুনে হাসনাপুরের রাজা তারই ভাই খন্ড রায়ের অধীনে দু'লাখ সৈন্য, ৩ হাজার হাতি ও অসংখ্য পদাতিক কমান্ডো দিয়ে ঘুরীর মোকাবেলায় প্রেরণ করলেন।

গুপ্তচর মারফত খবর পাওয়া মাত্রই সুলতান ঘুরী গোটা তুর্কী, আফগানী, খলজী ও ঘুরী আমীরদের নিয়ে পরামর্শে বসলেন। সকলেই ভাতিন্ডা ছেড়ে গজনীর উদ্দেশ্যে পাততাড়ি গুটিয়ে রওয়ানা করার পরামর্শ দিলেন কিন্তু মুহাম্মদ ঘুরী একে কাপুরুষতা ঠাওরালেন এবং গজনী প্রত্যাবর্তন মুলতবী ঘোষণা করলেন। তিনি বাহাউদ্দীন টুংকীকে ভাতিন্ডার গভর্নর ঘোষণা করে এক হাজার সৈন্য এ শহর রক্ষাকল্পে নিয়োগ করলেন। আর খোদ নিজেই পৃথ্বিরাজের মোকাবেলায় অগ্রসর হলেন।

স্বরসতী নদীতীরবর্তী তরাইনে উভয় সৈন্য মুখোমুখি হল। স্থানটি সমতল ও বিস্তীর্ন। সুলতানের ফৌজ হিন্দু বাহিনী দেখে ঘাবড়ে গেল। কেননা আজমীর বাহিনীর তুলনায় মুসলিম সেনা খুবই নগণ্য।

এক সময় যুদ্ধ শুরু হোল। হাতির মোকাবেলায় মুসলিম ফৌজ নেহায়েত মুসিবতের মুখে পড়ল। একজন মুসলিমের মোকাবেলায় দেখা গেল ২০/২৫ জন হিন্দু সেনা লড়ছে। এতেই ওদের সৈন্য সংখ্যা আন্দায করা যায়।

মুসলিম ফৌজ এতদসত্ত্বেও দীর্ঘক্ষণ জমে লড়তে লাগল। কিন্তু কতক্ষণ পারা যায়। শেষ পর্যন্ত ডান ও বাম বাহুর ফৌজ হতোদ্যম হল এবং পশ্চাৎপদ হওয়া শুরু করল। রাজা পৃথিরাজ এ সুযোগ কাজে লাগালেন। তিনি ঝোপ বুঝে কোপ মারলেন। শুরু করলেন মরণ কামড়। সে কামড়ে, তুর্কী, আফগানীরা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রণে ভঙ্গ দিল। এতে গোটা ফৌজে হতাশা নেমে এল। এরপরও সুলতানের কিছু জানবায সেপাই লড়ে যাচ্ছিল। এদেরই এক কমান্ডার সুলতানকে বললেন, প্রায় সব কমান্ডারই সদলবলে ময়দান ছেড়েছে সুতরাং আপনি যুদ্ধ মুলতবী করুন। মুহাম্মদ ঘুরী এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি অবশিষ্ট বাহিনী নিয়ে চূড়ান্ত লড়াইয়ে নামলেন।

যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুহাম্মদ ঘুরীর সম্মুখে হাসনাপুরের রাজা খন্ড রায় পড়ে গেল। তিনি একটি নেযা খন্ড রায়ের উদ্দেশে ছুঁড়লেন। নেযাটি গিয়ে সরাসরি খন্ড রায়ের হাতির মুখে বিদ্ধ হল এবং হাতির দাঁত ভেঙ্গে গেল। খন্ড রায় হাতির পিঠে বসা অবস্থায়ই প্রচন্ড এক আঘাত হানলে তাতে ঘুরী মারাত্মক যখমী হলেন। সুলতান ঘোড়ার পিঠ থেকে ভূতলে পতিত হবার উপক্রম হলে জনৈক খলজী যোদ্ধা তাকে নিজ ঘোড়ায় করে ময়দানের বাইরে নিয়ে এলেন। এতে সুলতানের অবশিষ্ট সৈন্যের মাঝে হতাশা দেখা দিল। সকলেই ময়দান ছেড়ে পালাল। সুলতানের যে সব কমান্ডার ইতোপূর্বে ময়দান ছেড়ে পালিয়েছিল ক্রোশ বিশেক দূরে তারা তাবু গেড়েছিল। সুলতান গিয়ে এদের সাথে মিলিত হলেন এবং সদলবলে গজনীর উদ্দেশ্যে ভারত ছাড়লেন। এভাবেই তরাইনের প্রথম যুদ্ধে মুহাম্মদ ঘুরী পরাজয় বরণ করেন। এর নেপথ্য কারণ আর অধীনস্ত সালারদের কাপুরুষতাই যে কাজ করেছিল তা বলাই বাহুল্য। যে মহান উদ্দেশ্যে বীর সুলতান গজনী ছেড়ে ছিলেন জাতির কিছু বুযদিল ইনসানের কারণে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। তিনি না পারলেন হিন্দুস্থানের গভীরে প্রবেশ করতে, না পারলেন ওদের লেজে আঘাত করতে। এক্ষণে তাই অনুতাপ ছাড়া আর কিছুই করার থাকল না তার।

দুই.

হাম্মাদের যখম চাঙ্গা হল। রত্না ওর চার পাশে অক্টোপাশের মত লেগেছিল। চটের পোষাক পরার সীমাহীন আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও রত্নার কারণে ওই পোশাক আর পরা হল না হাম্মাদের। কেননা ওর জন্য দামী পোষাক এনে রেখেছিল রত্না। অসুস্থ অবস্থায় ও তাকিয়েছিল তরাইনের প্রথম যুদ্ধের ফলাফলের দিকে।

একদিন সূর্যাস্তের সময় বিদ্যানাথ হন্তদন্ত হয়ে হাবেলীতে প্রবেশ করলেন। ওই সময় হাম্মাদ ও জ্ঞান সিং আস্তাবলে ঘোড়াকে দানাপানি দিচ্ছিল। তিনি কোন প্রকার ভূমিকা ছাড়াই বললেন, 'আমি দুঃসংবাদ ছাড়া কিছুই আনতে পারিনি।'

হাতের কাজ ছেড়ে দিয়ে হাম্মাদ ভ্রু-কুচকে বিদ্যানাথের দিকে তাকালো। বলল, 'কী দুঃসংবাদ!' জ্ঞানের চোখে মুখেও হতাশা। বিদ্যানাথ বললেন, 'তরাইনের প্রথম যুদ্ধে আমরা পরাজিত। সুলতান মারাত্মক যখমী। মুসলিম ফৌজ গজনীর দিকে পিছপা হয়েছে।'

'কিন্তু এ খবর আপনি পেলেন কী করে?' প্রশ্ন হাম্মাদের।

'আইলাক খানের মৃত্যু, আজমীরের স্বয়ম্বরা অনুষ্ঠানে তোমার অংশগ্রহণ ইত্যাদি খবর সুলতানের কাছে পৌছানোর জন্য যে গুপ্তচরদের প্রেরণ করেছিলাম ওরাই এ খবর দিয়েছে। এমনকি ওরা ওই যুদ্ধে অংশগ্রহণও করেছিল। ওরা তোমার নামে সুলতানের একটি ফরমানও নিয়ে এসেছে। হাম্মাদ চকিতে প্রশ্ন করে, 'সুলতান আমার নামে ফরমান প্রেরণ করেছেন?

'সুলতান তোমাকে সহসাই গজনী তলব করেছেন। গুপ্তচর যদ্দুর বলেছে তদ্দারা অনুমান করা গেছে, তরাইন থেকে ২০ ক্রোশ দূরে তাবুতে অবস্থানকালীন তিনি এ ফরমান লিখেছেন। তিনি মারাত্মক যখমী অবস্থায়ও তোমার নামোচ্চারণ পূর্বক বলেছেন, হাম্মাদ বিন খালদূন যেখানেই থাক না কেন সে যেন গজনী রওয়ানা হয়ে যায়। আমার মন বলছে, সুলতান তোমাকে হিন্দুস্থান ছেড়ে অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে প্রেরণ করবেন। খালদূনের বেটা হে! জানিনা কি সে কাজ! তবে এতটুকু মনে করি নিশাপুরের ঈগলকে যে কাজেই প্রেরণ করা হোক না কেন সে তার অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌছবেই।

আস্তাবলের একটি ঘোড়ার পিঠে জিন কষেই হাম্মাদ বলল, 'আমি এখনি এই মুহূর্তে গজনীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে চাই। তরাইনের প্রথম যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারার তীব্র দহন আমাকে অহর্নিশ জ্বালাচ্ছে। সময় নষ্ট না করে আমাকে দ্রুত চলতে হবে।' জ্ঞান সিং হাম্মাদের গুর্জ ও জংগী সরঞ্জাম একত্রিকরণে লেগে গেল।

বিদ্যানাথ বললেন, 'সরাসরি গজনী নয় তুমি আগে নিশাপুর যাবে।'

'নিশাপুর কেন?'

'রত্না তোমার সাথে যাবে বলে। কাজেই ওকে বাড়ীতে রেখে তুমি গজনী যাবে। কেননা তরাইন যুদ্ধে জয়লাভ করে আজমীরে এসে পৃথ্বিরাজ যখন জানবে তুমি রত্নাকে নিয়ে পালিয়েছ তখন সে উম্মাদের মত তোমাদের দু'জনকে খুঁজবে। তোমাকে গ্রেফতার করা ওদের জন্য খুবই সহজ। স্বয়ম্বরায় ওদের ফৌজ তোমাকে ভাল করেই চিনে রেখেছে।'

থামলেন বিদ্যানাথ। খানিক দম নিয়ে বললেন, 'রত্নার তালাশে পৃথ্বিরাজ সর্বপ্রথম খোজারু বাহিনী পাঠাবে ভীমসেন-এ। এখানকার কোন বাড়ীই রত্নার জন্য নিরাপদ নয়। অতএব তোমাদের দুজনকেই তড়া করে ভারত ছাড়তে হবে। এক্ষণে তোমাদের প্রথম চিন্তা নিরাপত্তার খুব সম্ভব এজন্যই সুলতান তোমাকে তলব করেছেন।' বলে তিনি জ্ঞানের দিকে তাকিয়ে বললেন, জ্ঞান! জ্ঞান!! তুমি আইলাক খানের ঘোড়ায় জিন লাগাও এবং রত্নাকে সফরের প্রস্তুতি নিতে বল। আমি হাবেলীর অন্দরে যাচ্ছি। হাতে সময় নেই খুব একটা। ওদের দু'জনকেই দ্রুত রওয়ানা করতে হবে।

বিদ্যানাথ হাবেলীর ভেতরে চলে গেলেন। ঘোড়ায় জিন লাগানোর পর হাম্মাদ তার গুর্জ, ধনুক, লৌহ পাঞ্জা ও দরকারী রশি জিনের সাথে বেধে নিল। ততক্ষণে জ্ঞানও আইলাক খানের ঘোড়ায় জিন কষে ফেলেছে। পরে হাম্মাদ ওর পানির সোরাহী জ্ঞানকে দিতে গিয়ে বলল, 'জ্ঞান! ওতে পানি ভরে নিয়ে এসো, আমি তোমার কামরায় গিয়ে

ততক্ষণে পোষাক পরিবর্তন করে আসি। ধনুক, তূণ, বর্ম ও বাযুবন্দ হাতে করে হাম্মাদ জ্ঞানের কামরাভিমুখী হল।

কামরায় এসে শুভ্র সফেদ রেশমী আচকান খুলে ফেলল হাম্মাদ। এই আচকান রত্না ওকে দিয়েছিল। বাহু ও পায়ে বাযুবন্দ বাধল। এরপর আচকান পরিধান করল। পরল বর্ম। বাইরে এসে দেখল রত্না আস্তাবলে দন্ডায়মান। রত্না ওর পোষাকাদি আইলাকের ঘোড়ার জিনে বাধছিল। ওদের পাশে মাথা নীচু করা অবস্থায় বিদ্যানাথ দাঁড়ান। তার ডানে সাবিত্রী ও বামে বিমলা। ওদের চেহারায় বেদনার ছাপ।

বিমলাও সাবিত্রী কাঁদছেন। রত্নার চোখও পানিতে টলটলায়মান। ওর ক্রন্দনে সকলেই আরো ব্যাথিত। হাম্মাদ জিনের পোটলা মোটাসোটা কেন— তদারকী করতে নিয়ে দেখল ওতে তিন/তিনটি তোড়া। বিদ্যানাথকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করল হাম্মাদ। বলল, 'কার জন্য এগুলো?'

বিদ্যানাথের স্থলে রত্না চোখের পানি মুছে বলল, 'এর মধ্যকার দুটি থলে আমার আরেকটা মামুজানের দেয়া।'

'এর দরকার ছিল কি?'

'বেটা! আমি রত্নাকে তোমার জীবনসঙ্গীরূপে সাব্যস্ত করে ফেলেছি। কাজেই ওই দু'তোড়ার মালিক তুমি। আরেকটা আমার পক্ষ থেকে। তোমাদের কাজে লাগবে। ওগুলো ফেরৎ দেবে না। দিলে আমি বড্ড কষ্ট পাব। তোমরা দ্রুত রওয়ানা কর। এখানে তোমরা যতটা দেরী করবে ততটা বিপদ তোমাদের দিকে ধেয়ে আসবে। তোমাদের জন্য আমার দোয়া থাকবেই সর্বদা। খোদার কাছে মিনতি করি তিনি যেন তোমাদের নির্বিঘ্নে নিশাপুর পৌঁছে দেন।'

বিদ্যানাথের মুখে 'খোদা' শব্দ শুনে রত্না চমকে ওঠল। কেননা এ শব্দ মামুর মুখ থেকে রত্না এই প্রথম শুনছে।

কী একটা ভেবে রত্না অগ্রসর হল। আচমকা বড় দু'ফোটা অশ্রু ওর গন্ড বেয়ে পড়ল। বিমলা ও সাবিত্রীকে পরপর জড়িয়ে ধরে কাঁদল। পরে মামুর পদধুলি নিয়ে নিজ ঘোড়ায় চাপল। হাম্মাদ বিদ্যানাথের সাথে আখেরী মোসাফাহা করল এবং ঘোড়ায় চাপল।

এ সময় সাবিত্রী বললেন, 'হাম্মাদ বেটা! রত্নার দিকে খেয়াল রেখ! বাবা-মায়ের সাথে পরামর্শ করে ওকে বিয়ে করে নিও। ওকে যা বলার বলে দিয়েছি। তোমার প্রতি খেয়াল রাখবে।' এর পরে পালা বিমলার। সে আগ বেড়ে বলল, 'হাম্মাদ ভাই! এখান থেকে চলে যাবার পর একথা মনে করবেন না তো যে, এক বোন ভীমসেনে আপনার পথ চেয়ে বসে নেই?'

হাম্মাদ বিমলার দীঘল কালো চুলে হাত রেখে বলল, 'পাগলী কোথাকার! কোন ভাই তার বোনকে ভুলে থাকতে পারে কি! দেখবে একদিন রত্না ও আমি তোমাদের দরোজার কড়া নাড়ছি।' বলে হাম্মাদ ঘোড়ায় পদাঘাত করল। রত্নাও করল ওর অনুসরণ। বেরিয়ে এল হাবেলী ছেড়ে বাইরে।

নীড়হারা দুটি প্রাণী সরস্বতির কিনারা ধরে ছুটে চলছে নতুন নীড়ের সন্ধানে। এ চলা যতটা কষ্টের তারচেয়ে বেশী আনন্দের। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। নদী পারাপারের কাঠের পুলের কাছে ওরা পুল পেরিয়ে পশ্চিম দিকে ছুটল। উদ্দেশ্য আবুবকরের বসতি সুধানীর। আচমকা হাম্মাদ ঘোড়া থামাল। রত্নাও ওর অনুসরন করল। বলল, কি হোল ঘোড়া থামালে যে!'

'সন্ধ্যা হয়ে আসছে। খানিক থামো। আমাকে মাগরিবের নামায আদায় করতে হবে।'

ঘোড়া থেকে নেমে হাম্মাদের ও নিজের ঘোড়ার লাগাম হাতে নিল রত্না। বসে গেল নিকটস্থ একটা পাথরে। নিরীক্ষণ করতে লাগল হাম্মাদের প্রভুভক্তির দিকে। হাম্মাদ ওযু সেড়ে নামাযে দাঁড়াল।

রত্নার চোখ মুখে বিস্ময়। এও কি সম্ভব! মানুষ মুসিবতের মধ্যেও প্রভুর শানে নিজকে এভাবে লীন করে দিতে পারে। ওর ভাবনা, কি সে আকর্ষণ যদ্দরুন প্রাণ না বাঁচিয়ে মানুষ এভাবে প্রভুর ডাকে সাড়া দেয়। ওর ভাবনাজাল নিজেই ছিন্নকরল হাম্মাদের নামায শেষে এই বলে, 'যমীনে সেজদা করে প্রভুর কাছে যে অঙ্গীকার করলেন তা আমাকে শেখান। আমি আপনাকে ভালবাসি। কাজেই এ যমীন ছাড়ার পূর্বেই আপনার আমার অন্ততঃ ধর্মের পার্থক্যটা ঘুচুক এটা চাই। চাই মুসলমান হতে।'

হাম্মাদ রত্নার দুহাত ধারণপূর্বক বলল, 'এ সিদ্ধান্ত কী শুধু ভালবাসার তাগিদেই করলে! মুচকি হেসে রত্না বলল, 'না হাম্মাদ! এ আমার মনের ডাক, হৃদয়ের আকুতি। আমি তোমার ধর্মের প্রতি অনুরক্ত এবং সাক্ষা দিলেই এ ঘোষণা করছি। তুমি আমাকে বিমুখ করবে না। জানি না মামা, মামী ও মামাত বোন মুসলমান হয়েছেন কি না। তবে তাদের আচরণ ও কথাবার্তায় বুঝতে পেরেছি, খুব সম্ভব তারা বহু পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

'রত্না! রত্না! তুমি জেনে খুশী হবে তারা তিনজনই মুসলমান।'

রত্না বলল, 'তাহলে আমি আর বাকী থাকব কেন!'

হাম্মাদ কলেমা-ই তায়্যিবা পড়ল। রত্নাকে বলল এই পবিত্র বাণী মুখে আনতে। আসমানের দিকে তাকিয়ে রত্না বলল, 'হে আসমানের ফিরেশতাকুল! হে তারকারাজী! হে আমার আল্লাহ। মেঘপুঞ্জ হে! তোমরা সবে সাক্ষী আমি সাক্ষা দিলে ইসলাম কবুল করছি।' হাম্মাদ ফের রত্নাকে লক্ষ্য করে বলল, 'রত্না! আজকের রাতটা আমাদেরকে সুধানীরে বীনাদের ওখানেই কাটাতে হবে। কেননা রাতের বেলা স্বরসতির উপকূল ধরে চলা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। অবশ্য আমি একলা হলে কোন ব্যাপার ছিল না। তোমাকে নিয়েই আমার যত ভাবনা।'

রত্না হাম্মাদের কথায় কোন আপত্তি করল না। ঘোড়ার পিঠে চেপে সুধানীরের উদ্দেশ্যে ছুটল ওরা। সুধানীর ওখান থেকে মাত্র এক ফার্লং দূরে। পথিমধ্যে হাম্মাদ রত্নাকে কেবল কলেমার শব্দগুলো উচ্চারণ করিয়ে যাচ্ছিল।

নিধন

সুধানীরে প্রবেশ করে ওরা দেখল খোলা ময়দানে কিছু লোক জমায়েত হয়ে রয়েছে। সকলেই সশস্ত্র। কারো কারো হাতে মশালও। বসতির প্রতিটি ঘরে জনৈক বৃদ্ধ কি যেন খুঁজে ফিরছেন। মনে হচ্ছে, কিছু একটা খোয়া গেল কি-না এটা দেখতেই তার বারবার আসা যাওয়া। মানুষের ভীড়ে এসে রত্না ও হাম্মাদ ঘোড়া থেকে নামল। হাম্মাদ এই জমায়েতের কারণ জিজ্ঞাসা করতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে পেছন থেকে কে যেন ওর হাত পেঁচিয়ে ধরল।

'দাদা! দাদা!! কেমন আছেন?' কারো আচমকা আহবানে হাম্মাদ চমকে ওঠলেও পরক্ষনে ওর ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে ওঠল। এ কণ্ঠ একটি মেয়ের। মেয়েটি ওর পূর্ব পরিচিত। বীনা ওর নাম। প্রীতিভরে মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে হাম্মাদ বলল—

'কেমন আছ বোন?'

'ভাল।'

'ওই দেখ রত্না! ওর সাথে কথা বল। তবে মনে রেখ, এ আগেকার সেই রত্না নয়। এক্ষণে মুসলমান এবং খুব শীঘ্রই আমার স্ত্রী হতে যাচ্ছে।'

রত্না অপেক্ষাকৃত একটু দূরে অবস্থান করছিল। হাম্মাদের শেষের দিকের কথা শুনে ও লজ্জায় লাল হয়ে গেল। হাম্মাদ আরো কিছু বলতে যাবে সেই মুহূর্তে রত্না বীনাকে জড়িয়ে ধরে কানে কানে বলল, 'তুমি না হাম্মাদের বোন। ও আমার প্রেমিক। এই হিসাবে তুমি আমার হবু ননদও।'

বীনা রত্নাকে আবেগাতিশয্যে আরো জোড়ে বুকে চেপে ধরল। রত্না বলল, 'কিগো! ফুসফুস থেকে বাতাস বের করে নেবে কি?'

ততক্ষণে আবু বকর ইসমাঈল ও সেবারামও এসে হাজির। সকলেই এক এক করে হাম্মাদের বুকে বুক মেলাল। রত্না ও বীনা দূরে দাঁড়িয়ে এদৃশ্য অবলোকন করছিল। হাম্মাদ আবু বকরকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার রাতে মানুষের এই হুজুম কেন?'

'ব্যাপারটা ইসমাঈলই ভাল বলতে পারবেন।' বললেন আবুবকর।

'ইসমাঈল! হয়েছে কি?'

ইসমাঈল এক বুক হতাশা ঝেড়ে বলল, যেদিন আপনাকে নিয়ে আমি ভীমসেন গিয়েছিলাম এবং পথিমধ্যে আপনি একটা বাঘ মেরেছিলেন সেই থেকেই এ বসতিতে অশান্তির আগুন লেগেই আছে। বাঘটি সে ভয়াল রাতে আপনি মেরেছিলেন কিন্তু

বাঘিনী তো বেঁচেছিল। খুব সম্ভব তার প্রিয় সঙ্গীর মৃত্যুশোক সামলাতে না পেরে সে অত্র বসতির গবাদি পশুদের টার্গেট করে। দুদিন অন্তর সে বসতিতে হামলা করে কোন পশু শিকার করে নিয়ে যেতে থাকে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ একদিন বাঘিনী পশু পালে চড়াও হলে রাখালেরা এক জোট হয়ে তাকে বাধা দেয়। এবার পশুপাল ছেড়ে বাঘিনীও রাখালদের ওপর ঘাতক সেজে চড়াও হয় এবং বেশ ক'জন রাখালকে আহত করে। তুলে নিয়ে যায় একজনকে, ব্যাস ওইদিন থেকে আদম সন্তানের রক্তঘ্রান তাকে মোহিত করে তোলে। এরপর থেকে মানব সন্তান তার শিকারে পরিণত হতে থাকে একের পর এক। এক্ষণে সে পাক্কা আদম খোর। বসতির কোন না কোন ঘরে তার করাল থাবা পড়ছে প্রত্যহই। সামনের এই যে ঘরটা দেখছ না ওটা এক বিধবার। ওর তিন সন্তান। তার একটাকে আজ সে তুলে নিয়ে গেছে। বেচারী তো কেঁদে পাগল। বসতির লোকজন জড়ো হয়ে তার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।'

থামলেন ইসমাঈল। পরে খানিক দম নিয়ে বললেন, 'আজ আমি ক'নওজোয়ানসহ বাঘিনীর পশ্চাদ্ধাবন করার ইরাদা করেছিলাম কিন্তু অত্র এলাকার প্রবীন বয়োবৃদ্ধরা বললেন, এ মুহূর্তে বাঘিনীর মাথা গরম। এ মুহূর্তে সামনে যাকেই পাবে তাকেই সাবাড় করে দেবে। কাজেই আগামীকাল যেও। পারলে বাঘিনীকে মারবে, না পারলে কমপক্ষে তাকে জংগল ছাড়া করবে।

আসন্ন অভিযানে কোন হিন্দু অংশগ্রহণ করবে না। কেননা ওদের বিশ্বাস যে বাঘ ইতোপূর্বে মারা গেছে সে পন্ডিত মনোহর লালের অশরীরী আত্মা। সেই আত্মাই আজ প্রেতাত্মা হয়ে বাঘিনীরূপে চড়াও হয়েছে। ওদের আরো বিশ্বাস এই বাঘিনীও মারা পড়লে পন্ডিতজি তৃতীয় জনম নেবেন। কাজেই বসতির সকল হিন্দুরা সদলবলে এ স্থান ত্যাগ করে অন্য কোথাও চলে যাবেন। বাঘিনীর বিরুদ্ধে তারা নামবেন না কিছুতেই। ওরা খুব সম্ভব কাল নাগাদ বসতি খালি করে দেবে।'

হাম্মাদ কথাগুলো নিশ্চুপ নির্বিকার শুনে যায়। প্রকৃতিতে হালকা বৃষ্টির ফোটা। আকাশে গুমোট বাধা মেঘের সারি, যদ্দরুন পরিবেশ জমকালো, ভয়াল। হাম্মাদ সেবারামের দিকে তাকিয়ে বলে, 'সেবারামজি! আপনি রত্না ও বীনাকে নিয়ে বাড়ির পথ ধরুন। বৃদ্ধাকে একটু সান্ত্বনা দিয়ে আসি।'

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে রত্না হাম্মাদের দিকে তাকাল। এ তাকানোর রহস্য হাম্মাদ জানে। কাজেই রত্নাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ও বললো, 'যাও রত্না তুমি যা মনে করছ তেমন কিছু না। আমি বৃদ্ধাকে কেবল সান্ত্বনা দিতে যাচ্ছি।'

রত্না কথা বাড়াল না। সেবারামের সাথে রওয়ানা হয়ে গেল।

আবু বকর, ইসমাইল ও হাম্মাদ বৃদ্ধার ঘরে এল। দেখল বেচারী কেঁদে অজ্ঞান। কাঁদছে তার দু'ছেলেও। বসতির কিছু মহিলা তাদের সান্ত্বনা দিয়ে চলেছে।

হাম্মাদ ইসমাঈলকে বলল, 'ইসমাঈল! এই শোকবহ পরিবেশের সকল দায়ভার আমার। আমার কারনেই এই বসতিটা উজাড় হতে চলেছে। আমি বাঘটাকে না মারলে বাঘিনী এভাবে ক্ষেপত না। তাছাড়া হিন্দু বিশ্বাসটা ও কিছু একটা করা দরকার। সব মিলিয়ে বাঘিনী নিধন এক্ষণে অতীব জরুরী হয়ে পড়েছে।'

থামল হাম্মাদ। খানিক ভেবে আবারও বলল, 'ইসমাঈল! ওই মন্দিরে যাওয়া এখনই সম্ভব নয় কি! আমি আজ রাতেই ব্যাপারটা চুকে ফেলতে চাই। ওকে আমি লৌহগদা দ্বারা থেতলে দিতে চাই, যাতে কুসংস্কার মনা হিন্দুরা দেখতে পারে, পণ্ডিত মনোহর লালের তথাকথিত পুনর্জন্মের অবয়বের পরিণতি কি! আমি পুরুষ বাঘকে যখন মেরে ফেলতে পেরেছি তখন মেয়ে বাঘটা মারা আমার জন্য কোন ব্যাপারই না। তুমি আমার সাথে যাবে। তোমার কোন ক্ষতি হবে না আমার উপস্থিতিতে। কি, তুমি যাবে তো!'

ইসমাঈলকে উত্তর দেয়ার সুযোগ না দিয়ে আবু বকর বললেন, 'খবরদার হাম্মাদ! জমকালো এই রাতে ভয়াল ওই মন্দিরে যেও না। ব্যাপারটা এত সোজা নয়। সকালে সকল জোয়ান মিলে জংগল চষে ফিরব আমরা'।

হাম্মাদ তার কথার মাঝখানে বলল, 'এতে লাভ কী? বাঘিনী হয়ত তোমাদের লাঠি সোটার ভয়ে কদিন গা ঢাকা দিল। তারপর তো সে আরো ক্ষিপ্ত অবস্থায় হামলা করবে।'

'যাই কিছু বলো না কেন, এই রাতে ওখানে যাওয়া হবে না। সকালে যা কিছু করার করো।'

হাম্মাদ খামোশ হয়ে গেল। মনে হল, ভেতরে ভেতরে ও কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। নিরবতা ভঙ্গ করে বলল, 'সেবারাম, বীনা ও রত্না আমার অপেক্ষায় আছে। এক নাযুক পরিস্থিতিতে আমি রত্নাকে নিয়ে নিশাপুর যাচ্ছি। আগামীকাল কাক ঢাকা ভোরেই আমাদের এ এলাকা ছাড়তে হবে।'

আবু বকর হাম্মাদকে কিছু বলতে চাচ্ছিল কিন্তু লৌহ মানবের ঘোড়া ততক্ষণে মনিবের ইশারায় বলা কওয়ার বাইরে চলে গেছে। হাম্মাদের ঘোড়া সেবারামের বাড়ীর দিকেই ছুটছে। ইসমাঈল ও আবু বকর দৃষ্টির অগোচরে যেতেই ও ঘোড়ার মোড় পাল্টাল। ওর ঘোড়া এবার আরো দ্রুত গতিতে ছুটছে। আলোকোজ্জ্বল একটি ঘরের সামনে এসে ওর গতি শ্লথ হয়ে গেল। জনৈকা হিন্দু মেয়ের বিয়ে। বিয়ের গীত চলছিল। হাম্মাদ ওই গীতের প্রতি মনোনিবেশ করে। ঢোল-তবলা বাজিয়ে মেয়েরা রকমারী বিয়ের গান গাইছে।

এক সময় হাম্মাদ বসতির বাইরে চলে এল। গানের আওয়াজ ক্রমশঃ ওর থেকে বিলীন হয়ে এল। ঘোড়া উল্কাবেগে ছুটছে রহস্যপূর্ণ মন্দিরের দিকে।

হাম্মাদের এক হাতে নাঙ্গা তলোয়ার, অপর হাতে ঢাল, পীঠে তীর ভর্তি তূণ, দেহে লৌহবর্ম, হাতে পায়ে লোহার বাযুবন্দ ও পাবন্দ। মন্দির ক্রমশঃ ওর কাছে এগিয়ে আসছে বলে মনে হল এক সময়।

মন্দির থেকে এক ফার্লং দূরে হাম্মাদ ওর ঘোড়া থেকে নামল। ঘোড়াটি একটি গাছের সাথে বাঁধল। খানিক এদিক ওদিক তাকিয়ে নিল। এরপর অস্ত্রশস্ত্র ঠিক আছে কি-না দেখে নিল।

ওর চোখে ভেসে ওঠল রহস্যপূর্ণ মন্দিরের আবছায়া। প্রকৃতিতে তখনও ইলশে গুঁড়ি বৃষ্টি। জংগলে পীন পতন নিস্তব্দতা। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। মন্দিরে যাবার উদ্দেশ্যে হাম্মাদ বদ্ধ পরিকর। মৃত্যু আলিংগণ করতে প্রস্তুত ও। 'শিকারী বিড়ালের ধীরে চলো' নীতিতে ওর পদক্ষেপ। পায়ের তলায় শুকনো পাতার গালিচা। যদ্দরুন মচমচ শব্দ হচ্ছিল।

পুরানো একটা গাছের ডাল মচমচ করে ওঠল আচমকা। সেই সাথে শনশন কিছু আওয়াজও অনুমিত হল। হাম্মাদ নিজকে সামলে নিল। জংগলের রূপ যেতে লাগল বদলে। বনভূমি এমুহূর্তে ভুতুড়ে বাড়ীতে পর্যবসিত।

কি এক সম্মোহনী মন্ত্রমুগ্ধের মত হাম্মাদ এগিয়ে চলছে। কোন বাধাই ওর পথ আগলাতে পারছে না। বিশাল বনাঞ্চল যেন নিদ্রারকোলে ঘুমিয়ে গেছে। সহসাই জংগল কি এক আওয়াজে আড়মোড়া দিয়ে জেগে ওঠল। হাম্মাদ চমকে উঠলেও সাহস হারাল না। চারিদিকে ওর লৌহগদা ঘুরাল। পরক্ষণে ওই আওয়াজ বিলীন হওয়ায় আত্মবোকামির দরুন হেসে ওঠল। আওয়াজটা ছিল একদল বাদুড়ের উড়ে যাওয়ার।

আবার সেই নিস্তব্দতা। হাটতে হাটতে হাম্মাদ মন্দির প্রাচীরে এসে দাঁড়াল। লৌহ গদা ঠিক করে নিজকে প্রস্তুত করে নিল। ওর কাছে এ সময় মনে হল, লঘু পায়ে কী যেন ওর উদ্দেশ্যে এগুচ্ছে। ঢাল প্রস্তুত হাম্মাদের। আবারও হাম্মাদ আত্মবোকামির দরুন হাসল। কারণ এবারের ধারনাটিও ওর অমূলক। নেপথ্যে সেই বাদুড়ের উড়ে যাওয়াই।

মন্দিরের চারপাশ ঘুরে মূল ফটকে এসে দাঁড়াল হাম্মাদ। স্থানটি খুবই এবড়ো থেবড়ো। ভাঙ্গাচোরা মন্দিরের অন্দরে মুখ ঢোকায় ও। ভেতরে জমকালো আঁধার। মন্দিরতো নয় হিংস্র পশু শালার চিড়িয়া খানা। পঁচা রক্তের দুর্গন্ধ। হাম্মাদ ভেতরে ঢুকল, কী ভেবে আবার বাইরে এল। হাতে তুলে নিল ভারীপাথর একটা। দরজার সামনে পাথরটা মন্দিরের ভেতরে ছুঁড়ে মারল। মন্দিরের গাত্রে লেগে বেশ শব্দের সৃষ্টি করল। অসংখ্য অগনিত বাদুর সে আওয়াজে সাঁ সাঁ শব্দে বেরিয়ে গেল। মন্দির থেকে তেমন কোন প্রতিরোধ কিংবা প্রত্যুত্তোর এল না।

পর পর ক'টি পাথর হাম্মাদ এভাবে ভেতরে ছুঁড়ল। পরিকল্পনা, বাঘিনী ভেতরে থাকলে অবশ্যই বেরিয়ে আসবে। সেই সুযোগে দরোজায় ওঁৎপেতে লৌহগদা দ্বারা

কাবু করে ফেলবে। হাম্মাদের বিশ্বাস মন্দিরে কিছুই নেই। সুতরাং ঢাল উঁচিয়ে ও ভেতরে প্রবেশ করল।

প্রশস্ত একটি কুঠরীতে এসে দাঁড়াল দুঃসাহসিক হাম্মাদ। ডানে-বামে সামনে পেছনে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে হাম্মাদ আগে বাড়ল। প্রশস্ত কামরার পরে সরু একটি দরোজা। দরোজার ওপাশের কক্ষটি অপেক্ষাকৃত ছোট। কক্ষটি বেশ আলোকময়। কারণ এখানে জানালা আছে। তারকার মিটিমিটি আলোর হালকা ঝলক ভেতরে ঠিকরে পড়ছে। হাম্মাদ দেখল, কক্ষের মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য মানব হাড্ডি, পাঁজর ও মাথার খুলি। এরা যে বাঘিনীর শিকার তাতে বোধকরি কোন সন্দেহ রইল না ওর। কক্ষের কোনে তাকিয়ে হাম্মাদ ভূত দেখার মত চমকে উঠল। ওখানে একটি তরতাজা বাচ্চার লাশ। লাশটির ঠিক বুক বরাবর ফাঁড়া। গোটা দেহে বাঘিনীর দন্ত-নখের ছাপ। হাম্মাদের শিরার খুন গরম হয়ে ওঠল। স্বজাতির এ করুণ দৃশ্য ও সহ্য করতে না পেরে উফ্ আল্লাহ বলে আর্তনাদ করে ওঠল। প্রতিশোধ নিতে দাঁতে দাঁত পিষল।

লাশটি নিরীক্ষণ করে হাম্মাদ গোটা কামরার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করল। কামরার পেছনেও একটি দরোজা রয়েছে। জীব-জন্তু ওখান থেকে সহজেই ঢুকতে পারে। আরো অনেক রহস্যপূর্ণ কামরা আছে। না জানি সেগুলো আরো কত রহস্যে ভরা। হাম্মাদের এ মুহূর্তে সেগুলো আবিষ্কারের দরকারও নেই। যে কামরায় বাচ্চার লাশ পড়েছিল ওই কামরায়-ই ও ওঁৎপেতে থাকল এবং গবাক্ষ দরোজা বন্ধ করে দিল। হাম্মাদের ধারণা দরোজা বন্ধ দেখে বাঘিনী খিড়কী পথে এ কক্ষে প্রবেশ করবে। যখনই সে লাফ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে চাইবে তখনই লৌহ গদা দ্বারা তাকে কাবু করতে হবে।

গবাক্ষ দরোজা বন্ধ করে হাম্মাদ নিশ্চিত হতে পারল না। একে তো দরোজাটি জীর্ন শীর্ন, দ্বিতীয়তঃ ছিটকিনি অতিপুরানো। দরোজার অর্ধেকের বেশী ভাঙ্গা। ও দৌড়ে খিড়কির কাছে এসে পরখ করতে চাইল, খিড়কির ছিটকিনি আটকালে তার কপাট কতটা মজবুত থাকে। দেখা গেল ছিটকিনি আটকানোর পরও ওটি মজবুতভাবে বন্ধ হলো। হাম্মাদ এবার মূল ফটকের কাছে এসে বাঘের অপেক্ষায় থাকল।

আচমকা বৃষ্টি বন্ধ হল। সেই সাথে পুরো বনভূমি কারো আগমনে কেঁপে ওঠল। মন্দিরের প্রবেশ দ্বার দিয়ে ভাটার মত চোখ দুটি জ্বেলে বাঘিনী প্রবেশ করল। মানুষের রক্তের ঘ্রাণ বোধ হয় তার নাকে গেছে। ডান হাতের গদা ঘোরাল হাম্মাদ, পূর্ণ শক্তিতে সে আঘাত বাঘিনীর মাথার ওপর লাগাল। আচমকা আঘাতে বাঘিনী হলো ভূতলশায়ী, কিন্তু তড়া করেই উঠে দাঁড়াল বাঘিনী এবং পতিশোধ নিতে হাম্মাদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ল। সর্বশক্তি দিয়ে সে প্রচন্ড হুংকার মারল। হাম্মাদ এ হামলার জন্য প্রস্তুত আগেভাগেই। হামলা প্রতিহত করতেই ও গদা দিয়ে দ্বিতীয়

আঘাত হানল। ওর এবারকার আঘাত বাঘিনীর কোমড়ে লাগল। এই আঘাতে বাঘিনী মারাত্মক আহত হল। তার আর্তনাদে মন্দিরসহ গোটা বনভূমি কেঁপে ওঠল। এক চক্কর খেয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল সে। শুয়ে শুয়েই সে শত্রুকে কাবু করতে চাইল। তার গোঙানীতে সুস্থ মানুষেরও প্রাণ কেঁপে ওঠার কথা। বাঘিনীর শক্তিও নিঃশেষ প্রায়। কোমড়ের হাড্ডি বিলকুল ভেঙ্গে ছত্রখান। তার গোঁ গোঁ আওয়াজে গোটা প্রকৃতি তটস্থ।

বিজয়ী হাম্মাদ লৌহগদা তৃতীয় বারের মত এস্তেমাল করল। তার অবশিষ্ট চেতনাবোধটুকু সেই সাথে গেল রহিত হয়ে। শ্বাস প্রশ্বাস কোনক্রমে জারী ছিল। লৌহ গদা একপাশে রেখে দুঃসাহসিক হাম্মাদ বাঘিনীর গলা চেপে ধরল। অসহায় বাঘিনীর প্রতিরোধ শক্তি নেই। কাজেই এক সময় তার দম বন্ধ হয়ে গেল। হাম্মাদ উচ্চস্বরে তকবীর ধ্বনি দিল। অস্ত্রগুলো নিজের শরীরের সাথে বেঁধে বাঘিনীকে কাঁধে তুলে নিল। বেরিয়ে এলো মন্দির থেকে।

দুই.

ওদিকে সেবারামের বাড়ীতে হাম্মাদের জন্য দুশ্চিন্তার শেষ নেই রত্নার। বীনার খাদ্য তৈরিও শেষ। অপেক্ষা শুধু হাম্মাদের। রত্না সেবারামকে বলল, 'রামজি! বেশ দেরী হয়ে গেল কিন্তু হাম্মাদের দেখা নেই। এতক্ষণ তো ওর বাইরে থাকার কথা নয়।

সেবারাম সান্ত্বনাসূচক কণ্ঠে বললেন, 'আবু বকর ও ইসমাঈলের সাথে হয়ত কোথাও আড্ডায় মেতেছে। ওরা স্বজাতি তো। হয়ত বহুদিনের জমাট কথা বলছে।'

'না রামজি! ও তাদের কারো কাছে নেই।'

সেবারাম কিছু বলতে যাবেন সেই মুহূর্তে দরোজার কড়া নড়ে ওঠল। সেবারাম বলে ওঠলেন, দরোজা খোলাই আছে ভেতরে আসুন।' রত্না দেখলে। তুমি না হাম্মাদের নামোচ্চারণ করেছিলে সে তো এসেই গেল।'

কিন্তু সেবারাম বোকা বনে গেলেন। কোথায় হাম্মাদ? উঠানে তো আবু বকর ও ইসমাঈল। তারা এসে সেবারামকে প্রশ্ন করলেন, হাম্মাদ কৈ? সে তো সকালে চলে যাবে। আমরা তার সাথে কিছু বলতে চাই।'

সেবারাম বললেন, 'আমার ধারণা তিনি আপনাদের দু'জনার সাথে আছেন। উল্টা আপনারা এসে আমাকে প্রশ্ন করছেন, সে কোথায়! ব্যাপারটা সত্যিই যদি তা-ই হয় তাহলে বোধহয় সে একাকীই মন্দিরে গেছে।'

বুড়ো আবু বকর বললেন, 'হয়তবা তোমার ধারনাই যথার্থ। চলো সময় নষ্ট না করে আমরা কিছু যুবক জোগাড় করে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হই। আপনারা দাঁড়ান। আমি তাগড়া ক'জনকে নিয়ে আসি।

আবু বকর কিছুক্ষণের মধ্যে বেশ ক'জন জোয়ানসহ হাজির হলেন। বললেন, 'চলুন এদেরসহ মন্দিরে যাই।'

রত্না বলল, 'চাচা আবু বকর! আপনাদের আপত্তি না থাকলে আমিও আপনাদের সাথে যেতে চাই।'

এক্ষণে ইসমাঈল বললেন, না বোন! তোমার দরকার নেই।'

রত্না বলল, 'না না। আমি যাব।' বেচারা ইসমাঈলের কিছু বলার থাকল না। 'চলো! যাবেই যখন তখন দেরী কেন।'

সেবারামের সাথে রত্না ও বীনা দুজনেই রওয়ানা হোল। ওরা দেখল উঠানে বিশ/পঁচিশজন তাগড়া জোয়ান লাঠি সোটা হাতে দন্ডায়মান। কারো কারো হাতে আবার মশালও।

ইসমাঈল সকলকে নিয়ে সরু পথে অগ্রসর হল। পথিমধ্যে হাম্মাদের ঘোড়া দেখে ওরা দাঁড়াল। ইসমাঈল চারদিকে তাকিয়ে বলল, 'নিরাপদস্থানে ঘোড়াবেধে হাম্মাদ নিশ্চয় বাঘিনীর তালাশে গেছে। ওর ঘোড়ার গরদানে শিঙ্গা ছাড়া আর কিছুই নেই। এরদ্বারা বোঝা যাচ্ছে সর্বশক্তি নিয়েই সে গেছে। আমাদের যত দ্রুত সম্ভব ওর সাহায্যে মন্দিরের পাদদেশে যাওয়া দরকার।

ওরা যখনি মন্দিরের উদ্দেশ্যে আরো সামনে অগ্রসর হতে যাবে সেই মুহূর্তে মুষলধার বৃষ্টি শুরু হোল। সেই সাথে বাঘিনীর হুংকারও দুর থেকে ভেসে এল। ইসমাঈল চিৎকার দিয়ে বললেন, সকলে আমার সাথে এসো। মনে হচ্ছে বাঘিনী মন্দিরের নিকটেই হুংকার মারছে। আমার মন বলছে, সে হাম্মাদের মুখোমুখি।

রত্না বীনা। তোমরা সশস্ত্র যুবকদের মাঝে থাকার চেষ্টা করো।

সকলেই দ্রুত মন্দিরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। মন্দির থেকে সামান্য দূরে থাকতেই হাম্মাদের গদার পয়লা আঘাতে বাঘিনীর মরণ গোঙানী ওদের কানে এল। ইসমাঈল বললেন, 'দ্রুত এসো। বাঘিনীর গোঙানীতে বোঝা যাচ্ছে লড়াই শুরু হয়ে গেছে রীতিমত। সব জোয়ান ইসমাঈলকে অনুসরণ করতে লাগল।

আচমকা বাঘিনীর গোঁ গোঁ আওয়াজ ওদের কানে এল। এই সময় হাম্মাদ বাঘিনীর কোমড়ে দ্বিতীয় আঘাত মেরেছিল। ইসমাঈল উচ্ছ্বাস প্রকাশপূর্বক বললেন, খুব সম্ভব হাম্মাদ বাঘিনীর তেরটা বাজিয়ে দিয়েছে। খানিকবাদে মন্দিরের ভেতরে তকবীর ধ্বনি শুনে সকলে মন্দির ফটকে এল। দেখল বীর হাম্মাদ বাঘিনীকে পিঠে করে বিজয়ী বেশে বেরুচ্ছে।

সকলকে মন্দির চত্বরে দেখে হাম্মাদ বিস্ময়ে বলল, 'তোমরা এখানে এলে কী করে! ইসমাঈলের স্থলে আবু বকর বললেন, 'এরপূর্বে বলুন! আপনি একাকী কোন সাহসে এই জমকালো মন্দিরে এসেছেন?

হাম্মাদ মুচকি হেসে বলল, 'আমি কাকডাকা ভোরে এ বসতি ছাড়তে চাচ্ছিলাম। যাওয়ার আগে বদ-আকীদার এ আপদের কিছু একটা করে তবেই। তোমরা দেখছ আমার সেই অভিযান সফল।

'তারপরও আপনি একা কেন? বসতির এদের সাথে নিলে হত না। কসম খোদার! বসতিতে ঘোষণা দেয়া মাত্রই হাজার জোয়ান আপনার ডাকে সাড়া দিতই। বললেন আবু বকর।

ইসমাঈল বললেন, 'যা হবার হয়ে গেছে। চলুন ফেরা যাক। আর বাঘিনীকে গোটা বসতিতে ঘোরানো দরকার। হিন্দুরা বুঝুক, তাদের পণ্ডিত মনোহর লালের পুনঃর্জন্মের পরিণতি কতটা সুখকর।'

আচমকা রত্না ও বীনাকে দেখে হাম্মাদ বলল, 'তা তোমরা এখানে?'

রত্না দাঁতে নখ কেটে বলল, 'এ প্রশ্ন আমারও। তুমি এখানে কেন? এখানে আসার পূর্বে কেন মনে করলে না, তোমার চিন্তায় আরেকটা প্রাণীর প্রাণপাখি খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম হতে পারে?'

'যাহোক চলো। সবকিছু ভুলে যাও। আমি কোন অপকাজ করে বসিনি তো। এ আমার বিশ্বাসগত লড়াই। সে লড়াই-এ খোদা আমায় জয়ী করেছেন। কী তুমি এতে খুশী নও কি?' রত্নার হাত মুঠোয় পুরে মৃদু চাপ দিয়ে বলল হাম্মাদ! রত্নার সব অভিমান সে চাপেই শেষ।

ইসমাঈলের ইশারায় ক'জোয়ান বাঘিনীর দেহ কাঁধে তুলে নিল। প্রথমে ওরা হাম্মাদের ঘোড়ার কাছে এল। হাম্মাদ ঘোড়ার লাগাম হাতে নিল। ঘোড়াটি প্রথমে একটু লম্ফন কূর্দন করল। মনে হল সে একটু ক্ষেপে গেছে। মনিব কেন তাকে সাথে নিল না— এজন্যই বোধ হয় তার ক্ষেপে যাওয়া। হাম্মাদের স্নেহপরশ অবুঝ প্রাণীর অভিমান দূর করল। বসতিতে প্রবেশ করে ইসমাঈল ও আবু বকর বাঘিনীর লাশ ঘোরাল। হাম্মাদ, রত্না, বীনা ও সেবারাম যখন রাতের খাবার গ্রহণ করছিল তখন হিন্দুরা বাঘিনীর লাশ দেখে বলে চলছিল, ও মানুষ, না অবতার। বোধহয় ওর দেহে অসুরের শক্তি।

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ

পরদিন।

রত্নাকে নিয়ে হাম্মাদ সুধানীর ছাড়ল। আমু দরিয়ার উপকুল ধরে নিশাপুরের উদ্দেশ্যে ওদের ঘোড়া ছুটল। ঝিলাম ও চেনাব নদী অতিক্রম করে সিন্ধু নদের অববাহিকায় এল। তখন সময়টা খুব স্রোতের। সিন্ধু নদ পাড়ি দেয়া তাই খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। রত্নার হাতে উভয় ঘোড়ার লাগাম দিয়ে হাম্মাদ পাঞ্জা লাগানো রশি নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। উদ্দেশ্য পাঞ্জা নিক্ষেপ করে ওপারের কোন গাছের সাথে বেঁধে সেটা অবলম্বনে নদী পার হওয়া। হাম্মাদ নদীর কিনারে এসে সজোড়ে রশিটি নিক্ষেপ করল। রশির মাথায় লাগানো পাঞ্জা ওপারের একটি গাছে বিঁধল। হাম্মাদ রশি ধরে নদী পার হয়ে গেল। পরে পার হল রত্না। শীত ও ভয়ে রত্না কাঁপছে। খর স্রোতা নদী পার হবার অভিনব পদ্ধতি ওর জীবনে এই প্রথম। ওপারে এসে পরে ঘোড়া দুটো পার করে হাম্মাদ পাঞ্জা গাঁথা রশি খুলে নিল। পরে ওরা নিশাপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল। একে একে ওরা অতিক্রম করল চাতরাল, বাগরাম, মাজার-ই শরীপ, মায়মানা, তাখতা বাজার, সারখিস ও মাশহাদ।

দুই:

সারাদিনের সফর শেষ করে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। এমনি এক মুহূর্তে নিজের বাড়ীর দরজার কড়া নাড়ে হাম্মাদ। দরোজা যায় খুলে। দরজার ওপাশে দেখা যায় হাসানকে। হাম্মাদকে দেখামাত্রই হাসান অগ্রসর হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে। বলে, এতদিন কোথায় ছিলেন ভাইয়া!! পরক্ষণে পেছনে ফিরে চিৎকার দিয়ে বলে, 'মা! মা!! দেখ কে এসেছেন। হাবেলীর ভেতর আঙিনায় রত্না ও হাম্মাদ এসে দাঁড়াল। সেখানে দেখা গেল বৃদ্ধ খালদুন ও হারেসকে। যাবীব ওদের মা' লাঠি হাতে দাঁড়ালেন খানিকটা পেছনে। হাসানের কাঁধে ভর দেওয়া তিনি। সর্বাগ্রে হারেস হাম্মাদের সাথে কোলাকুলি করল এরপর খালদুন সবশেষে মা।

নতুন পরিবেশ নতুন দেশে রত্না নিজকে খুবই অপরিবর্তিত মনে করে শরমে কুকড়ে গেল। সে হাম্মাদের পেছনে পালাতে চেষ্টা করছিল। হাম্মাদ কোন প্রকার রাখঢাক না রেখে রত্নার পরিচয় তুলে ধরল সকলের সম্মুখে। যাবীব বড় চোখ করে রত্নার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন। তার নিরীক্ষণের মধ্যে অনেক কিছু ছিল। তিনি কোন প্রশ্ন করার আগে হাম্মাদ বলল 'মা! তুমি ওর ব্যাপারে আরো কিছু জানতে চাইছ— এই তো। ও কি কারনে, কি পরিস্থিতির শিকার হয়ে ভারতবর্ষ ছেড়ে নিশাপুর এসেছে তা ওর কাছে শুনে নিও।'

হাসান মুচকি হেসে সামনে অগ্রসর হল। ও কোন দুষ্টুমির ফন্দি আঁটছে বলে মনে হল। আগে বেড়ে কানে কানে হাম্মাদকে বললো, 'কি ভাইয়া! তাঁকে আমাদের ভাবীকে এই বাড়ীর কর্ত্রী বানিয়ে এনেছেন বুঝি।'

হাম্মাদ হাসানের কান পাকড়ে বলল, 'ওরে দুষ্টু! বাড়ীতে বসে এগুলো শিখেছ এতদিনে।

হাসান কৃত্রিম রাগ করে বলল, 'জিনা ভাইয়া। খালি এগুলোই শিখিনি। মা আমাকে মুহাম্মদ ঘুরীর দলে শামিল হয়ে যুদ্ধ করতে পাঠিয়ে ছিলেন। আমিও হারেস তরাইনের প্রথমযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। ওই যুদ্ধে দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা পরাস্ত হয়েছি। ওই যুদ্ধ থেকে আমরা অনেক কিছু শিখেছি।'

হারেসকে লক্ষ্য করে হাম্মাদ বলল, 'সত্যিই কি তোমরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলে?'

'হ্যাঁ ভাইজান। ও আমি দু'জনই তরাইনের প্রথম যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। বাড়ীতে যে পরিমাণ দুষ্টুমিতে পারঙ্গম রণাঙ্গনেও সেই পরিমাণ পারদর্শীতা দেখিয়েছে ও। ওর যুদ্ধ পারঙ্গমতা দেখে আমি যারপর নাই হতবাক হয়েছি।'

এসময় মা বললেন, 'কি হোল! তোমরা ওদের দুজনকে কথায় আটকে ফেলেছো। দেখছ না ওরা কতটা ক্লান্ত। ভেতরে নিয়ে বসতে দাও।'

হারেস ও হাসান ঘোড়া দুটি আস্তাবলে নিয়ে গেল। হাম্মাদ ও রত্নার হাত ধরে মা ভেতরে এলেন। খালদূন ছিলেন ওদের পেছনে। সকলে এসে প্রসস্ত হল ঘরে বসলেন। হারেস ও হাসান ঘোড়া বেধে ওখানে এল দ্রুতই।

খালদূন এবার গম্ভীরভাবে হাম্মাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেটা হাম্মাদ! তুমি কি রত্নাকে বাড়ী রেখে যেতে এসেছ নাকি।'

হাম্মাদ কথার মাঝখানে বলল, 'আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য শুধু রত্নাকে রেখে যাওয়া নয় বরং যত দ্রুত সম্ভব সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ করা। কাল সকালেই আমাকে গজনীর উদ্দেশ্যে ছুটতে হবে।

হারেস বলল, 'ভাইজান! আমরা দু'ভাইও গজনী থেকে এসেছি। কাজেই আপনাকে কদিন থেকে গেলে হয় না। পরে না হয় তিন ভাই একসাথেই গজনী গেলাম। হাম্মাদ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানপূর্বক বলল, 'সুলতান আমাকে জরুরীভাবে তলব করেছেন। তাই আমাকে এখানে দেরী করা সম্ভব নয়। তোমরা পরেই এসো।'

এ সময় মা বললেন, 'হাম্মাদ! বেটা! তুমি চটের পোষাক ছেড়ে দিয়েছ কী! তাহলে কি আমাকে মনে করতে হবে হিন্দুস্তানে গিয়ে তুমি দেহবিলাসী হয়ে গেছ। অথচ আমার লাগাতার অনুরোধ সত্ত্বেও তোমার দেহ থেকে ওই পোষাক নামাতে পারেনি।' না মা! এমন কোন কারণ ঘটেনি। তবে পোষাকের এই পরিবর্তনের কারণ আপনাকে রত্নাই বলবে।'

দাঁড়ানো অবস্থায়ই মা বললেন, 'তোমরা কথা বলতে থাক, আমি খানা তৈরি করি। বলে তিনি রত্নার হাত ধরে বললেন, এসো মা তুমি আমার সাথে।

তিনি রত্নাকে নিয়ে চলে গেলেন। খালদূন ও তার তিন পুত্র আলাপে মশগুল হল।

তিন.

পরদিন সকালের নাশতা সেড়ে গজনীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল হাম্মাদ। হারেস ও হাসান ওর ঘোড়া প্রস্তুত করেছিল। হাতিয়ার নিয়ে হাম্মাদ মায়ের কাছে এল। তিনি রান্না ঘরে রত্নার সাথে কথা বলছিলেন। মাথা নীচু করে হাম্মাদ বললো, 'মা এবার আমায় বিদায় দাও। আমার প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি। মা সস্থানে থেকেই বললেন, রত্নাকে নিয়ে তুমি দেওয়ান খানার দিকে যাও। তোমার বাবাকে ওখানে পাবে। আমি রত্নার মুখে তোমার পুরো কাহিনী শুনেছি। তুমি ওদের জানমাল ইজ্জত-আব্রু হেফাজত করেছ জেনে যারপর নাই খুশী হয়েছি। আমি জানি তোমরা একে অপরকে পছন্দ কর। হায়! তুমি যদি আর দুটো দিন থেকে যেতে। আহা! আমি যদি তোমাদের শাদীটা সেড়ে ফেলতে পারতাম।'

হাম্মাদ নিরুত্তর। মা লাঠিভর করে চলে গেলেন। রত্না হাম্মাদের আপদমস্তক নিরীক্ষণ করতে লাগল। অতঃপর গোমরা মুখে বলল, 'আপনি ফিরছেন কবে।'

'জানি না। সুলতান আমাকে কোথায় পাঠাবেন তাও জানিনা। জানিনা তিনি আমার দ্বারা এবার কী কাজ নেবেন। হতে পারে আমি খুব শীঘ্র ফিরব। আবার এও হতে পারে যে, আর ফিরবই না।' রত্না চমকে ওর মুখে আংগুল রেখে বলল, আল্লাহ আপনাকে প্রতিটি পদক্ষেপেই কামিয়াব করেন। অস্তিত্বের প্রতিটি ক্ষনে আমার মন আপনার মঙ্গল কামনায় বিভোর থাকবে। দেশ জয়ের প্রতিটি মনজিলে যেন একথা ভুলে না যান যে, নিশাপুরের এক নিভৃত প্রকোষ্ঠে আল্লাহর এক বাঁদি আপনার পথ চেয়ে বসে আছে।' শেষের দিকের কথাগুলো বলতে গিয়ে রত্না কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। ওর দু'গাল বেয়ে নামল অশ্রুবন্যা। বলল, 'আমার বাবা, মা ভাই, কেউই নেই এ জগতে। আমার স্মৃতি আপনার মনে জাগরুক থাকলে মনে করব আমি নিঃসঙ্গ নই।

'রত্না! রত্না! তুমি কাঁদছ। পাগলী কোথাকার। তোমাকে আমি ভুলে থাকব–একথা কল্পনা করলে কী করে। তুমি আমার ভাগ্যাকাশের সুরাইয়া সেতারা, জীবন চলার প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্মৃতির এ্যালবামে তোমার নাম থাকবে।' বলল হাম্মাদ। রত্না অগ্রসর হয়ে ওর কাধে মাথা রেখে বলল, 'এক্ষনে আমি কিছুই চাই না। আপনি যেখানেই থাকুন না কেন আমি জানব আপনি আমার। আর যাই হোক আমি আপনাকে আল-বিদা জানানোর দুঃসাহস রাখি ; আসুন দেওয়ান খানায় চলুন। সকলেই আমাদের অপেক্ষায়।

রত্না ওর খাদ্য ও পাথেয় তুলে দেওয়ান খানার দিকে রওয়ান হোল। পথিমধ্যে হাম্মাদ জিজ্ঞাসা করল, 'আমার মায়ের ব্যবহার কেমন লাগল তোমার কাছে?' 'এক মেয়ের সাথে তার গর্ভধারিনী যেমন তেমনই, বলল রত্না। তার মমতা দেখে আমি আমার আপন মায়ের কথাই ভুলে গেছি।'

দেওয়ান খানায় এসে আগ-পিছ করে ওরা ঢুকল। ওখানে খালদুন, হারেস সকলেই ওদের অপেক্ষায় ছিল। কামরায় ঢুকেই হাম্মাদ বলল, 'বাবা! আমাকে রওয়ানার অনুমতি দিন।'

খালদূন দাঁড়িয়ে গেলেন। হাসানকে লক্ষ্য করে বললেন, 'হাসান! তুমি আস্তাবল থেকে হাম্মাদের ঘোড়া দেউড়ির বাইরে নিয়ে যাও। বলে তিনি হাম্মাদের হাত ধরে দেওয়ান খানা থেকে বেরোলেন। রত্না, হারেস ও মা ওদের পিছু নিলেন। রত্না ওদের মাকে ভর করে বাইরে নিয়ে এল।

হাম্মাদ ঘোড়ার লাগাম হাতে নিল। বাবা বললেন, 'হাম্মাদ! হাম্মাদ! বেটা আমার। জানি না কি উদ্দেশ্যে সুলতান তোমায় ডেকেছেন। তবে আমার মন বলছে কুরদত তোমাকে মহান কোন কাজে গজনী নিয়ে যাচ্ছেন। খুব সম্ভব এবার তোমার গায়ে সৈনিক এর পোষাক ঝুলতে যাচ্ছে। বেটা আমার! তুমি সৈনিক হলে সেনাপতির সাথে ভাল ব্যবহার কর। কখনও কোন নসীহত হাসেল করতে চাইলে পিপীলিকার থেকে হলেও শিখে নিও। লজ্জাবোধ করো না। পিপড়ার প্রতিজ্ঞা দেখো, শীত গ্রীষ্ম সব ঋতুতেই সে খাদ্য-খাবার গুছিয়ে রাখে ভবিষ্যতের জন্য। সর্বদা গোনাহর থেকে দূরে থেকো। জীবনের মূল সম্পদ হচ্ছে চরিত্র আর সুস্থতা বেঁচে থাকার অবলম্বন। মত্তা ও অল্পেতুষ্টি মানবতার মূল শিক্ষা। কপটতা থেকে সতর্ক থেকো। চুরি করা পানি মিষ্ট। হারাম খাদ্য মজা লাগে বৈকি তবে এথেকেও তোমাকে দূরে থাকতে হবে। যে কাজে সৃষ্টিকর্তার অসন্তুষ্টি নিহিত সে কাজ থেকে সযত্নে দূরে থেকো। আমাদের রব দুষ্টুমি ও নোংরামি মুক্ত। আমার সকাল-সন্ধ্যার দোয়া থাকবে খোদা তোমাকে জীবন চলার হার মঞ্জিলে একজন পাক্কা ঈমানদার রাখেন। তোমার পথ কন্টকমুক্ত হোক, মন প্রফুল্ল থাকুক-সে দোয়াও করি। তোমার জেহাদী চেতনা জাগরুক থাকুক, জোশ— জযবা অম্লান হোক।'

থামলেন বাবা। মা বললেন, 'বাবার কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করো। এবার তোমার বিদায়ের পালা। আল্লাহ তোমায় কামিয়াব করেন। রত্নার মনের অবস্থা ঝরা পাতার মত, মুখ পাংশু। ওর সুন্দর হাসিতে নেই দ্যুতি। হাম্মাদ হাত উঁচিয়ে সবাইকে বিদায় জানায়। সকলের চোখে পানি। পানি রত্নার চোখেও।

চার.

এর বেশ কদিন পর।

গজনীর ফৌজি ছাউনীতে এসে হাম্মাদের ঘোড়া থামল। দৃষ্টির শেষ সীমায় কেবল তাবু আর তাবু। এর দ্বারা সহজেই অনুমেয় যে সুলতান শেহাবুদ্দীন মোহাম্মদ

ঘুরী প্রতিশোধ নেয়ার জন্য কতটা উন্মুখ। কতটা জংগী প্রস্তুতি তাঁর। সাড়ি সাড়ি তাবুর মাঝে প্রশস্ত খোলা ময়দানে লড়াকু সৈনিকদের মহড়া চলছে পুরোদস্তুর।

হাম্মাদ জনৈক সেপাইকে সুলতানের অবস্থান জিজ্ঞাসা করল এবং আগে বাড়তে লাগল। ও কদ্দুর অগ্রসর হতেই কে যেন উঁচু আওয়াজে ডাকল, 'হাম্মাদ! হাম্মাদ!!'

এ আওয়াজ হাম্মাদের কাছে পরিচিত। ইনি কুতুবুদ্দীন আইবেক। হাম্মাদকে দেখেই তিনি সোৎসাহে ডাক দেন। তাঁকে দেখামাত্রই হাম্মাদ ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। বাড়িয়ে দিল মোসাফাহার জন্য দু'হাত কিন্তু আইবেক তাঁর দু'হাত পেছনে নিয়ে গেলেন। মোসাফাহার বদলে ওর সাথে করলেন উষ্ণ আলিঙ্গন। বললেন, 'খালদুনের বেটা হে! তুমি আমার মহাপোকারী। আর দশজনের মত সর্বাগ্রে তাই তোমার সাথে মোসাফাহা চলে কি।'

আলিঙ্গন শেষে কুতুবুদ্দীন আইবেক হাম্মাদের হাত ধরা অবস্থায় বললেন, 'হাম্মাদ! বেশ কদিন ধরে এখানে তোমার আলোচনা। সুলতান শেহাবুদ্দীন ঘুরী প্রতিদিন তোমার কথা জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, 'হিন্দুস্থান থেকে নিশাপুরের দুরন্ত ঈগল কবে আসবে।' কথা শেষ না করে তিনি ইশারায় জনৈক সেপাইকে ডেকে বললেন, 'ইনি হাম্মাদ বিন খালদুন। তার ঘোড়া আমার শাহু আস্তাবলে নিয়ে যাও। ওর দানা পানির এন্তেযামও কর।'

ওকে নিয়ে তিনি অগ্রসর হতে লাগলেন। মহড়াস্থানের ডান পাশে একটি লাল তাবুর কাছে এসে দাঁড়ালেন তিনি। নাঙ্গা তলোয়ার উঁচানো দেহরক্ষীরা সটান হয়ে দাঁড়াল। এরা সবাই সুলতানের দেহরক্ষী। তিনি দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধানকে বললেন, 'সুলতানকে আমার আগমনী জানাও। এবং বলো তার সাথে রয়েছেন হিন্দুস্থান থেকে আগত নিশাপুরের দুরন্ত ঈগল।'

দেহরক্ষী ভেতরে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর তিনি ফিরে এলেন এবং আইবেককে বললেন, 'সুলতান আপনাদের দু'জনকেই ভেতরে ডেকে পাঠিয়েছেন। উভয়ে ভেতরে প্রবেশ করল। সুলতান শেহাবুদ্দীন চটের গদির ওপর উপবিষ্ট। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আইবেককে কাছে বসিয়ে হাম্মাদকে লক্ষ্য করে বললেন, হিন্দুস্থান থেকে আবুল ফাতহ তোমার প্রতিটি খবর আমাকে দিয়েছে। শোকর খোদার। তুমি আমাকে নিরাশ করোনি। যে আশা তোমার থেকে করেছিলাম তা পুরোপুরি সমাধা করেছ। তুমি মথুরা থেকে আইলাক খানকে উদ্ধার করেছ। জাতির এক তরুণীকে নগরকোট মন্দির থেকে বের করেছ। সবচেয়ে যে জিনিষটা আমাকে বিস্ময়াভিভূত করেছে, তাহলো তুমি পৃথ্বিরাজের কন্যার স্বয়ম্বরা জিতেছ। তুমি স্রেফ একটি তীর উঠিয়ে পৃথ্বিরাজকে চমকে দিয়েছ অতঃপর তার বন্দীদশা থেকে নিজকে ছাড়িয়ে আনতে পেরেছ।'

হাম্মাদ মাথা নীচু করে বলল, 'আফসোস আমি আইলাক খানকে হেফাজত করতে পারিনি। নয়ত আজ আমার সাথে দেখতেন তাকেও।'

'কওমের এক আত্মাভিমানী সন্তানের ভাগ্যে যা ছিল তাই হয়েছে। কাজেই তুমি তাকে সাহায্য করবে কী করে?' এক বুক হতাশা নিয়ে বললেন সুলতান।

বেশ কিছুক্ষণ নীরবতায় কাটল চর্মনির্মিত শাহী খিমা। অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করে সুলতান বললেন, 'জানো তোমাকে হিন্দুস্থান থেকে কেন ডেকে পাঠিয়েছি? তরাইনের প্রথম যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে আমরা হিন্দুস্থানী রাজা বাদশাহদের শক্তির দৌরাত্ম্য অনুধাবন করতে পেরেছি। কাজেই এক্ষণে হিন্দুস্থানে তোমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। আমাদের পরাজয়ের প্রধান কারণ হিন্দুস্থানী বাহিনীর হাতিবহর। ওগুলো আমাদের বাহিনীতে ভীতির সঞ্চার করেছে। এছাড়া আমাদের কিছু জেনারেলের হীনমন্যতা ও কাপুরুষতাও কম ভোগায়নি। আমি ত্বড়া করেই এ পরাজয়ের কালিমা মুছে ফেলতে চাই। আমি তোমাকে অগ্রগামী বাহিনীর সেনাপতি বানাতে চাই। তোমার অধীনে ৪০ হাজার সওয়ার থাকবে। আসন্ন যুদ্ধে কুতুবুদ্দীন আইবেকও তার মধ্যবাহিনীসহ আমার পাশে থাকবে। বাম বাহুতে থাকবে আরো জেনারেল।

আসন্ন যুদ্ধের মহড়ায় আমি বেশী সময় নেয়ার পক্ষপাতি নই। তুমি তোমার অধীনস্ত প্রতিটি সৈন্যকে এভাবে প্রশিক্ষণ দেবে যাতে তারা হাতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। আমি ওদের এমনভাবে পরাভূত করতে চাই যার কল্পনাও করতে পারে না ওরা।'

হাম্মাদ সীনাটান করে বলল, 'আলীজাহ! আপনি নিশ্চিত হোন। ভরসা রাখুন। আসন্ন যুদ্ধে আমি আপনাকে নিরাশ করব না। হিন্দুস্থানের হাতি কাবা শরীফে হামলাপ্রবণ আবরাহার হাতির মতই প্রমাণিত হবে। ওদের হাতি ওদেরই ক্ষতি করবে— সেই পদ্ধতিই আমি অবলম্বন করব।'

'আমাদের হাতে এক্ষণে গজনীর কিছু হাতি রয়েছে এদ্বারাই তুমি প্রশিক্ষণ দিতে পার। কুতুবুদ্দীন তোমাকে সাহায্য করবে এবং উপকরণ যোগাবে। এছাড়া আমিতো রয়েছি-ই। এক্ষণে তুমি গিয়ে আরাম কর। আগামীকাল থেকেই তোমার মহড়া শুরু কর। কয়েকদিনের মধ্যে তোমার যুদ্ধ নৈপুণ্যের আন্দায করতে পারব বলে আমি মনে করি। তুমি এখানে আসার পূর্বেই তোমার বাসস্থানের ব্যবস্থাদি করে রেখেছি।' বললেন সুলতান মুহম্মদ ঘুরী।

হাম্মাদ ও কুতুবুদ্দীন উঠে দাঁড়াল। সুলতানের সাথে মোসাফাহা করে খিমা থেকে গেল বেরিয়ে।

পাঁচ.

হাম্মাদকে নিয়ে কুতুবুদ্দীন একটি খিমার কাছে এলেন। বললেন, 'এই খিমায়-ই তুমি থাকছ। এখন আমার খিমায় চল। ওখানেই আমরা খানা খাব।' কুতুবুদ্দীন আইবেক জনৈক সেপাইকে খানা আনতে বললেন। পরে তিনি হাম্মাদের উদ্দেশ্যে

বললেন, তোমার সৌভাগ্য হাম্মাদ! সুলতান তোমাকে ঈর্ষনীয় এক পদে আসীন করেছেন। সুলতানের জীবনে কাউকে পরখ না করে এতবড় পদে নিয়োগদান এই প্রথম, তিনি তোমার প্রতি অন্ধ বিশ্বাসী-ই বলতে পার।'

হাম্মাদ বিনয়বশতঃ বলল, 'আমি জানি, এ পদের যোগ্য নই। সুলতান আমার প্রতি অগাধ আস্থা রেখে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা পালন করতে যারপরনাই চেষ্টা করব। নিশাপুরের চুনা ফ্যাক্টরীর সামান্য এক কামলা আমি। আমাকে অগ্রগামী বাহিনীর প্রধান করে সুলতান যমীনকে আসমানে উঠানোর মত কাজটা করেছেন।'

কুতুবুদ্দীন আইবেক বললেন, 'নিজকে এত ছোট ভাবছ যে। মানুষ ছোট থেকেই তো বড় হয়। আমার জীবন কাহিনী জানো কিনা জানি না। তবে আমারটা তোমার চেয়েও কম কৌতুহলী নয়। আমি তখন ছোট। জনৈক সওদাগর আমাকে তুর্কিস্থান থেকে নিশাপুর নিয়ে এলেন। আমাকে কাজী ফখরুদ্দীন ইবনে আব্দুল আজীজের কাছে বিক্রী করে দিলেন। এই কাজী ইমাম আবু হানিফার বংশের। তিনি আমাকে ক্রীতদাস হিসাবে রাখলেন না বরং সর্বদা আমার সাথে পুত্র সুলভ ব্যবহার করে গেলেন। এমনকি তার পুত্রদের মত আমাকে শিক্ষা দীক্ষায় বড় করে তুললেন। তার অধীনে থেকেই আমি ইসলামের সব শিক্ষাদিকগুলো রপ্ত করেছি।

কিন্তু ভাগ্য আমার সুপ্রসন্ন ছিল না বলতে পার। কাজী ফখরুদ্দীনের মৃত্যু আমার জীবনে আবারও বিপদ ডেকে আনল। তাঁর পুত্ররা আমাকে জনৈক সওদাগরের হাতে বিক্রী করে দিল। ওই সওদাগর আমাকে তোহফা স্বরূপ সুলতান শেহাবুদ্দীন মোহাম্মদ ঘুরীর সামনে পেশ করল। এই তোহফার বিনিময়ে সুলতান ওই সওদাগরকে মোটা অংকের নজরানা দিতে ভুল করলেন না। এভাবেই আমি সুলতানের ছায়াতলে আশ্রয়লাভে ধন্য হই। আমার হাতে কনিষ্ঠাংগুলি যেহেতু ভাঙ্গা এজন্য সকলেই আমাকে আইবেক নামে ডাকা শুরু করে। সুলতানের বাহিনীতে আমি এমন কিছু সফলতা দেখাই যদ্দরুন তার প্রধান জেনারেলদের অন্যতম আজ আমি।'

হাম্মাদ কিছু বলতে যাবে এ সময় খানা এসে হাজির। অতঃপর দু'জনে খানায় লেগে যায়। হাম্মাদের আর কিছু বলা হয় না।

ছয়.

দিগন্তপ্রসারী ধুলিঝড় উড়িয়ে দুটি ঘোড়া গজনীর জংগী খিমার সামনে এসে দাঁড়াল। ওই দুটি ঘোড়া এক সময় মধ্য খিমার দিকে এগুতে লাগল। ওদের ঘোড়ার গতি তখন মন্থর। একটি খিমার সামনে এসে ওরা ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। হারেস ও হাসান ওই দুই সওয়ার। খিমার খুটিতে ঘোড়া বেঁধে ওরা ভেতরে প্রবেশ করল। খিমার ভেতরে ক'জোয়ান কোথাও যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। হারেস ও হাসানকে দেখে ওরা পরস্পরে কোলাকুলি করল।

এই খিমা হারেস ও হাসানের জন্য নির্ধারিত। ওরা গজনীর বাহিনীতে বহু পূর্ব হতে শামিল ছিল। তরাইনের প্রথম যুদ্ধে ওরা শরীক ছিল। ওরা ওদের মালমাত্তা খিমার কোনে রাখছিল। খিমার সাথীদের লক্ষ্য করে হারেস বললো, 'তোমরা কোথায় যাবার প্রস্তুতি নিতেছ?'

'আমরা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যাবার এরাদা করেছি। কদিন পূর্বে আমাদের অগ্রগামী ফৌজে জনৈক সেনানায়কের নিয়োগ হয়েছে। তিনি হিন্দুস্থানী ফৌজের হাতির আক্রমন প্রতিহত করার কৌশল রপ্ত করার মহড়া দেবেন। তিনি প্রথমে কৌশল রপ্ত করাবেন। আজ কিছু জোয়ান তার সাথে প্রশিক্ষণ নেবেন। তোমরাও আমাদের সাথে চলো। আজ সমগ্র বাহিনীকে মহড়া কেন্দ্রে জমায়েত হতে বলা হয়েছে। খোদ সুলতান নিজেই উপস্থিত থেকে এই মহড়া পরিদর্শন করবেন।' বলল জনৈক সেপাই।

সাথীদের কথা মত হারেস ও হাসান ওদের সাথে বেরোল।

সেনাপতিরা ছাড়াও শহরের বহু গণ্যমান্য মানুষ এই মহড়া দেখতে সমবেত হয়েছেন। গজনী শহরের সকলেই মহড়ায় অংশ নিতে চেয়েছিল কিন্তু অনুমতি পাওয়া যায় নি। আগত মানুষেরা সুলতান শেহাবুদ্দীন মোহাম্মদ ঘুরীর খালি আসনের দিকে বারবার মাথা উঁচিয়ে তাকাচ্ছে। সুলতান তখনও আসেননি। সুলতানের সিংহাসনের আশে পাশে দশটা হাতি মাহুতসহ উপস্থিত।

খানিক বাদে দেহরক্ষীসহ সুলতানকে ময়দানের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। সুলতান এসে সরাসরি সিংহাসনে আরোহন করলেন। তার সাথে হাম্মাদ ও আইবেকসহ বেশ কজন জেনারেল। তারা সুলতানের পেছনে সারিবদ্ধ চেয়ারে উপবেশন করলেন। হাম্মাদ যথাসময়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে সুলতানের কাছে মহড়া শুরু করার অনুমতি প্রার্থনা করল। সুলতান মুচকি হেসে অনুমতি সূলভ মাথা হেলালেন। হাম্মাদ ময়দানে নেমে পকেট থেকে শুভ্র-সফেদ রুমাল বাতাসে ছুঁড়ে মারতেই জনা ত্রিশেক সওয়ার এগিয়ে এল।

হাম্মাদ আবারও একটা রুমাল ছুঁড়ে মারল। এবার পদাতিক জনাত্রিশেক এগিয়ে এল। সকলেই ময়দানে এসে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াল। হাম্মাদ শূন্যে হাত ওঠাল। সংগে সংগে ত্রিশজন সওয়ারের ঘোড়া সচকিত হয়ে ওঠল। ঘোড়াগুলোর গতি পদাতিক সৈন্যদের দিকে। ময়দানের বিপরীতে দাঁড়ানো পদাতিক সৈন্যরা সওয়ার সৈন্যদের ঘোড়া থেকে ফেলে নিজেরাই ওই ঘোড়াগুলো দখল করে নিল।

এবার ময়দানে দু'সেপাই হাম্মাদের ঘোড়া নিয়ে এল। হাম্মাদ ওদের থেকে ঘোড়া বুঝে নিয়ে তাতে সওয়ার হোল। এগিয়ে গেল সওয়ারদের কাছে।

হাতির সাড়ির পেছনে হারেস ও হাসানের অবস্থান। ওদের পেছনে জনৈক সৈনিক বুক ফুলিয়ে বলছিল, বাপের বেটা! হায় তরাইনের প্রথম যুদ্ধে যদি এমন এক জেনারেল আমাদের হাতে থাকত। ইনি আমাদের অগ্রগামী বাহিনীর সেনানায়ক।'

'উনি আমাদের বড় ভাই।'

ওই সৈনিক ঠাট্টা করে বলল, তোমার ভাইতো এই।'

হাসান বলল,'ওরা দুজনেই আমার চেয়ে বড়। তাঁর নাম হাম্মাদ বিন খালদূন।'

সৈনিক কিছু বলতে চাচ্ছিল কিন্তু খামোশ থাকল, কেননা মাহুতেরা হাতি চালানো শুরু করে দিয়েছে ইতোমধ্যে। প্রথমে একটি হাতি ময়দানে নামল। হাম্মাদ তিন সওয়ারকে হাতির সামনে পেশ করল। মাহুত হাতির পিঠে বসা অবস্থায়ই সওয়ারদের ওপর হামলা করল। হাতি এসে এদের সকলকে ঘিরে নিল। শুঁড় দিয়ে এদের পেঁচাতে চাইল। হাম্মাদ এবার শুঁড়ের সামনে ঢাল রাখল। হাতি ঢাল ছিনিয়ে নিতে চাইল। এ সময় সওয়াররা হাতির শুঁড় তলোয়ার দ্বারা কেটে ফেলল। শুঁড় কাটা হাতি মাহুতের নির্দেশে পেছনে সড়ল। এবার ময়দানে জমায়েত সওয়াররা এক যোগে হাতির ওপর হামলা করল। হামলা করা ও হাতির শুঁড় কাটার প্রথম মহড়া এবারও প্রদর্শিত হল।

হাতিগুলো ময়দান থেকে বেরিয়ে গেল। সুলতান ও কুতুবুদ্দীন আইবেক স্ব-আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। সুলতান হাতের ইশারায় হাম্মাদকে ডেকে নিলেন। হাম্মাদ দ্রুত তাদের কাছে এসে দাঁড়াল। সুলতান খুশী হয়ে বললেন, তুমি মহড়ায় যা দেখালে তাতে আমি নিশ্চিত যে, হিন্দুদের হাতি তুমি প্রতিহত করতে পারবে।

হাম্মাদ গৌরবদীপ্ত কণ্ঠে বলল, 'তিন তিন জোয়ান এক একটি হাতির মোকাবেলা করবে। একজন একেবারে হাতির সামনে থাকবে, যাতে হাতি তার ওপর হামলা করতে এগুবে। তার ওপর হামলাপ্রবণ হতেই ডান বামের দুজন অগ্রসর হয়ে হাতির শুঁড় কেটে দিবে। এ কাজে দুজনই যথেষ্ট। তবে তিনজন নেয়ার কারণ হলো মাহুত আক্রমণ করলে তৃতীয়জন যেন তাকে থামাতে পারে।

সুলতান মুহম্মদ ঘুরী সিংহাসন থেকে নামতে নামতে কুতুবুদ্দীন আইবেককে লক্ষ্য করে বললো, তোমার এই পদ্ধতি আমাকে মোহিত করেছে। গোটা ফৌজকেই এইভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে যাও।

সুলতান তার শাহী খিমায় চলে গেলেন। হাম্মাদ ঘোড়ার পিঠে চাপতে যাবে এসময় পৃষ্ঠদেশে কারো হস্তস্পর্শে ও চমকে ওঠল, 'ভাইজান! ভাইজান!। হাম্মাদের ঘোড়ার পিঠে চড়া হোল না। ঘাড় ফিড়িয়ে ও দেখল হারেস ও হাসান দন্ডায়মান। তড়া করেই ও একে একে দু'ভায়ের সাথে আলিঙ্গন করল। বলল, 'তোমরা কবে এসেছ?'

'এই তো আজ!' বলল হাসান। 'আসা মাত্রই আপনার মহড়ায় শরীক হয়েছি।'

'তোমাদের ঘোড়া কৈ?' প্রশ্ন হাম্মাদের

'আমাদের নির্ধারিত আস্তাবলে।' বলল হারেস।

'আব্বাজান ও আম্মিজান কেমন আছেন?' হাম্মাদ প্রশ্ন করে। হারেস উত্তর দিতে যাবে এই মুহূর্তে হাসান বলে ওঠে, 'হ্যাঁ ভাইজান! রত্নার দেয়া একটা পত্র আছে আমার কাছে।'

'ভাইজান! পত্রটা রত্না আমার কাছেই দিয়েছিল। কিন্তু দুষ্টটা পথিমধ্যে ছল করে আমার থেকে নিয়ে নেয় ও বলে, আমিই ওটা ভাইজানের কাছে দেব।' হারেসের কণ্ঠে অভিযোগের সুর।

হাম্মাদ গদ গদচিত্তে বলল, 'সে চিঠি হয়ত পড়ে নিয়েছে পথিমধ্যে।'

হাসান গম্ভীর হয়ে গেল। নরম সুরে বলল, 'এ ধারণা আপনার হোল কী করে ভাইজান! আমি হারেস ও আপনার সাথে ঠাট্টা করি ঠিকই কিন্তু আমাদের এক প্রিয় বোনের চিঠি কি করে পড়ি বলুন তো। তাও আবার আমাদের ভাইজানের নামে লেখা।'

হাম্মাদ একথায় গলে গেল। আগে বেড়ে হাসানের কপালে চুমু খেয়ে বলল, 'আরে আমিও তো তোমাকে ঠাট্টাস্বরূপ এ কথা বলেছি। কসম খোদার তুমি ওই পত্র পড়ে ফেললেও আমার কোন আপত্তি থাকত না' বলে হাম্মাদ হাসানের হাত থেকে রত্নার দেয়া পত্র হস্তগত করল।

পরক্ষণে হাত ধরাধরি তিনভাই খিমার দিকে চলল। বলল, 'চলো তোমরা আমার সাথেই চল।

হাসান বলল, 'ভাইজান! আম্মিজান ও রত্না আপা আপনার জন্য কিছু খাবার পাঠিয়েছেন। আমরা সেগুলো খিমায় রেখে এসেছি। আমি উহা কি এখনি গিয়ে নিয়ে আসব!

'না! পরে আনলেও চলবে। তিনভাই হাম্মাদের খিমার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হোল। হাসান পথিমধ্যে আর কোন কথা বলল না। এক সময় ওরা অগ্রগামী বাহিনীর সেনাপতির খিমায় প্রবেশ করল।

সাত.

সুলতান মোহাম্মদ ঘুরী তরাইনের প্রথম যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি অতি দ্রুত কাটিয়ে ওঠলেন। প্রথম যুদ্ধের পরাজয়ের কারণ বের করে দুষ্টক্ষতকে তিনি সমূলে সাড়িয়ে নিলেন। যেসব কাপুরুষ ও হীনমন্য জেনারেল রনে ভঙ্গ দিয়েছিল তিনি তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিলেন। জেনারেলগণ আসন্ন যুদ্ধে জানবাযী রেখে লড়াই করবেন এ শর্তে এ যাত্রা প্রাণে রক্ষা পেলেন। সুলতান এদের মাফ করার পক্ষপাতি ছিলেন না কিন্তু জনৈক বুড়ো অভিজ্ঞ জেনারেল এদের হয়ে সুপারিশ করায় সুলতান কিছুটা নমনীয়ভাব প্রদর্শন করেন।

বেশ ক'মাস ধরে চলল তাঁর ভারত অভিযানের প্রস্তুতি। নতুন নতুন সেনা এসে যোগ দিল তার দলে। এদের প্রশিক্ষণ দেয়া হোল পুরোদস্তুর। সেনা সংগ্রহে তাকে মদদ যোগালেন তাঁরই বড় ভাই গিয়াসুদ্দীন। যিনি বাগদিসের গভর্নর। মোট কথা তরাইনের প্রথম যুদ্ধে হেরে সুলতানের ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছিল।

৫৮৮ হিজরীতে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে পরাজয়ের এক বছরের মাথায় সুলতান শেহাবুদ্দীনের জংগী তৈয়ারী পুরোপুরি সম্পন্ন হয়েছিল। ১ লাখ ৭০ হাজার বাহিনী নিয়ে তিনি হিন্দুস্তানের উদ্দেশে গজনী ছাড়লেন। ঝড়ের বেগে তারা সোলেমান পাহাড় অতিক্রম করে মুলতানে এসে উপনীত হলেন। কোন প্রকার যাত্রাবিরতি না করেই লাহোরের পথ ধরলেন।

লাহোরে এসে সুলতান যাত্রাবিরতি করেন। ওখান তিনি জনৈক বুযুর্গ সৈনিক রুকনুদ্দীনকে আজমীর রওয়ানা করান। উদ্দেশ্য রাজা পৃথ্বিরাজকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া। রুকনুদ্দীন আজমীরের রাজ দরবারে প্রবেশ করলে রাজা ইসলাম, মুসলমান ও সুলতানের বিরুদ্ধে ঠাট্টা-অমর্শামূলক কথা বলে তাঁকে আজমীর থেকে বহিষ্কার করেন। ফিরে এসে পৃথ্বিরাজের কথা সুলতানের কানে তোলেন রুকনুদ্দীন। তারকথা শুনে সুলতানের মনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তিনি বলেন, আমি আমার বেইজ্জতি বরদাশ্‌ত করতে পারি, কিন্তু ইসলামের অপমান আমার জন্য সহ্যাতীত। সুতরাং তিনি পৃথ্বিরাজকে কঠিন সাজা দেয়ার কসম করেন।

হিন্দুস্থানের সকল রাজা-মহারাজাবৃন্দ পৃথ্বিরাজের পতাকাতলে স্ব-সৈন্যে আজমীরে জমায়েত হোল। সকলের ঐকমত্যে আজমীর শাসককেই প্রধান সেনাপতি সাব্যস্ত করা হল। নিয়মিত সৈন্য সংখ্যা তাদের ৩ লাখ। হাতির সংখ্যা ৩ হাজার। এই বিশাল বাহিনী তরাইনের প্রান্তরে উপনীত হল। এদিকে লাহোর থেকে তরাইনের মাঠে উপনীত হন সুলতান মোহাম্মদ ঘুরিও।

পৃথ্বিরাজ একবার যেহেতু ঘুরীকে পরাস্ত করেছিলেন সেহেতু তার দুঃসাহস ও অতি উৎসাহের সীমা বেড়ে গিয়েছিল। তাই তিনি যুদ্ধের পূর্বেই ঘুরীকে লক্ষ্য করে একটা পত্র লেখেন। দূত এসে ঘুরীর কাছে পত্র হস্তান্তর করেন। তাতে লেখা, আমাদের সৈন্য বাহিনীর পরিধি ইতিমধ্যে হয়ত আপনার জানা হয়ে গেছে। এরা আপনার নগণ্য বাহিনীকে পিষে মারতে যথেষ্ট। এছাড়া গোটা ভারতবর্ষ থেকে দলে দলে সৈন্য আসছে। তাদের দাপটে কেঁপে ওঠছে ভূ-ভাগ। মিছেমিছি তোমার সেনাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে না দিয়ে গজনী ফিরে যাও। আমরা তোমাদের পথ আগলাব না। অন্যথায় জেনো, আমাদের তিন হাজার হাতি আগামী কালকের মধ্যেই তোমাদের লাশের ওপর বিজয়-নৃত্য করবে।

হিন্দুস্থানের রাজা-মহারাজারা ধারনা করেছিলেন, এ মৃদু ধমকিতে ঘুরী ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়বেন এবং পাততাড়ি গুটিয়ে পালাবেন।

কিন্তু সুলতান তাদের আশার গুড়ে বালি ছিটিয়ে দিলেন। এতে উভয় বাহিনীর জন্য লড়াই আবশ্যক হয়ে দাঁড়াল। তরাইনের লড়াই ইসলাম ও কুফরের চূড়ান্ত লড়াই। তাই আগে ভাগেই সুলতান পৃথ্বিরাজকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে রেখেছিলেন।

আট

স্বরসতী তীরবর্তী তরাইন প্রান্তরে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হল। হিন্দু বাহিনীর সংখ্যা ৩ লাখ ছাড়িয়ে গেল। এই সংখ্যা দৈনিকই বেড়ে চলছিল। জংগী সাজে যেদিন সকলে মুখোমুখি দাঁড়াল এর ঠিক আগের রাতে মোহাম্মদ ঘুরী জেনারেলদের সাথে শুরায় মিলিত হলেন। সেখানে সিদ্ধান্ত নিলেন হিন্দুবাহিনীর আগে ভাগে যেহেতু হাতির বহর সেহেতু হাম্মাদের নেতৃত্বে ৪০ হাজার অগ্রসেনা এদের ওপর চড়াও হবে। হাতি বাহিনীর সাথে টক্কর দেয়াকালীন যখনই সুলতানের ফরমান আসবে তখনই হাম্মাদ পিছপা হবে। এ সময় মধ্যবাহিনী টর্নেডো গতিতে হামলা করবে। একই সাথে ডান-বাম বাহুর তুর্কী জেনারেলগণও অদের বাহিনীসহ পালাক্রমে হামলা করতে থাকবেন। এতে করে একদল যুদ্ধ করবে ততক্ষণে আরেকদল তাজাদম হবে। আর তাজাদম ফৌজের সাথে পালাক্রমে লড়াইরতঃ হিন্দু বাহিনীর শক্তিবাহু ঢিল হয়ে আসতে থাকবে।

পরদিন সকাল বেলা উভয় বাহিনী সারিবদ্ধভাবে জংগী কাতার করে দাঁড়াল। হিন্দু বাহিনীর সামনে তিন হাজার হস্তি বাহিনী। হাতির হাওদায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত রক্তলোলুপ যোদ্ধা। মুসলিম বাহিনীর অগ্রে হাম্মাদের নেতৃত্বে ৪০ হাজার জানবায সেপাই। মাঝে সুলতান ও আইবেক। ডানে বামে তুর্কি ও আফগান জেনারেলবৃন্দ। উভয় বাহিনীর ব্যান্ড দল উত্তেজনার রণ দামামা বাজিয়ে সকলকে উত্তেজিত করে তুলছে।

আচমকা রণ সংগীত থেমে গেল। জনৈক হিন্দুসেনা ঘোড়া হাঁকিয়ে ময়দানে এগিয়ে এল। এবং মুসলিম বাহিনীর উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ল দ্বৈত যুদ্ধের জন্য। উভয় শিবিরেই পীন পতন নিস্তব্দতা। সুলতান স্বয়ং যুদ্ধ ক্ষেত্রে হাজির সেহেতু তার এজাযতের দরকার ছিল না। লৌহমানব হাম্মাদ-ই ওই পৌত্তলিকের চ্যালেঞ্জের জবাবে এগিয়ে গেল। অগ্রগামী বাহিনীর ধারণা ছিল, তাদের-ই কাউকে হাম্মাদ প্রেরণ করবে। কিন্তু তাদেরকে নিরাশ করে খোদ হাম্মাদ-ই এগিয়ে গেল।

আগুয়ান হিন্দুসেনার সামনে গিয়ে হাম্মাদ ঢাল উঁচাল। শুন্যে ঘোরাল তলোয়ার। বলল, নাম কী তোমার? লড়াইয়ের আগে জানতে বড্ড ইচ্ছে, কার সাথে লড়ছি আমি। ঠাট্টাচ্ছলে প্রতিপক্ষ থেকে জবাব এল, তোমার জন্য স্রেফ এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, আমি আজমীরের মহারাজা পৃথ্বিরাজ বাহিনীর উপ-সেনাপতি। তার চেয়ে তোমার পরিচয়টা দাও—এই ভালো। হাম্মাদ বলল, 'খানিক বাদে যখন রক্তপাথারে সাঁতরাবে তখন না হয় আমার পরিচয়টা জেনে নিলে। শোন হে দাম্ভিক! আমি লৌহমানব সুলতান ঘুরীর অগ্রগামী বাহিনীর সেনাপতি। হায়! তুমি না এসে তোমার স্থলে যদি বেটা পৃথ্বিরাজকে পেতাম তাহলে আজই তার যুদ্ধসাধ মিটিয়ে দিতাম।

দাঁতে দাঁত পিষে হিন্দু সেনাপতি বললেন, 'খমোশ! নীচ কোথাকার! তুমি কীরূপে ধারণা করলে মহারাজা তোমার মোকাবেলায় নামবেন। বলে তিনি ঘোড়ায় পদাঘাত করলেন। বিপুল বিক্রমে ঝাপিয়ে পড়লেন হাম্মাদের ওপর।

হাম্মাদও ঘোড়ায় পদাঘাত করল এবং সস্থান হতে সঁড়ে গেল। শুরু হোল হিন্দুস্থানে দ্বিতীয় তরাইন যুদ্ধের তরবারীর ঝনঝনানি। তরবারীর আওয়াজ দুর-দরাজে পৌঁছে গেল। উভয়েই বীর। কেউ কারো চেয়ে কম নয়।

কৌশলগত কারণে হাম্মাদ সামান্য পিছু হটল। এক চক্কর কেটে ঘোড়াকে আবার কোনাকুনিভাবে এগিয়ে আনল। ঘোড়ায় পদাঘাত করে তাকে পাগল করে তুলল। হাম্মাদের উন্মাদ ঘোড়া বিদ্যুৎ গতিতে প্রতিপক্ষের ঘোড়ার ওপর ঝাপ দিল। এই সুযোগে হাম্মাদ প্রতিপক্ষের ওপর মরণ কামড় বসাল। প্রতিপক্ষ এই কৌশলে কাবু হয়ে গেল। হাম্মাদের কোপ তার মাথাকে দেহ থেকে আলাদা করে ফেলল। দিক চক্রাবলে নারায় তকবীর ধ্বনি ওঠল। হাম্মাদ সুস্থে তৃপ্তি সহকারে স্ব-অবস্থানে ফিরে এল।

ময়দানে আরেক হিন্দুসেনা এগিয়ে এল। মুসলিম অগ্রগামী বাহিনীর জনৈক তুর্কী সৈনিক হাম্মাদের নিকটে এসে কাতরস্বরে প্রার্থনাপূর্বক বলল 'আমীর সাহেব! আমাকে এবার ওর মোকাবেলার অনুমতি দিন। ময়দানে নেমে প্রমাণ করতে চাই, মরক্কো থেকে লাহোর পর্যন্ত বিশাল ভূ-ভাগের মুসলিম ঘুমিয়ে নেই। আমীর সাহেব! কসম খোদার! আমাকে এই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করবেন না।'

মুচকি হেসে হাম্মাদ সম্মতি দিল। অনুমতি পেয়ে তুর্কী সেনা বীর বিক্রমে ময়দানে নামল।

ময়দানের ঠিক মাঝখানে পৌঁছুতেই হিন্দুসেনা পূর্ণ শক্তিতে ঘোড়া হাঁকিয়ে দিল। হিন্দু সেনার ইচ্ছে দ্রুত গতিতে আচমকা হামলা শানিয়ে প্রতিপক্ষকে ভড়কে দেয়া। যাতে সে অল্পতেই রণেভঙ্গ দেয়। কিন্তু তুর্কী তার চেয়েও যে বড় সেয়ানা। তুর্কী তার এই ঝড়োগতির ঘোড়ার চক্রবাকে তেমন একটা ভড়কাল না। তুর্কীসেনা খানিক সময় নিল। সে বুঝতে চায় দুশমনের আঘাতের ধরনটা কী। মুহূর্তেই সে প্রতিহত কৌশল ঠিক করে নেয়।

যখনই হিন্দুসেনা তার নিকটবর্তী হল তখনই সে একটা নেযা যমীনে গেড়ে দিল। আরেকটি নেযা বিদ্যুৎগতিতে হিন্দুসেনার বুক লক্ষ্য করে শুধু তাক করে থাকল। নেযাটি হিন্দুসেনার বুকে এমনিতেই ঢুকে গেল। তার কোন শক্তি প্রয়োগ করতে হল না। পরক্ষণেই মাটিতে গাড়া নেযাটিও ঘোড়ার বুকে ঢুকে গেল। ঘোড়ার লড়ার শক্তিও নেই। তুর্কী সেনা এবার এক লাফে ঘোড়া থেকে হিন্দুসেনাকে উঁচুতে তুলে ধরে খালি ময়দানে আছাড় মেরে ফেলে দিল। একসময় তার মাথা কেটে ফেলল। পরক্ষণে বীরের বেশে ফিরে গেল স্ব-শিবিরে।

হিন্দুশিবিরে ক্রমশ-হাতাশা ছড়িয়ে পড়ল। তারা মুখে কুলুপ এঁটে দিয়েছে। মুসলিম শিবিরে বিজয়োল্লাস।

পৃথ্বিরাজের পক্ষ থেকে এবার দ্বৈত যুদ্ধের দ্বিতীয় অংক শুরু হল হস্তি বাহিনীর মাধ্যমে।

একটা হাতির একজন মাহুত। ওই হাতির মাহুত বাহনসহ ময়দানে আগে বাড়ল। সে হেঁকে বলল, এমন কেউ আছ যে, আমার সাথে মোকাবেলায় নামবে। এই চ্যালেঞ্জের জবাবে তিন সওয়ার এগিয়ে গেল মুসলিম শিবির থেকে। তন্মধ্যে একজন তুর্কী, একজন আফগান আরেকজন খলজী। তিনজনই দৌড়ে হাতির কাছে এল। খলজী ও আফগান হাতির ডান বামে চক্রাকারে ঘুরে দাঁড়াল।

হাতি অগ্রসর হয়ে শুঁড় উঁচাল। সে চাচ্ছিল তুর্কী সেনাকে শুঁড়ে পেঁচাবে। খলজী ও আফগান সওয়ার এই সুযোগে কোপ মেরে হাতির শুঁড় কেটে ফেলল। শুঁড় হারিয়ে হাতি উন্মাদ হয়ে পড়ল। সে হিংস্রতার সুযোগ নিতে চাইল মাহুত। সে হাতিটি মুসলিম শিবিরমুখো করতে চাইল। তার ধারনা, হাতি প্রতিপক্ষের ওপর তেড়ে গেলে অন্যান্য হাতিগুলো তার দেখাদেখি এগিয়ে যাবে। এতে প্রতিপক্ষ কিছু বুঝে ওঠার আগেই তাদের প্রচুর ক্ষতি হয়ে যাবে।

তিন মুসলিম সেনা মাহুতের এই চাল ধরতে পেরে তাদের ঘোড়া হাতির পেছনে নিয়ে গেলে। সঙ্গে সঙ্গে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে পালাক্রমে আঘাত করে হাতির পা কেটে দিল।

হাতি যমীনে পড়ে রইল। মাহুত উপারন্তর না দেখে হাওদা থেকে লাফ মারল এবং শিবিরের দিকে দৌড়ে পালাতে লাগল। আফগান সেনা তার দিকে ধনুক বাঁকাল। মাহুতকে টার্গেট করে বলল, 'ওই বেটা! তুমি না আমাদের মোকাবেলায় হাতি নিয়ে নেমেছিলে? তোমাকে জীবিত ফিরে যেতে দেওয়া আমাদের তিনজনের জন্যই অপমানকর বিষয়। আফগান ধনুক বাঁকিয়ে তীর ছুঁড়ল। মাহুতের পিঠে তীর লাগল। মাহুত ভূতলশায়ী হয়ে তীর মারতে উদ্যোগ নিল।

খলজী সেনা তাকে সুযোগ না দিয়ে তলোয়ার দ্বারা মাথা কেটে ফেলল। মুসলিম শিবিরে এসময় গগনবিদারী তাকবীর ধ্বনি। পক্ষান্তরে হিন্দু শিবিরে প্রিয়জন হারা আর্তনাদ আর আর্তনাদ।

নয়.

দ্বৈত যুদ্ধে পরাজয়ের পর পৃথ্বিরাজ ব্যাপক হামলার নির্দেশ দিলেন। সর্বাগ্রে তিনহাজার হাতি বৃহংতি দিয়ে ময়দানে তেড়ে গেল। হাতির ভীমরতি আওয়াজ সকলের মনে ভীতির সঞ্চার করল। হাম্মাদ এ সময় ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে সৈন্যদের মনে শক্তি সঞ্চার করল। দিক চক্রবলে ভেসে এল ওর জ্বালাময়ী ভাষণ!

শহীদী কাফেলার সাথীরা আমার! হাতির তর্জন-গর্জনে তোমরা ভীত হয়ো না। কল্পনার রঙীন পাখায় ভর করে আবরাহার দিকে তাকাও। এই পরিস্থিতিতে মক্কাবাসীদের অবস্থা কী হয়েছিল। তোমরা পূর্নশক্তিতে হাতির ওপর হামলা কর। তোমাদের অমিততেজা হিম্মতের সামনে পৃথ্বিরাজ পরাস্ত হতে বাধ্য।

মনে রেখ! তোমরা সিংহরজাতি। এ যমীনে পরাজয় ইসলামের পরাজয়। তোমরা হিম্মৎ প্রদর্শন করলে ইতিহাসে তোমাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। হে আফগান, তুর্কী ও খলজী বীরেরা! তোমাদের পূর্বপুরুষদের যুদ্ধ দিনের স্মৃতি রোমন্থন করে দেখো। তাদের অসম সাহসের সামনে কত বার ভারত ভূমি কেঁপে উঠেছে। কত বার হিমালয় নড়ে উঠেছে। এবার পালা তোমাদের। আসমুদ্র হিমাচল রাম রাজত্বের ধ্বজাধারীদের পিপড়ার মত পিষে মারো। ওদের যুদ্ধ সাধ মিটিয়ে দাও চিরদিনের তরে। তরাইন প্রান্তর চিরদিন তোমাদের যশোগাথা গাইবে।'

আসমানের দিকে তাকিয়ে হাম্মাদ তাকবীর ধ্বনি দিল। ওর ধ্বনিতে ধ্বনি তুলল অগ্রগামী বাহিনীর ফৌজও। গোটা মুসলিম ফৌজ তাকবীর ধ্বনিতে হলো মুখরিত। হাম্মাদের বাহিনী অগ্রসর হোল। ওদিকে হাতিবহর কুর্দন করে এগিয়ে গেল। তলোয়ার শূন্যে উঁচিয়ে হাম্মাদ হাতির ওপর আঘাত হানার নির্দেশ দিল। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শেরদিল আফগান, তুর্কী ও খলজীরা এক যোগে হাতির ওপর সাড়াসী হামলা করল। হাতিওয়ালাদের চিৎকার, ঘন্টা ও কাষ্ ধবনিতে ময়দানে বিভীষিকা দেখা দিল।

বিদ্যুৎ গতিতে মুসলিম সেনারা হাতিবহরে ঢুকে পড়ল। তাদের তরবারীর আঘাতে একের পর এক হাতির শুঁড় যমীনে গড়াগড়ি খেতে লাগল। শুঁড় কাটার দরুন হিংস্র-উন্মাদ হাতিগুলো উল্টা নিজ বাহিনীর দিকে ছুটলো। যাদেরকে ময়দানে নামানো হয় মুসলিম বাহিনীকে ধ্বংস করার জন্য তারাই কিনা উল্টা নিজেদের মসিবতের কারণ হয়ে দাঁড়াল। অবস্থা বেগতিক দেখে পৃথ্বিরাজ হাতিগুলো এ কারনে পেছনের কাতারে নিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন। শুঁড় কাটা হাতিগুলো কারো নির্দেশ মানার মত পর্যায়ে ছিল না। বাধ্য হয়ে হিন্দু সৈনিকেরা নিজেদের হাতির পা কেটে অসাড় করে ফেলল।

হাতি বহর চলে গেলে এবার ঘোড়া সওয়ার ও পদাতিক ফৌজ দেখা গেল। হাম্মাদ তার বাহিনীসহ এদের মাঝে ঢুকে পড়ল। শুরু হোল রক্তক্ষয়ী তুমুল লড়াই। এক সময় সুলতানের নির্দেশে হাম্মাদ তার বাহিনীসহ পিছু হটল। এবার সুলতানের নেতৃত্বে মধ্য বাহিনী ঝড়োগতিতে দুশমনের ওপর চড়াও হোল।

তাজাদম ফৌজ দুশমনের ভীতে কাঁপন ধরাল। তাদেরকে পিছু হটিয়ে নিয়ে গেল। কিন্তু হিন্দু বাহিনীত আর দুএকজন নয়। ওদেরও একদল দুর্বল হলে সে জায়গা শক্তিশালী আরেক দলে পূরণ করে ফেলত। দীর্ঘ লড়াই-এ কোন দলই কাবু হোল না। এক সময় আইবেক বাহিনী ও তুর্কী জেনারেলবৃন্দ স্ব-স্ব বাহিনীসহকারে ময়দানে নামল। কিন্তু যুদ্ধের কোন ফলাফল বেরোল না।

যুদ্ধ তখন মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। সুলতান ঘুরী আইবেক ও হাম্মাদকে তাড়াতাড়ি যুদ্ধ শেষ কিংবা নতুন কোন কৌশল অবলম্বনের পরামর্শ করলেন। এ সময় হাম্মাদ বলল, আমার একটা কৌশল মনে আসছে। আমি ১২ হাজার ফৌজ নিয়ে দুশমনের রসদ ক্যাম্পে হামলা করব এবং ওদের হাতিগুলোর ওপর হামলা করে

ওগুলো ক্ষেপিয়ে তোলব। কেননা এ মুহূর্তে দুশমন যদি কোনভাবে তাদের হাতিগুলো আমাদের ওপর চড়াও করে দেয় তাহলে আমাদের জন্য বিশাল মুসিবত হয়ে দাঁড়াবে। আর আমাদের ও বাম বাহিনী হাতি প্রতিরোধ কৌশল সম্পর্কে অজ্ঞ। খলজী ও আফগানীদের যুদ্ধের মতামত নিয়ে হাম্মাদ বার হাজার ফৌজ নিয়ে নয়া কৌশল নিয়ে এগিয়ে গেল।

দুশমন বাহিনীর পেছনে গিয়ে হাম্মাদ বিদ্যুৎ গতিতে হামলা করল। প্রহরীদের হত্যা করে ওরা হাতির ওপর আক্রমণ শানাল। কয়েকশ হাতির শুঁড় কেটে হাম্মাদ ওগুলো যুদ্ধরত দুশমন শিবিরের ওপর হাঁকিয়ে দিল। হাতি যখন নিজেদের বাহিনীকেই পদতলে পিষ্ট করছিল এ সুযোগে সুচতুর হাম্মাদও দুশমনের ওপর পেছন থেকে টর্নেডো গতিতে হামলা করল। এদিকে নিজেদের হাতি থেকে প্রাণ রক্ষায় ওরা যখন ব্যস্ত ওই মুহূর্তে দুশমনের হামলায় হিন্দুরা আরো দিশেহারা হয়ে গেল। হিন্দু সৈনিকরা পড়ে গেল গেড়াকলে।

আচমকা হাম্মাদের দৃষ্টি পৃথ্বিরাজের ভাই খন্ডরায়ের ওপর পড়ল। তিনি সৈন্যদেরকে যুদ্ধের জন্য নানান উত্তেজক বক্তৃতা বিবৃতি ঝেড়ে যাচ্ছিলেন। হাম্মাদ তার উদ্দেশে হামলা শানাল। মুসলিম বাহিনীকে আগুয়ান দেখে খন্ডরায় রনে ভঙ্গ দিতে চাইলেন, কিন্তু তা কি করে সম্ভব! হাম্মাদ তাকে ঘিরে নিল এবং সহসাই তার মাথা কেটে ফেলল।

খন্ডরায়ের মাথা দেখে দুশমনের মাঝে হতাশা ছড়িয়ে পড়ল। তারা পিছপা হতে শুরু করল। পৃথ্বিরাজ তার বাহিনীর একাংশকে পলায়নপর দেখে ওই স্থানে নিজের রথ নিয়ে গেলেন। পৃথ্বিরাজকে এ অবস্থায় দেখে হাম্মাদ তার বাহিনীসহ তার পিছু নিল। কেননা সে পৃথ্বিরাজকে খুব ভালো করেই চেনে। দক্ষিণমুখো আগুয়ান পৃথ্বিরাজের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল হাম্মাদ। দ্রুত গতিতে ও ঘোড়া হাঁকিয়ে পৃথ্বিরাজের কাছে উপনীত হল। ওর মুখ নেকাবে ঢাকা। ওই অবস্থায়-ই ও বলল, 'পৃথ্বি মহাশয়! আমার দিকে তাকাও! এই চেহারা তুমি নিশ্চয়ই কোথাও দেখেছ।'

হাম্মাদের কথা শুনে পৃথ্বিরাজ ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন। শূন্যে তলোয়ার উঁচিয়ে হাম্মাদ বলল, 'আমি কি সেই নই যে তোমার মেয়ে কৃষ্ণার স্বয়ম্বরা জিতেছিল এবং তোমার কয়েদ থেকে আমি কি পালাইনি?

পৃথ্বিরাজ দাঁতে দাঁত পিষে বললেন, 'তুমি পালাতে পেরেছ আমার মেয়ে তোমার প্রতি দুর্বল ছিল বলে। সে-ই তোমাকে পালাতে সহায়তা করেছে কিন্তু শোন! এ অপরাধে কৃষ্ণাকে আমি হত্যা করেছি।'

'তুমি কী তাকে আমার স্ত্রী ঘোষণা দাওনি?'

'তাতে কী?

'কোন আত্মসম্ভ্রমবোধসম্পন্ন লোক তার স্ত্রী-হন্তাকে ক্ষমা করতে পারে? নিজকে পারলে রক্ষা কর।' বলে হাম্মাদ, পৃথ্বিরাজের ওপর চড়াও হোল। পৃথ্বিরাজ ঢালধারী

নিজকে বাঁচাতে চাইলেন কিন্তু পারলেন না। হাম্মাদের আঘাত তার কাঁধে প্রচণ্ড আঘাত হানল এবং দেহকে দুটুকরো করে ফেলল।

হাম্মাদ ও তার সাথীরা চিৎকার দিয়ে বলল, আমরা পৃথ্বিরাজ ও খন্ডরায়কে হত্যা করেছি। এ আওয়াজ মুহূর্তে গোটা ফৌজের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া হলো। হিন্দু বাহিনী এবার পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়ল। তারা ভাবল, যুদ্ধ করে আর কী লাভ।

হিন্দু সৈনিকেরা প্রাণ রক্ষায় এবার পালানো শুরু করল। হাম্মাদ ওদের পিছু নিল। সুলতান সার্বিক পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে সকল সৈন্যকে একযোগে পলায়নপর হিন্দু বাহিনীর ওপর চড়াও হতে নির্দেশ দিলেন। একদলে রসদভান্ডার কব্জা করল। বাদবাকীরা হিন্দুদেরকে করতে লাগল কচুকাটা।

পলায়নপর হিন্দু সেনাদের তখন কোন পথপ্রদর্শক নেই। যেদিকে পারল পালাতে লাগল। পুরো তরাইনে এবার হিন্দু সেনাদের আর্ত চিৎকার। আস্তে আস্তে মুসলমানরা পশ্চাদ্ধাবন কমিয়ে আনল। এত মারা যাবার পরও হিন্দু সেনা সংখ্যা মুসলিম মোট ফৌজের চেয়েও বেশী। তবে তারা পলায়নপর এই যা। পলায়নপর বাহিনী একে একে স্বরসতী, সামানা, হাসি ও কোহরাম কেল্লায় আশ্রয় নিল। এক পর্যায়ে ওরা মুসলমানদের ওপর পাল্টা আঘাত হানতে চাইল কিন্তু তাও ওই চাওয়া পর্যন্তই। সুলতান মুহাম্মদ ঘুরী কিছু সৈন্যকে ময়দানে রেখে বাদ বাকীদেরকে নিয়ে শহরে প্রবেশ করলেন। হাম্মাদ পশ্চাদ্ধাবন করে ফিরছিল হিন্দু সেনাদের।

আজমীর তখন পৃথ্বিরাজের পুত্র কালুরাজের হাতে। সে জানতে পেরেছিল তার বাবা রণাঙ্গনে মারা পড়েছে এবং পরাজিত হিন্দুবাহিনী আজমীরের উদ্দেশে ছুটে আসছে। সুতরাং সে শহরে প্রবেশের সকল দরোজা খুলে রাখল। এর পাশাপাশি পরিখা বাহিনীকে কেল্লার বাইরে নিয়ে গেল। উদ্দেশ্য পশ্চাদ্ধাবনরতঃ মুসলিম বাহিনীকে ঠেকানো। কালুরাজের এই ব্যবস্থার কথা পূর্বাহ্নেই জেনে গিয়েছিলেন সুলতান ঘুরী। কাজেই তিনি হাম্মাদকে বললেন, কেল্লা দখল করে বুরুজে ইসলামী পতাকা ওড়াও।

সুলতানের কথামত কাজ হলো। শহরে মুসলিম বাহিনী আর কেল্লার ইসলামী পতাকা ওড়াতে দেখে কালুরাজ সুলতানের কাছে মাফ চাইল ও হাতিয়ার সমর্পন করল এবং সন্ধি প্রস্তাব রাখল। সুলতান তাকে মাফ করে দিলেন এবং আজমীরে তাকে জায়গীরদার (করদাতা) সাব্যস্ত করলেন। কালুরাজ আগামীতে যে কোন যুদ্ধে সুলতান মুহাম্মদ ঘুরীর হয়ে যুদ্ধ করারও অংগীকার ব্যক্ত করলেন।

আজমীরের থেকে এক সময় সুলতান গজনীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। যাবার আগে কুতুবুদ্দীন আইবেককে কোরাম, স্বরসতী, সামানা, হাসী-এর গভর্নর নিযুক্ত করলেন। হাম্মাদকে সেনাবাহিনীর প্রধান নিয়োগ করলেন। এই যুদ্ধে মুহাম্মদ ঘুরী অঢেল সম্পদ রপ্ত করেন। হীরা, মনিমুক্তা, ঘোড়া, উট ইত্যাদি। এর অধিকাংশ তিনি সৈন্যদের মাঝে ভাগ করে দেন।

কালোমেঘ

নিশাপুরের পাথুরে যমীন কেঁপে ওঠছে হাম্মাদের ঘোড়ার পদভারে। গিরিপথে ওর ঘোড়ার গতি কমে যায়। গিরিপথ মাড়িয়ে ক্ষেতের মাঝ দিয়ে চলতে থাকে ও। এ সময় ঝর্নার কিনারে কারো করুন গীত কানে আসে ওর। এ আওয়াজ কোন যুবতীরই হবে। যে কিনা প্রিয়জনের অপেক্ষায় প্রহর গুনতে গুনতে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে। সেই সকরুন গানের ভাষ্য কতকটা এমন যে,

'আমার প্রিয়জন এমন যে ময়দান জংগলে শত্রুর সামনেও আমাকে সংরক্ষণ করবে। সে তারার মিটিমিটি হাসির মাঝে আমি তাকে খুঁজে পাই। তপ্তমরুতে তার হাতের মুঠোয় আমি প্রাণের স্পন্দন খুঁজে নিই।'

হাম্মাদ আরেকটু অগ্রসর হয়ে দেখল সুন্দরী রত্না বাড়ীর সামনে প্রকান্ড একটি পাথরের উপর মুখ নীচু করে বসা। সামনে একটি মাটির কলসি। ঘোড়া ওখানেই রেখে রত্নার উদাসীন মনে গেয়ে যাওয়া কয়েক খানি গান শুনে যায়।

এক সময় গান শেষ করে কলসি ভরে রত্না উঠে দাঁড়ায়। হাম্মাদ ঘোড়া ছুটিয়ে ওর কাছে এসে দাঁড়ায়। হাম্মাদের মুখে নেকাব। রত্না চমকে ওঠে। তারপর ও নিশ্চুপ। হাম্মাদ গর্জে ওঠে এই মেয়ে পথ ছাড়! রত্না খামোশ। 'শোন নি কী বলছি আমি?'

'আগে ঘোড়া থেকে নামুন। তারপর পথ ছাড়ার কথা বলবেন। রত্না বলল।

হাম্মাদ ঘোড়া থেকে নামল। রত্না কলসি রেখে হাম্মাদের বুকে মিশে গেল। বলল, 'মনে করছেন আপনার কণ্ঠ আমি বুঝিনি?'

'দেখ। তুমি আমাকে স্মরণ করতেই আমি চলে এসেছি।'

'আমি তো আপনাকে প্রত্যহই স্মরণ করে থাকি। তা এ সময় কোত্থেকে এলেন?'

'বাড়ী চলো। বাড়ী গিয়ে সব কথা বলব।' কলসি উঠিয়ে বলল হাম্মাদ।

রত্না কলসি ছিনিয়ে নিতে গিয়ে বলল, আপনি কলসি তুললেন যে। এটা আমাকে দিন। আপনি ঘোড়ায় চেপে বাড়ী চলুন।

হাম্মাদ কী ভেবে রত্নাকেই কোলে নিয়ে ঘোড়ায় চাপাল। বলল, তুমি ঘোড়ায় চাপো। আমি কলসি কাখে হেটে যাই।'

রত্না বলল, তা হয় না।'

হাম্মাদ বলল, 'কলসী ভরে পাহাড়ের ওপর ওঠলে তোমার কোমল কোমড় ভেঙ্গে যেতে পারে।'

'ওমা! বলে কি। আমি দৈনিক এভাবে পানি টেনে চলেছি।'

'সে না হয় আমার অনুপস্থিতিতে টেনেছ। কিন্তু আমার উপস্থিতিতে চলবে না। চলো ঘোড়া হাঁকাও। বাড়ী চলো।'

রত্না লজ্জাপেলব কণ্ঠে বলল, 'বাবা-মা দেখলে কী মনে করবেন। আমি ঘোড়ার পিঠে আর আপনি কিনা কলসি টানছেন।' রত্না ঘোড়া থেকে নামতে চায়। হাম্মাদ কড়া ভাষায় বলে, 'আমার প্রতি ভালবাসা থাকলে নামবে না।

রত্না বেচারী নামতে গিয়েও পারল না। বলল, এক শর্তে ঘোড়ার পিঠে চলব। আপনি মটকা আমাকে দেবেন। ওটা আমার সামনে রাখব।'

হ্যাঁ! এটা হতে পারে।' বলে রত্নার সামনে কলসী রাখল হাম্মাদ এবং পাহাড়ের ওপর উঠতে লাগল।

বাড়ীর আঙিনায় এসে প্রথমে কলসি ও পরে রত্নাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামাল হাম্মাদ। কলসী কাঁখে নিয়ে গুনগুন করতে করতে ভেতরে প্রবেশ করল রত্না। 'মা! মা!! বাবা! বাবা!! দেখ কে এসেছে। মা দেখ কাকে সাথে করে নিয়ে এসেছি।'

খালদূন দৌড়ে বের হলেন। দু'হাত উঁচিয়ে হাম্মাদকে বুকে চেপে ধরলেন। বললেন, 'বেটা! এতদিনে আমাদের মনে পড়ল।'

ততক্ষনে রত্না ওর ঘোড়া আস্তাবলে নিয়ে যায়। খালদুন বলে, 'মেয়েটা বড্ড কর্মঠ। ঘরের সব কাজকর্ম একাই করে।

হাম্মাদ বললো, 'বাবা! মা গেল কৈ? মাকে দেখছি না যে।'

'তোমাকে বলতে ভুলে গেছি। তোমার মা মারাত্মক অসুস্থ। দিন রাত তার চিকিৎসা চলছে। কোনক্রমে বেচে আছে। এখন অবশ্য কিছুটা সুস্থ। তবে দুর্বলতার দরুন বিছানার থেকে ওঠতে পারছে না। চলো ভেতরে যাই। তার সাথে কথা বলবে। বললেন বৃদ্ধ বাবা।

হাম্মাদ আগে গেল। হাম্মাদ মায়ের পাশটিতে বসে বলল, মা মা! আমি তোমাদের নিতে এসেছি। তুমি, আব্বা, রত্না সকলেই আমার সাথে যাবে। কোরাম শহরে তোমাদের জন্য বাড়ীর ব্যবস্থা হয়েছে।

'কিন্তু বাবা। আমিতো আগামী এক মাসের মধ্যে চলা ফেরার যোগ্য হবো বলে মনে করি না। তা তোমাদের সাথে যাব কী করে। হিন্দুস্থান সে কী এখানে। অবশ্য তুমি যদি এখানে কিছুদিন থেকে যেতে তাহলে রত্নার সাথে তোমার বিবাহের এন্তেযাম করতাম। সেক্ষেত্রে না হয় তুমি স্রেফ রত্নাকেই সাথে নিয়ে যেতে।

নিজের বিবাহের কথা শুনে রত্না লজ্জায় কুকড়ে গেলেও কতকটা সাহস করে বলল, 'না মা। আমি একাকী যাব না। আপনাদেরকেও আমার সাথে যেতে হবে। আমি এখানে থেকে আপনার সেবা করব এবং আপনি সুস্থ হলেই তবে আপনাকে নিয়ে এখান থেকে যাব।

রত্নার এ কথায় হাম্মাদের মন খুশীতে ভরে গেল। মায়ের চোখে মুখে দেখা দিল তৃপ্তির হাসি। পরে হাম্মাদ বললো, 'মা! হারেস ও হাসান বাড়ী এসেছে কী?'

'ক'দিনের জন্য এসেছিল। বলেছিল, কিছুদিনের মধ্যেই সুলতানের সাথে হিন্দুস্থান যেতে হবে। ওরা দুজনই তোমার প্রশংসা করেছে। বলেছে, তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে ভাইজানের অসম দুঃসাহসিকতায় আমরা জয়লাভ করেছি। ওরা তোমাকে নিয়ে আরো অদ্ভুত কথা বলেছে। রত্না সেগুলো সহজে বিশ্বাস করলেও আমি বিশ্বাস করতে পারিনি।'

হাম্মাদ বললো, 'আপনার পুত্রের কোন কল্যাণকর কাজের বহিঃপ্রকাশ অনৈতিক কিছু হয় কি করে।

'এ কথা নয় বাবা!'

'তাহলে কী?'

'ওরা বলেছে, হিন্দুস্থানের দু'বড় রাজার মাথা পর্যন্ত তুমি কেটেছ। ওরা তাদের নাম পর্যন্ত বলেছে। শুধু কি তাই। তুমি ওদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছো। এছাড়া ওরা এমন কিছু কথা বলেছে, আমার কাছে যা রীতিমত ভৌতিক ঠেকেছে।

মায়ের পা দাবাতে দাবাতে হাম্মাদ বলল, 'ওরা যথার্থ বলেছে আম্মিজান। সত্যিই আমি হিন্দুস্থানের দু'রাজার মাথা কেটেছি। তাদের একজন পৃথ্বিরাজ আরেকজন খন্ডরায়। এ সেই পৃথ্বিরাজ যার হাত থেকে বাঁচাতে রত্নাকে এখানে আনতে হয়েছে আমাকে।'

রত্না বললো, 'পৃথ্বিরাজ আপনাকে চিনতে পেরেছিল কী?'

'হ্যাঁ! তা চিনেছিল বৈকি। তাকে হত্যার পূর্বে বলেছিলাম, তার মেয়ের স্বয়ম্বরা জিতেছিলাম আমি। আমাদের পালানোর সুযোগ করে দেয়ার অপরাধে পৃথ্বিরাজ তার মেয়ে কৃষ্ণাকে হত্যা করেছে।

রত্না খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'যাহোক। পৃথ্বিরাজ তার কৃতকর্মের সাজা পেয়েছে। তা মামু বিদ্যানাথের ওখানে গিয়েছিলেন কী!'

'হ্যাঁ গিয়েছিলাম। মামা, মামী ও বিমলা তোমাকে স্মরণ করেন। ওরা বলেছে, বাবা-মা ও রত্নাকে নিয়ে এসো। শোন! আমি সুধানীরে বীনার ওখানেও গিয়েছিলাম। ওর বাবা সেবারাম মারা গেছেন।

রত্না সমবেদনা জ্ঞাপন করে বলল, 'এক্ষণে বেচারী নিঃসঙ্গ হয়ে গেছে।'

'না তা হবে কেন। আবু বকর ওকে তার বড় ছেলের বউ করে নিয়েছে। ও এখন সাচ্চা মুসলমান। ওর জীবন সুখেই কাটছে। তোমাকে খুব মনে করে।

রত্না কিছু বলতে যাচ্ছিল। এ সময় মা বললেন, 'বেটা! তোমার অবর্তমানে রত্না ঠিক সেভাবে আমার সেবা করেছে যেভাবে তুমি করতে। ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও পড়ে। গত এক মাসে এক খতম কোরআন পড়েছে। তোমার বাবা প্রত্যহ ওকে নামায পড়ান। তোমার অনুপস্থিতি আমাকে বুঝতে দেয়নি ও।

'মা! আমার তারিফ একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে নয় কী। মায়ের খেদমত সন্তানের প্রতি ফরজ নয় কী।'

মা কথায় মোড় ঘুরাতে গিয়ে বললেন, 'চলো খানা খাবে। রত্না ঝর্নার পানি আনতে গেলে আমি খানা খেয়েছি। রত্না! যাও খানা নিয়ে এসো।'

রত্না খানা নিয়ে এলে সকলে মিলে খানা খেতে লাগল।

দুই.

বিদ্যানাথের হাবেলী।

কালো রঙের একটি ঘোড়া ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল।

অর্জুন এই ঘোড়ার সওয়ার।

অর্জুন রত্নার বাগদত্ত। শৈশবে রত্নার সাথে ওর বিবাহ ঠিক হয়েছিল। অর্জুন সুঠামদেহের অধিকারী যুবরাজ।

অর্জুন ঘোড়ার পিঠ থেকে নামলে জ্ঞান সিং আস্তাবল থেকে দৌড়ে এসে প্রণাম করে বলল, 'প্রভু আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন?

অর্জুন কড়া ভাষায় বললো, 'আমার ঘোড়া আস্তাবলে নিতে হবে না। এখানেই থাকবে। জ্যাঠা বিদ্যানাথ কোথায়? জরুরী কথা আছে।

জ্ঞান-এর কিছু বলার পূর্বেই বিদ্যানাথ, সাবিত্রী ও বিমলাকে দোতলার সিড়ি বেয়ে নামতে দেখা গেল।

অর্জুন সকলকে নমস্কার দিল।'

সিড়ি থেকে নেমে অর্জুনকে বুকে চেপে ধরে বিদ্যানাথ বললেন 'তুমি বাইরে কেন? ভেতরে চল।'

ঘোড়ার গর্দানে হাত রেখে অর্জুন বললো, 'আমার কিছু সাথী বাইরে দাঁড়ানো। অতি তাড়াতাড়ি আমাকে ফিরে যেতে হবে। জরুরী একটা বিষয়ে আপনার সাথে কথা বলতে আমার আসা।'

'তার আগে আমার একটা কথার জবাব দাও। তুমি এতদিন ছিলে কৈ!'

'যখনই আমি বাড়ী আসতে চেয়েছি তখনই কোন না কোন কাজে আটকে গেছি। একবার বাড়ী আসার চিন্তা করতেই প্রথম তরাইনের যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। ওই যুদ্ধে আমি যখমী হলে আমাকে দিল্লী পাঠানো হয় চিকিৎসার জন্য। ওখানকার ফৌজি শেফাখানায় চিকিৎসা নিয়ে খানিক চাঙ্গা বোধ করতেই 'তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। তারপরও আমি চেয়েছিলাম যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে বাড়ী আসব। কিন্তু খশুরায় নাছোড়বান্দা। তিনি বললেন, তুমি আমার ফৌজের সবচেয়ে অভিজ্ঞ জেনারেল, কাজেই তোমাকে এ মুহূর্তে ছাড়ছিনা। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে আমরা শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হই। আমি মারাত্মক যখমী হয়ে আজমীরের

হাসপাতালে ছয় মাস চিকিৎসা নিই। গত কিছুদিন হল একটু চাঙ্গা বোধ করতেই আপনাদের এখানে আসি।'

থামল অর্জুন। খানিক দম নিয়ে বলল, 'এখানে এসে শোনলাম বেদনাবিধুর খবর। বিরান বিধ্বস্ত বাড়ী দেখে আমার মনটা ছ্যাৎ করে ওঠল। প্রতিবেশীরা বলল, পৃথ্বিরাজ বসতিতে হামলা করে রত্নাকে তুলে নিয়ে গেছে। ওরা বলেছে, রত্নাকে পৃথ্বিরাজ জোরপূর্বক বিবাহ করতে চেয়েছে— একথা কি সত্য? আর তার হাত থেকে বাঁচাতে বিশ্বপাল ওকে নিয়ে নানান স্থানে আত্মগোপন করে বেড়াচ্ছে।

বিদ্যানাথ বললেন, 'হ্যাঁ। কথা সত্য।'

'বিশ্বপাল ও রত্না এখন কোথায়?' মুখ কালো করে অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

বিদ্যানাথ অর্জুনের দিকে চোখ বড়ো করে তাকালেন এবং সত্য কথাই বললেন, 'পৃথ্বিরাজ রত্নাকে তুলে নিয়ে গেলে বিশ্বপাল ওকে ছাড়িয়ে আনতে আজমীর গিয়েছিল। কিন্তু ওরা ধরা পড়ে যায় এবং সবশেষে রাজা তাকে হত্যা করে। আমার জানামতে নিশাপুরের জনৈক দুঃসাহসিক জোয়ান ওকে পৃথ্বিরাজের কোপানল থেকে উদ্ধার করে। এখানে যেহেতু সর্বত্রই পৃথ্বিরাজের টিকটিকি বিদ্যমান সেহেতু ওর সাথে ওকে নিশাপুর প্রেরণ করতে বাধ্য হই। এক্ষনে রত্না নিশাপুরেই আছে। রাগে-ক্ষোভে অর্জুনের মুখ লাল হয়ে গেল। গোস্বাসুলভ মুখে ও বলল, 'যার সাথে আপনি ওকে প্রেরণ করেছেন তার নাম কী এবং বাড়ীর ঠিকানাই বা কী!'

বিদ্যানাথ অর্জুনের হাত ধরে বললেন, 'দুঃখ পেয়ো না। রত্না ওখানে শান্তিতেই আছে। যে জোয়ানের সাথে ও গেছে তার নাম হাম্মাদ বিন খালদূন। নিশাপুরের এক নির্ভৃত পল্লীতে ওদের বাস। আর হ্যাঁ একথাও জেনো, রত্না নিজ ইচ্ছায়ই ওখানে গেছে। কারো চাপাচাপি কিংবা পীড়াপীড়িতে নয়। তোমার জেঠি ও জ্যাঠতো বোনকে জিজ্ঞেস করে দেখো, ওখানে যাবার প্রস্তাব রত্নাই রেখেছিল।

অর্জুন আহতকণ্ঠে বলল, 'আপনি কী মনে করেন নিশাপুরে থেকে রত্নার ইজ্জত-আব্রু সংরক্ষিত থাকবে।

বিদ্যানাথ গৌরবভরে বললেন, 'যতক্ষণ ওই জোয়ানের সাথে ওর বিয়ে না হচ্ছে ততক্ষণ ওর ইজ্জতের ওপর কেউ হাত দিতে সাহস করবে না।'

অর্জুনের আপাদমস্তক কেঁপে ওঠল এ কথায়। চোখ বড় করে বলল, 'ওই জোয়ান ওকে বিয়ে করবে?'

'অবস্থা যা তাতে এমনই মনে হয়। কেননা রত্নার হাবভাব কথাবার্তা দ্বারা এমনই আঁচ করা গেছে। আর সে তাকে ভালও বাসত।'

অর্জুন দাঁতে দাঁত পিষে বলল, 'এক মুসলমানের সাথে বিয়ে বসার চেয়ে পৃথ্বিরাজ ওকে বিয়ে করে নিলেই ভাল হত। নিশাপুরের এক মুসলমানের বাড়ীতে উঠে ও আমার বাগদানকে অপমান করে যে অন্যায় করেছে তার শাস্তি ওকে পেতেই

হবে। ওর সাথে আমার বিয়ের কথা পাকাপাকি সে কথা আপনারও অজানা নয়। বিদ্যানাথ ওকে থামাতে ব্যাপৃত হলেন। কিন্তু অর্জুন ঝড়ের বেগে হাবেলীর বাইরে চলে গেল।

দেউড়ীর বাইরে গিয়ে কি মনে করে অর্জুন আবারও ভেতরে এল। বলল, জ্যাঠা মশাই! হাম্মাদ নামে এক মুসলিম জেনারেলের নাম শুনেছি। একমাত্র তার কারনেই তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে আমরা পরাস্ত হয়েছি। এক্ষণে সে হিন্দুস্থানের নয়া বাদশাহ কুতুবুদ্দীনের ডান হাত। সেই হাম্মাদ নয় তো?'

বিদ্যানাথ সন্দিহান দৃষ্টিতে অর্জুনের দিকে তাকালেন। বললেন, ' তোমার ধারনাই যথার্থ অর্জুন। হ্যাঁ এ সেই হাম্মাদ বিন খালদূন। তিনি দুঃসাহসিক মুসলিম জেনারেল।'

অর্জুন প্রত্যয়দৃপ্ত কণ্ঠে বলল, 'তাহলে শুনুন জ্যাঠা! রত্নাকে এখান থেকে ফুসলিয়ে নেয়ার অপরাধে হাম্মাদের মাথা কেটে তবেই আমি রত্নাকে নিয়ে এখানে আসব। আপনার উপস্থিতিতে এ বাড়ীতেই ধুমধামের সাথে ওকে বিয়ে করব। ভগবানের দোহাই! আমি লক্ষরাজের পুত্র হলে এটা করবই করব। এ আমার প্রতিজ্ঞা। বলে দ্রুত হাবেলী থেকে বেরিয়ে গেল অর্জুন।

সাবিত্রী ভয়বিহবল দৃষ্টিতে বিদ্যানাথের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সত্যিই যদি হাম্মাদের সাথে ও যুদ্ধ বাঁধিয়ে বসে। আপনি তো জানেন অর্জুন কোন অংশে হাম্মাদের চেয়ে কম নয়। বিদ্যানাথ স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললেন, 'আমার জাতির এক জাত্যাভিমানী সন্তানের সামনে অর্জুন কিছুই নয়।'

বিদ্যানাথ সকলকে নিয়ে হাবলীর ভেতরে চলে গেলেন। ওদিকে অর্জুন তার সঙ্গী সাথীসহ স্বরসতীর উপকুল ধরে এগিয়ে চলেছে নিশাপুরের উদ্দেশ্যে।

তিন.

বাড়ী থেকে ঘুরে হাম্মাদ ফের হিন্দুস্থানে এল এবং কুতুবুদ্দীনের সাথে বিজয়ী এলাকাগুলোর প্রশাসনিক অবকাঠামো দাঁড় করাল। ওদের বিজয়ী এলাকাগুলোর সিংহভাগ অধিবাসী নবদীক্ষিত মুসলিম। এদিকে কারা কোরাম ছিল জনৈক তুর্কী জেনারেলের হাতে আর সামানা ছিল খলজী জেনারেলের অধীন। এখানে কিছু রক্ষী বাহিনী মোতায়েন করে হাম্মাদের নেতৃত্বে মুসলিম অধিকারে নয়া এলাকা দখলের আশায় আইবেক হাম্মাদসহ কিছু অভিজ্ঞ সেপাই নিয়ে বেরোলেন। ঝড়োগতিতে ওরা মিরাঠের ওপর চড়াও হল। এখানকার হিন্দু প্রশাসন ওদের মোকাবেলায় টিকতে পারল না। শহর মুসলমানদের হাতে চলে এল। এ শহর জয় করে আইবেকের যুদ্ধস্পহা শতগুনে বেড়ে গেল। তারা নিত্য নতুন শহর-নগরে হামলার পরিকল্পনা করতে লাগল। এবার ওদের টার্গেট ভারতের প্রাণকেন্দ্র দিল্লী-হাসনাপুর দখল।

দিল্লীর রাজা খন্ড রায়ের পুত্র মুসলিম আগমনের খবর শুনে প্রতিবেশী রাজন্যবর্গের কাছে সাহায্য চাইল। তার এই আবেদন কাজে লাগল। বহু রাজা, রাজপুত্র ও রানী অস্ত্রসাজে সজ্জিত হয়ে দিল্লী পৌঁছে গেল। খন্ড রায়ের পুত্র অগণিত সৈন্য দেখে মনে করলেন, এ সৈন্য দ্বারাই কুতুবুদ্দীন আইবেক ও হাম্মাদ বাহিনীকে পরাস্ত করতে পারবেন।

এমনকি তিনি সদলবলে দিল্লী শহরের বাইরে তাবু ফেলে মুসলমানদের প্রতিহত করার আশে অপেক্ষা করতে থাকেন। অর্জুনও নিশাপুরের পথ পরিত্যাগ করে দিল্লী এসে পৌঁছায়। সে আগের থেকেই খন্ড রায়ের বিজ্ঞ জেনারেল ছিল। এবার তার পুত্র অর্জুনকে সেনাপতি হিসাবে নিয়োগ দিলেন।

আইবেক ও হাম্মাদ ঝড়ো গতিতে হাসনাপুরের দিকে ধেয়ে আসছিলেন। মুসলিম বাহিনীর সাথে সম্মুখ সমরে মোকাবেলা ছাড়াও পথিমধ্যে আক্রমন করে অগ্রযাত্রা প্রতিহত করার নানান প্রতারণা জাল বিস্তার করেছিল। নারিয়ালের রাজা ভীমদেব এর সেনাপতি রাজ দেওয়ান বিশাল এক বাহিনীসহ দিল্লী এসেছিল। অর্জুন কিন্তু তার বাহিনীসহ গোপনে হাঁসি আক্রমন করার জন্য রওয়ানা হোল। উদ্দেশ্য আইবেক ও হাম্মাদের অনুপস্থিতিতে হাঁসি আক্রমন করে তা পুনঃদখল নেওয়া। এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, হাঁসির গভর্নর তার সামান্য বাহিনী বিশাল হিন্দু বাহিনীর সাথে মোকাবেলায় পেরে উঠবেন না। দিল্লীর রাজার আরো ইচ্ছা ছিল, হাঁসি জয় করে কারা কোরাম ও সামানা দখল করার। এতে আইবেকের শক্তি ক্ষয় হবে এবং নতুন কোন অভিযানে তারা মোকবেলা করার সাহস পাবে না। এক সময় গজনী ফিরে যেতে বাধ্য হবে। পক্ষান্তরে আইবেক যদি তাদের পরাজিতও করে তথাপিও তারা কেল্লায় আশ্রয় নেবে। আর ততদিনে অর্জুন ও রাজ দেওয়ান হাঁসি থেকে তাদের সাহায্যে ছুটে আসবে।

অর্জুনের আগমন বার্তা শুনতেই সুচতুর নাসিরুদ্দীন দ্রুতগামী এক সওয়ারের মাধ্যমে তা আইবেককে জানালেন। আইবেক তাকে সম্মুখ সমরে না লড়ে কেল্লার আশ্রয় নিতে বললেন।

চার.

হাসনাপুর থেকে ১০ মাইল দূরে হাম্মাদ তার হিস্যার সেপাইসহ আইবেক থেকে আলাদা হয়ে গেল এবং অনাবাদি জংগলে আশ্রয় নিল। কেউ জানল না কোথায় গিয়ে আত্মগোপন করল সে। একমাত্র কুতুবুদ্দীন ও হাম্মাদ জানল এই আত্মগোপনের রহস্য। এমনকি নিকটতম সৈনিকেরাও এ খবর জানল না।

দিল্লীরাজের খেয়াল মুসলিম ফৌজ দিল্লীর উপকণ্ঠে তাবু গেড়ে জংগী কাতার করে দাঁড়াবে এরপর শুরু হবে যুদ্ধ। কিন্তু তার প্রতিটি চিন্তা চেতনাই উল্টা প্রমাণিত হল। হাসনাপুর পৌঁছামাত্রই আইবেক হিন্দুসেনাদের ওপর আক্রমণ করল।

রাজপুতরা জমে লড়াই করতে লাগল। ওদের শক্তি সাহস অনেক গুণ বেড়ে গেল আইবেকের সামান্য সেপাই দেখে। ওরা যা ধারনা করেছিল, এর অর্ধেক সৈন্য নিয়েও আসেননি আইবেক।

নগণ্য ফৌজ দেখে ওরা প্রাণপন লড়াই-এ নামল। মুসমানদের প্রথম হামলায় হিন্দুদের ভীতে কাঁপন ধরল, পরক্ষণে ওরা আবার নিজেদের সামলে নিল। মুসলমানরা হামলা সামাল দিয়ে কোনক্রমে পিছু হটতে লাগল।

হিন্দুরা তো মহাখুশী যে, মুসলমানরা পিছু হটছে।

হাসনাপুরের রাজা আইবেককে হাঁকিয়ে ৪/৫ মাইল পেছনে নিয়ে গেলেন। ইস্রাফীলের শিংগাধ্বনির মত একটা আওয়াজে হিন্দু সেনাদের পিলা চমকে ওঠল। জংগলে ওঁৎপেতে থাকা হাম্মাদ ওদের পেছন থেকে হামলা করল। আইবেক এদৃশ্য দেখে আর পিছু না হটে সস্থানে দন্ডায়মান হলেন। পরে তাকবীর ধ্বনী দিয়ে তুমূল লড়াই শুরু করলেন। হিন্দুবাহিনী এবার পড়ে গেল গ্যাড়াকলে।

জীবনে এই প্রথম আত্মবোকামির দরুন অনুশোচনা এল হিন্দু রাজার। তার বাহিনী রক্ত পাথরে সাঁতরাচ্ছে। তারা আইবেকের তলোয়ার সামনে থেকে আর পেছন থেকে হাম্মাদের তলোয়ারের শিকার হতে লাগল। শত্রু সেনাদের ওরা দম ফেলার সুযোগ দিতে নারাজ। শত্রুসেনারা বেশীক্ষণ টিকতে পারে না। ওদের পা নড়বড়ে হয়ে গেল। হাসনাপুরের রাজা তার বাহিনীর অর্ধেক সেনার জবাই করিয়ে দক্ষিণ মুখো পালাতে লাগলেন। দক্ষিণের কেল্লায় গিয়ে বাধ্য হলেন আশ্রয় নিতে। আইবেক হাম্মাদকে নিয়ে হাসনাপুর অবরোধ করল।

কুতুবুদ্দীন ও হাম্মাদ পরামর্শ করে হাসনাপুরের দেয়াল ভাঙ্গার পরিকল্পনা করতে লাগল। এ সময় জনৈক আফগান সেপাই বলল, 'জনাব হাঁসি প্রদেশের গভর্নর নাসীরুদ্দীনের জনৈক দূত আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী।

আইবেক চকিতে বলেন, কোথায় সে? দ্রুত নিয়ে এসো তাকে।

তুর্কীদূত আইবেক-এর কাছে এসে আদব সহকারে বললেন, 'আমীর সাহেব! নাসীরুদ্দীনের পক্ষ থেকে আমি এক ভয়ানক খবর নিয়ে এসেছি।'

হাম্মাদের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আইবেক বললেন, 'আমরা যখন হাসনাপুর অবরোধ করেছি তখন তার আর ভয়ানক খবর কী হতে পারে? নাসীরুদ্দীন কি অসুস্থ! তার বিরুদ্ধে কেউ ষড়যন্ত্র বা বিদ্রোহ করেছে কী? বলো! কি খবর নিয়ে এসেছো তুমি!'

দূত বললেন, 'দু'হিন্দু জেনারেল হাঁসি অবরোধ করে আমাদের কেল্লা বন্দী করে ফেলেছে। এসবই হয়েছে হাসনাপুরের রাজার ষড়যন্ত্রে। তার ইচ্ছা, হাঁসি জয় করে কোহরাম ও সামানার পতন ঘটিয়ে আপনার মূল শেকড়ে আঘাত করে দুর্বল করা। কিন্তু এখন পর্যন্ত ওরা হাঁসি থেকে সামনে অগ্রসর হতে পারেনি। নাসীরুদ্দীন বড্ড

বীরত্ব সহকারে ওদের মোকাবেলা করে যাচ্ছেন। আমি তার পক্ষ থেকে এ খবর নিয়ে এসেছি যে, আপনি তাকে সাহায্য করুন। নয়ত কোনদিন...'

আইবেক দূতের কথার মাঝে বললেন, 'নয়ত কোনদিন হিন্দুজেনারেল শহর রক্ষা প্রাচীর ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে যেতে পারে এবং সেমতাবস্থায় হাঁসি প্রদেশ আমাদের হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমি তা কোনদিন হতে দেব না। দুহিন্দু জেনারেলকে এমন শাস্তি দেব যদ্দরুন তাদের কোমড় ভেঙ্গে বাকা হয়ে যাবে।

পরে তিনি হাম্মাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হাম্মাদ! হাম্মাদ!! কুদরত আমাদের দু'জনার পরীক্ষা নিচ্ছেন। এসো প্রতিজ্ঞা করি আসন্ন পরীক্ষায় আমরা উৎরে যাবই। কোন পশুশক্তিকে আমরা বিজয়ী হতে দেব না। ভবিষ্যৎ বংশধর যেন আমাদের কবর দেখে এই বলে ধিক্কার না দেয় যে, এ সেই কওম যারা দুশমনের সামনে বুক পেতে দেয়ার স্থলে পৃষ্ঠদেশ দেখিয়ে পলায়ন করেছিল।

সীনাটান করে হাম্মাদ বলল, 'আমীর! হাম্মাদ বিন খালদূন আপনাকে নিরাশ করবে না। জাতির জীবনে কালোমেঘ ধারন করছে। এ সময় কোমড়সোজা করে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় আমাদের কে শত্রুর মোকাবেলা করে যেতে হবে।

'তাহলে শোন! আমাদের একজনকে হাসনাপুরের অবরোধ জারী রেখে আরেকজনকে হাঁসির অবরোধ ভাংতে হবে।

ফনাতোলা সাঁপের মত ফোঁস করে ওঠল হাম্মাদ। ও বলল, 'আমীর হে! আপনি এখানে থেকে যান। হাঁসির অবরোধ আমিই ভাংব। এ জন্য দরকার আপনার এজাযত। অচিরেই আপনি শোনবেন হাঁসি থেকে দুশমন পালাচ্ছে আর তাদের হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে হাম্মাদ বিন খালদূন।

আইবেক বললেন, 'তাহলে তুমি এখনি রওয়ানা হয়ে যাও। আমি তোমাকে' খোদা হাফেয' বলছি।

খানিক বাদে হাম্মাদ তার হিস্যার বাহিনীসহ হাঁসি অবরোধ ভাংতে টর্নেডো গতিতে এগিয়ে চলল।

পাঁচ.

অর্জুন ও রাজ দেওয়ান প্রবল প্রতাপ নিয়ে হাঁসি অবরোধ করে রেখেছিল। মেরে যাচ্ছিল যেমন খুশী তেমন তীর। এতদসত্বেও গভর্নর নাসীরুদ্দীনের ঈমানদীপ্ত প্রতিরোধের মুখে হিন্দুবাহিনী শত চেষ্টা করেও পাঁচিলের কাছে পৌছুতে সক্ষম হলো না। অর্জুনের সামনে এক্ষণে শংকা না জানি অবরোধ দীর্ঘ হতে হতে না আবার হাসনাপুরের মুসলিম বাহিনী এসে তাদের ওপর হামলা করে বসে। তারা এর একটা দফা রফা করতে চাইল এবং এ অভিযান শেষে আইবেকের পেছন দিয়ে হামলা করার মনস্থ করল। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল এর উল্টোটা।

হিন্দুবাহিনী অবরোধ দীর্ঘায়িত হওয়ায় তেঁতে ওঠল। শেষ পর্যন্ত ওরা আশপাশের জংগলের কাঠ কেটে সিঁড়ি বানাল। ওই বিকল্প সিঁড়ি দিয়ে হাঁসির শহর রক্ষা প্রাচীরে চড়তে চেষ্টা করল। কিন্তু শহররক্ষা প্রাচীরে যে-ই ওঠল মুসলিম তীরন্দাযদের অব্যর্থ আঘাতে সকলে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে গেল। এতে ওরা মারাত্মক মসিবতের সম্মুখীন হলো। উভয় পক্ষেই ক্ষয় ক্ষতি হলো।

মুসলমানেরা যখন হিন্দুদের নয়া কৌশলের সম্মুখে মরণপণ প্রতিরোধ করে যাচ্ছিল তখন হাম্মাদ তার বাহিনীসহ হাঁসি থেকে মাইল পাঁচেক দূরে। এসময় হাম্মাদ তুর্কী দূতের কাছে একটা পয়গাম দিয়ে নাসীরুদ্দীনের কাছে পাঠাল। বলল, 'আমার বাহিনী নিয়ে আমি এখানেই থাকছি। শহরে গিয়ে গভর্নরকে আমার আগমনি জানাও। তাকে বলবে, আপনার বাহিনী চৌকস রাখতে। আমার বাহিনী যে দিকটায় আছে সেদিকে নযর রাখতে বলবে। আমার বাহিনীকে এগিয়ে আসতে দেখলে মনে করবে আমরা দুশমনের ওপর মরণ কামড় দিতে এগিয়ে আসছি। এ সময় সেও যেন বাইরে এসে হামলা চালায়। তুমি পয়গাম পৌঁছিয়ে আমাকে জানিও যে কোনভাবে। এক্ষণে রওয়ানা হয়ে যাও। আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব অধীর আগ্রহে।

রাতে সাধারণতঃ যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ থাকত। হিন্দুরা তখন গাঢ় নিদ্রায় বিভোর। তারপরও নৈশপ্রহরী টহল দিয়ে থাকত। ওরা শিবিরের আশে পাশে বিশাল বিশাল মশাল জ্বেলে শিবিরকে সাক্ষাৎ দিনে পরিণত করে রেখেছিল। এদিকে হাঁসির মুসলমানেরাও ঘুমে বিভোর। প্রাচীর রক্ষী বাহিনী টহল দিচ্ছিল, যাতে আধার রাতে দুশমন প্রাচীরে চড়াও হতে না পারে।

তুর্কী দূত শহররক্ষা ফটকে আগমন করতেই নাসীরুদ্দীন সংবাদ পেলেন। তিনি জানলেন, তারই প্রেরীত তুর্কী দূত হাসনাপুর থেকে আগমন করেছে। ফটক খুলে গেল। দূত গভর্নরের কাছে কোন কথা বলার পূর্বেই তিনি বলে ওঠলেন। হাসনাপুর থেকে কি সংবাদ নিয়ে এলে দূত!

দূত বললেন, 'আমি খুবই ভাল সংবাদ নিয়ে এসেছি জনাব। একা আসিনি আমি। আমার সাথে সেনা প্রধান হাম্মাদ বিন খালদূনও এসেছেন।'

'সেনা প্রধান হাম্মাদ এমুহূর্তে কোথায়? আর তার পরিকল্পনাই বা কী?

'তিনি এখান থেকে মাইল পাঁচেক পূর্বে আছেন। আমার আপনার কথাবার্তা হয়েছে, এ সংবাদ তাকে দিতে হবে। দূত বললেন।

'সে দেয়া যাবে। তবে খুশীর খবর এই যে, সেনা প্রধানের আগমনের অর্থ হলো, দুশমনের সময় ঘণিয়ে এসেছে। এবার হিন্দুদের জাহান্নামে যাবার পালা।' বললেন গভর্নর।

'সেনা প্রধান বলেছেন, তার দিকে খেয়াল রাখতে। তাকে হামলাপ্রবণ দেখতেই আমরা যেন শহরের বাইরে গিয়ে দুশমনের ওপর হামলা করে বসি। এতে করে দুশমন আমাদের মোকাবেলায় টিকতে পারবেনা। বললেন দূত।

'এসো শহর রক্ষা প্রাচীরে গিয়ে জলন্ত অগ্নিবান নিক্ষেপ করে হাম্মাদকে জানাই যে তোমার পয়গাম আমি পেয়ে গেছি। কাজেই পরিকল্পনা মোতাবেক সব কাজ শুরু করতে পারেন। বললেন গভর্নর।

ছয়.

জংগলের ভেতরে হাম্মাদের লোকজন শহর রক্ষা প্রাচীরে অগ্নিবান নিক্ষিপ্ত হতে দেখল। তারা মনে করল, দূতের সংবাদ পৌঁছে গেছে। এবার হাম্মাদও একটা অগ্নিবান নিক্ষেপ করে আগাম জানিয়ে রাখল, সেও হামলা প্রবণ হতে চলেছে। কাজেই পরক্ষণেই হাম্মাদ তার বাহিনীসহ শহরের দিকে এগুতে লাগল।

হিন্দু প্রহরীরা মুসলিম বাহিনীর আগমনী টের পেয়েই অর্জুনকে সংবাদটা দিল। অর্জুন এ সংবাদের তেমন একটা পাত্তা দিল না। বলল, কোথায় কার বাহিনী। তোমরা প্রহরার কাজ চালিয়ে যাও।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের ভুল ভাংল। তারা টের পেল পূর্বদিক থেকে অনবরত, ঘোড়ার খুরধ্বনি ভেসে আসছে। তারা সৈন্যদের ঘুম ভাঙানোর ঘণ্টাধ্বনি বাজিয়ে দিল। হিন্দুবাহিনী খুব তড়া করেই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে ফেলল। অর্জুন তার সমস্ত কৌশল ব্যবহার করে মুসলিম বাহিনীর অগ্রযাত্রা রুখতে চাইল। কিন্তু হাম্মাদের প্রচন্ড আক্রমনের ধকল সইতে না পেরে অর্জুন বাহিনী পালানো শুরু করল। কিন্তু তাও তো সম্ভব নয়, কারণ প্রতিপক্ষ তাদেরকে চারদিক থেকেই ঘেরাও করে নিয়েছে। শুরু হোল পাইকারী হিন্দু হত্যা।

যুদ্ধ তখন তুঙ্গে। ওদিকে হাঁসির প্রবেশদ্বার খুলে গেছে। ময়দান হিন্দু-লাশে টইটুম্বুর। অল্প সময়ের ব্যবধানেই নাসীরুদ্দীন ও হাম্মাদ হিন্দু বাহিনীকে নিষ্ক্রীয় করে ফেলল। অর্জুন কোন উপায় না দেখে সৈন্যদেরকে পশ্চিমের পথ ধরতে নির্দেশ দিল। হাম্মাদ এদেরকে হাঁকাতে হাঁকাতে হাসনাপুরে নিয়ে এলো। হাসনাপুর এসে অর্জুন দেখল মুসলিম বাহিনী শহর অবরোধ করে বসে আছে। কাজেই নারোয়ালের পথ ধরল। হাম্মাদ অর্জুনের পিছু নিতে চাইলে আইবেক নিষেধ করল। তিনি হাম্মাদকে তার বাহিনীসহ বিশ্রাম নিতে নির্দেশ দিলেন। বললেন, 'আমি কল্পনাও করিনি তুমি এত তাড়াতাড়ি হাঁসির অবরোধ ভাংতে পারবে। তোমার আক্রমনে ওরা ভীত হরিণ শাবকের মত পালাল।'

কুতুবুদ্দীন আইবেক আরো বললেন, ' তোমার একটা রহস্য আমি জানি। যেটা ফাঁস করার ইচ্ছা ছিল না. কিন্তু হাঁসির অবরোধ ভাংতে পারায় সময়ের পূর্বে সে রহস্য আমি ফাঁস করে দিতে বাধ্য হচ্ছি। শোন হাম্মাদ! তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে তুমি পৃথ্বিরাজ ও খন্ডরায়কে হত্যা করেছ। দুশমনের হস্তিযুদ্ধকে করেছ বানচাল। পরে

শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করে আমাদের বিজয়কে ষোলকলায় পরিণত করেছ। হয়ত ভেবে অবাক হবে তোমার এই অভাবিত সাফল্যে সুলতান তোমার জন্য কোন প্রকার পুরষ্কার তো দুরে থাক সামান্য তারিফও করলেন না কেন।

শোন হাম্মাদ! সুলতান ওইদিন খিমায় ডেকে আমাকে কি যেন বলতে গিয়েও থেমে গিয়েছিলেন। কেননা তোমার কীর্তন গাইলে পুরানো জেনারেলবৃন্দ না আবার তোমাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করে এজন্য তার এই থেমে যাওয়া। যা হোক গজনী রওয়ানা দেবার প্রাক্কালে তিনি আমায় বলে গেছেন। তিনি তোমাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন এমনকি করে যাবেনও। সুলতান তোমার বীরত্বের মূল্যায়ন করবেন।

তিনি আরো বলেছিলেন, আমি চাই ওকে কোন প্রদেশের গভর্নর বানানো দরকার। কিন্তু এ মুহূর্তে নয়। হিন্দুস্থানে শত্রু বাহিনীর শক্তি এখনও নিঃশেষ হয়ে যায়নি। নিঃশ্বেস না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে রনাঙ্গনে থাকতে হবে এবং সে পর্যন্ত তুমি হবে আমার সেনা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক।'

হাম্মাদ বিনয়াবনত চিত্তে বলল, আমি নগণ্য এক সেপাই। জেনারেল না হয়ে সুলতান আমাকে তার গোলাম করে রাখলেই খুশী হব। দেশ ও ধর্মের খেদমত আঞ্জাম দেয়া জেনারেল কিংবা গভর্নর হওয়ার চেয়ে আমার কাছে ভাল।

পরদিন কুতুবুদ্দীন আইবেক ও হাম্মাদ হাসনাপুরের ওপর প্রচন্ড গতিতে হামলা শানাল। পশ্চিম প্রান্ত থেকে প্রাচীর ভাংতে চেষ্টা করল। রাতের বেলা হাম্মাদ বার কয়েক প্রাচীরের ওপর ওঠতে কোশেশ করল কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হল। কেননা প্রাচীরের ওপর থেকে আসা বিষাক্ত তীর ওদের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল।

এবার কুতুবুদ্দীন আইবেক পরামর্শ করে বললেন, এক্ষণে আমাদের সামনে দুটি পথই খোলা। হয় পশ্চিম পাশের দেয়াল ভাঙ্গা, নতুবা নড়বড়ে কোন ফটক ভেঙ্গে ভেতরে ঢোকা।

হাসনাপুরের রাজা মুসলিম আক্রমনের তেজোদ্বীপ্ততা অবলোকন করে শহর তাদের হাতে ছেড়ে দেবার পরিকল্পনা করলেন। হাতিয়ার দিলেন ফেলে। সাদা ফ্লাগ ওড়ালেন। এভাবে কুতুবুদ্দীন আইবেক হাসনাপুর কব্জা করলেন।

হাসনাপুর দখল করে কুতুবুদ্দীন হিন্দুস্থানের বিশাল এলাকা দখল করে নিলেন। তারপরও হিন্দুদের যে কোন আক্রমন থেকে তিনি সতর্ক রইলেন। বেনারসের রাজা জয় চাঁদ-এর পতাকাতলে অসংখ্য হিন্দু জমায়েত হোল এবং যুদ্ধ প্রস্তুতি নিল। ওদিকে আইবেকও হাম্মাদের সাথে মিলে এদের কচুকাটা করার মনস্থ করলেন। হিন্দুস্থান দেখল হক আর বাতিলের লড়াইয়ের আরেক অধ্যায়।

ছিনতাই

গুপ্তচর মারফত আইবেকের দিল্লী জয়ের সংবাদ পেলেন সুলতান শেহাবুদ্দীন ঘুরী। এর সাথে তিনি এও জানলেন যে, বেনারসের রাজা জয় চাঁদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হিন্দুস্থানের সৈনিকদের জড়ো করছেন মুসলিমদের থেকে বিজিত এলাকা ছিনিয়ে নিতে। সুলতান ঘুরী তৎক্ষণাৎ চৌকস সেনা হিন্দুস্থানমুখো রওয়ানা করালেন। তিনি নিজেও এই বাহিনীর সাথে রওয়ানা হলেন।

সুলতান তাঁর বাহিনীসহ দিল্লীর উপকণ্ঠে পৌছুলে হাম্মাদ ও আইবেক শহরের বাইরে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল। সুলতানের খেদমতে ১'শ আরবী ঘোড়া ও অসংখ্য জংগী হাতি পেশ করা হোল। এগুলো সুলতানকে অভ্যর্থনা দিয়ে নিয়ে এল।

আইবেক ও হাম্মাদের কার্যক্রমে সুলতান যারপরনাই খোশ হলেন। তিনি এদুজনকে নিয়ে বেনারসের দিকে অগ্রসর হলেন। সর্বাগ্রে তিনি অগ্রগামী বাহিনী ঠিক করলেন। এর প্রধান নিয়োগ করলেন যথাক্রমে আইবেক ও হাম্মাদকে। এদের অধীনে দিলেন ৫০ হাজার তাজাদম সেপাই। এদেরকেই আগে ভাগে রওয়ানা করিয়ে দিলেন। বলে দিলেন, তোমরা গিয়েই ওদের সাথে বেনারসে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেবে। আমরা আচমকা হাজির হয়ে ওদের ছত্রখান করে ফেলব। সুলতানের উদ্দেশ্য দুশমন অগ্রগামী বাহিনীকে মূল মনে করে ভুল করবে এবং এরই ফায়দা লুফতে তাঁর পেছনে থাকবেন ঘুরী। সেমতাবস্থায় আচমকা হামলায় ওদের যুদ্ধসাধ চিরদিনের তরে মিটিয়ে দেয়া।

আইবেক ও হাম্মাদ ৫০ হাজার সৈন্য নিয়ে কয়েক মাইল অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। বেনারস থেকে তারা বেশ দূরে। এ সময় রাজা জয়চাঁদ একদল সৈন্য এদের মোকাবেলায় খোলা ময়দানে প্রেরণ করলেন। কিন্তু তার এ অভিলাষ চরমভাবে মার খেল। আইবেক ও হাম্মাদ বাহিনী এদের শোচনীয়ভাবে পরাভূত করল। জয় চাঁদ এখবর শুনে বিশাল এক বাহিনীসহ খোলা ময়দানে নামলেন। তাবু গাড়লেন মুসলিম সৈন্যের মুখোমুখি।

জয়চাঁদ গুপ্তচর মারফত খবর পেয়েছিলেন আইবেক বাহিনীর পেছনে খোদ মোহাম্মদ ঘুরী বিশাল বাহিনী নিয়ে এগুচ্ছেন। এতদসত্ত্বেও সর্বাগ্রে হাম্মাদের বাহিনীকে তিনি কচুকাটা করতে চাইলেন যাতে সুলতান ঘুরী পথিমধ্যেই মনোবল হারিয়ে ফেলেন। তারপরও সুলতান অগ্রসর হলে তাকে পথেই শেষ করে দেবেন।

ক্ষিপ্ত গতির রাজা জয়চাঁদ তাই বেনারস থেকে বেরিয়ে হামলা করে বসেন। জয়চাঁদ বয়োবৃদ্ধ হলেও বীরত্বে অসম সাহসে তিনি হাজারো যুবকের ঈর্ষার পাত্র ছিলেন। তার এ ঝটিকা আক্রমনের হেতু না বোঝার মত কাঁচা পাত্র নন আইবেক। হাম্মাদ ও আইবেক বাহিনী মরণ পণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। এ সময় আচমকা হাম্মাদের নযরে পড়ে গেল জয়চাঁদ। হাম্মাদ এই সুবর্ণ সুযোগটির আশায় ছিল। ও তূণ থেকে তীর বের করল এবং জয় চাঁদের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করল। তীর গিয়ে জয়চাঁদের চোখে বিধল। এই আঘাতের টাল সামলাতে না পেরে জয়চাঁদ হস্তিপৃষ্ঠ থেকে পড়ে ভবলীলা সাঙ্গ করলেন।

সুলতানের আগমনের পূর্বেই আইবেক ও হাম্মাদ হিন্দুবাহিনীকে পরাভূত করে ফেলেছিল। জয়চাঁদের মৃত্যুর পর যুদ্ধ অবান্তর ভেবে হিন্দুবাহিনী রণে ভঙ্গ দিয়েছিল। সুলতান, আইবেক ও হাম্মাদের বাহিনী হিন্দুদের মেরে তক্তা বানিয়ে বেনারস শহর দখল করলেন। এ জয়ের আনন্দে সুলতান বেনারসেই দরবার কায়েম করলেন। ওই দরবারে তাকে বেনারসের অসংখ্য হাতি উপহার দেয়া হয়। তন্মধ্যে শুভ্র-সফেদ একটি হাতিও ছিল। ওই যুগে সাদা হাতি কল্যাণের প্রতীক মনে করা হত। সাদা হাতি সে যুগে বিরল ছিল।

কথিত আছে, যুদ্ধে ব্যবহৃত অল্প হাতিই তাদের মাহুতের ইশারায় সুলতানের সামনে এসে সালাম করল। কিন্তু এক বিস্ময়কর অধ্যায়ের জন্ম দিয়ে সাদা হাতিটি তার মাহুতের ইশারায় সুলতানকে সালাম করল না। মাহুত বহু চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। বার বার পীড়াপীড়ি করায় হাতিটি মাহুতকে মেরে ফেলতে উদ্যত হল। এ অবস্থা দেখে সুলতান ঘুরী হাতিটিকে ছেড়ে দিলেন। কিন্তু হাতিটির এই দুঃসাহসে সুলতান খুবই প্রীত হয়ে তাকে গজনী নিয়ে যেতে চাইলেন। অবশ্য কিছু একটা মনে করে সুলতান এই হাতি আইবেককে উপহার স্বরূপ দিলেন। এই হাতি আজীবন আইবেকের অধীনে ছিল। এদের মধ্যে এমন সখ্য পয়দা হয়েছিল যদ্দরুন আইবেকের মৃত্যুর তিনদিনের মাথায় হাতিটিও শোক সহ্য করতে না পেরে মারা গিয়েছিল।

বেনারস বিজয় করে সুরতান মোহাম্মদ ঘুরী তদানিন্তন বাংলা পর্যন্ত জয় করেছিলেন। এ সময় হিন্দুস্থানের সমকালীন সকল রাজাগণ মারা পড়ে। আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না দেখে সুলতান যুদ্ধলব্ধ মাল সৈনিকদের মাঝে ভাগ বাটোয়ারা করে তিনি সসৈন্যে গজনী রওয়ানা করেন।

দুই.

সুলতান শেহাবুদ্দীন মোহাম্মদ ঘুরির রওয়ানা দেবার পর কুতুবুদ্দীন আইবেক ও হাম্মাদ কিছুদিন বেনারসে অবস্থান করেন। ওখান থেকে রওয়ানা দেবার প্রস্তুতি নিতেই তারা শুনতে পেল দিল্লী ও আজমীরে যুদ্ধের আগুন জ্বলতে যাচ্ছে। বিখ্যাত

রাজপুত চিত্ত রায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিশাল এক বাহিনী নিয়ে দিল্লীতে হামলা করতে যাচ্ছেন। দিল্লীতে ভারপ্রাপ্ত গভর্নর কেল্লারুদ্ধ হয়ে পড়েছেন। চিত্ত রায় দিল্লীর উপকণ্ঠে লুট-তরাজ্যের অভয়ারণ্য করেছেন।

ওদিকে আরেক রাজপুত্র সর্দার হেমরাজ তার অধীনস্ত বাহিনী নিয়ে আজমীরের ওপর হামলা করে আজমীরকে পুনরুদ্ধার করেছে এবং ওখানের করদাতা রাজা কালুকে শহর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কালুরাজ যেহেতু মুসলিম করদাতা ছিল সেহেতু তাকে সাহায্য করা আইবেকের জন্য ফরয হয়ে দাঁড়াল।

মুহাম্মদ ঘুরির ভারত ছাড়ার পর আরেকবার এদেশ অশান্ত হয়ে ওঠল কিন্তু আইবেক ভগ্নোৎসাহ হবার পাত্র নন। তিনি ২০ হাজার সৈনিক নিয়ে চিত্তরায়ের মস্তকচূর্ণ করতে দিল্লী অভিমুখে ধেয়ে এলেন। আর হাম্মাদ-এর দায়িত্বে দিলেন আজমীর পুনরুদ্ধারের কাজটি।

চিত্তরায় আইবেকের আগমনি শুনে কেঁপে ওঠলেন। প্রথম দিকে তিনি খোলা ময়দানে আইবেকের সাথে মোকাবেলা করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। পরবর্তিতে তিনি এ পরিকল্পনা মুলতবী করলেন। চিত্তরায় আইবেকের মুখোমুখি না হয়ে হেমরাজের দলে যোগ দিতে আজমীরের উদ্দেশ্যে পালাতে শুরু করেন। তার ইচ্ছা, আজমীরে একত্রিত হয়ে আইবেকের সাথে লড়াই করা।

ওদিকে আজমীরের উপকণ্ঠে হাম্মাদের আগমনি জেনে হেমরাজ তার বাহিনীসহ খোলা ময়দানে নামলেন কিন্তু তিনি শোচনীয়ভাবে পরাভূত হলেন এবং দিল্লীর দিকে ছুটে গেলেন। তার ইচ্ছা, দিল্লীতে অবস্থানরতঃ চিত্ত রায়ের সাথে মিলে মুসলিম বাহিনীকে পর্যুদস্ত করা। হাম্মাদ হেমরাজের পিছু ধাওয়া করে নিয়ে যাচ্ছিল। ওদিকে চিত্তরায়কে ধেয়ে আজমীরের দিকে নিয়ে আসছিল। এক সময় উভয় সৈন্য মুখোমুখি হল। উভয় হিন্দুসেনা হতাশ। তারা বাধ্য হলো যুদ্ধ করতে। তবে এ যুদ্ধ জয় লাভের নয়। যুদ্ধ অস্তিত্ব রক্ষার। এ যুদ্ধে চিত্তরায় ও হেমরাজ মারা পড়লেন। শত্রুপক্ষের বাদবাকী ফৌজ নারোয়ালের দিকে পালিয়ে গেল।

নারোয়ালের রাজা রাজপুতদ্বয়ের শোচনীয় পরাজয়ের কথা শুনে অর্জুনের বিশাল একদল ফৌজ মুসলমানদের মোকাবেলায় প্রেরণ করলেন। কিন্তু অর্জুন যুদ্ধে নেমে অবস্থা বেগতিক দেখে আত্মরক্ষাকল্পে রণেভঙ্গ দিল। এ যুদ্ধে অসংখ্য হিন্দু মারা পড়ল। শেষ পর্যন্ত হাম্মাদ ও আইবেক দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলেন।

তিন.

দিল্লীতে বেশ কিছুদিন অবস্থান করার পর কুতুবুদ্দীন আইবেক শুনতে পেলেন, নারোয়ালের রাজার পতাকাতলে হিন্দুস্থানের রাজপুতরা একতিত্র হচ্ছেন। রাজা মশাই অর্জুনকে সেনাপতি হিসাবে নিয়োগ দান করলেন। অর্জুন মুসলিম ফৌজকে

নাস্তানাবুদ করতে সুদক্ষ বাহিনী গড়ে তুললেন। এমন সুদক্ষ বাহিনী ইতিপূর্বে গঠন করা হয়নি। নারোয়াল ছেড়ে এই বাহিনী আজমীরের উদ্দেশ্যে ধেয়ে গেল। তারা প্রতিজ্ঞা করে বলল, আজমীর জয় করে সেখানে রামরাজ্য কায়েম করা হবে। যেকোন উপায়ে আজমীর তাদের চাই-ই।

আইবেক ও হাম্মাদ আজমীরের পথে এদের বঁবাধা দিল। রাজপুতদের সাথে শুরু হোল মারাত্মক লড়াই। দুর্ভাগ্যবশতঃ যুদ্ধকালীন কুতুবুদ্দীন আইবেকের ঘোড়া যখমী হোল। যমীনে পতিত হবার পর কুতুবুদ্দীন উঠতে পারলেননা। মুসলিম ফৌজ মনে করল, তাদের আমীর বুঝি আর নেই।

সুতরাং তাদের মনোবলে চিড় ধরল এবং তারা পিছ পা হতে শুরু করল।

আইবেকের কাছটিতে যুদ্ধ করছিল হাম্মাদ। আইবেককে সে ঘোড়া থেকে পড়তে দেখছিল। দ্রুত সে আইবেক কে আপনার ঘোড়ায় তুলে নেয় এবং দুশমনের কোপানল থেকে বেরিয়ে যায়। হাম্মাদ আইবেককে শত্রুর মুখে থেকে কেড়ে নিলে অর্জুন ওদিকে অগ্রসর হতে থাকে। চিৎকার দিয়ে বলে, 'শুনেছি তুমি নাকি হাম্মাদ বিন খালদুন। শোন আমার নাম অর্জুন। আমি রত্নার বাগদত্ত, হবু স্বামী। হিম্মৎ থাকলে আমার মোকাবেলায় এসো। রত্নাকে নিশাপুর নিয়ে তুমি যে অন্যায় করেছ, এর শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে।

হাম্মাদের এসব কথায় কোন প্রতিক্রিয়া নেই। এমনকি মোকাবেলায়ও নামল না সে। তার এখনকার কাজ যখমী আইবেককে দ্রুত ময়দান থেকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া। সুতরাং সে দ্রুত সটকে পড়ল। অর্জুন একে হাম্মাদের পক্ষ থেকে কাপুরুষতা মনে করল এবং সর্বশক্তি নিয়ে মুসলিম ফৌজের ওপর চড়াও হোল। যুদ্ধের ভয়াবহতা আঁচ করতে পেরে হাম্মাদ তার বাহিনীকে পিছপা হতে বলল। সকলেই আজমীরের কেল্লায় প্রবেশ করে ফটক বন্ধ করে দিল। অর্জুন ওদের পশ্চাদ্ধাবন করে আজমীর অবরোধ করল।

গজনীতে সুলতান আইবেকের যখমী হাল শুনলেন। অনুধাবন করলেন হাম্মাদের অসহায়ত্বের ব্যাপারটি। এসময় তিনি তার নামজাদা জেনারেল আসাদুদ্দীন আরসালান খিলজী, ইসলাম খান, নসরুদ্দীন হুসাইন, এযদুদ্দীন মোয়াইয়েদ ও শরফুদ্দীনের নেতৃত্ব সুদক্ষ সুশিক্ষিত একদল ফৌজ হাম্মাদের মদদে প্রেরণ করলেন। এ জানবায বাহিনী শীতের তীব্রতা উপেক্ষা করে আজমীরের দিকে ছুটে এল।

আজমীরে কয়েকমাস অবস্থান করে হাম্মাদ তার বাহিনীকে তাজাদম করে নিল। ইতোমধ্যে আইবেকের যখমও চাঙ্গা হলো। পরবর্তীতে গজনীর নয়া বাহিনীর আগমনি শুনে তাদের শক্তি আরো বহুগুনে বেড়ে গেল। তারা এবার প্রকাশ্য ময়দানে দুশমনের মোকাবেলায় নামার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করল।

রাজপুতগণ গজনী থেকে নয়া ফৌজ আগমনের কথা শুনে অর্জুনকে বলল, তাজাদম ফৌজের সাথে আমরা লড়ে পারব না। কাজেই আমজীর অবরোধ তুলে

নেয়াই ভাল। এমন না হয় যে, হিন্দুস্থানে আমাদের নিভু নিভু শক্তিটুকুও দপ করে নিভে যায়। এমনকি অনেক রাজপুত এ পর্যন্ত বলল যে, আইবেক ও হাম্মাদ গজনীর ফৌজ দ্বারাই আমাদেরকে যে কোন সময় পরাস্ত করতে পারে। খুব সম্ভব ওরা কোন দূরভিসন্ধি নিয়ে আমাদেরকে এ অবরোধে আটকে রেখেছে। আসলেও ঘটনা তা-ই। কেননা রাজপুতদের এ দল আইবেক ও হাম্মাদের কাছে তেমন একটা উদ্বেগের বিষয় নয়। কেননা এদেরকে মুসলিম ফৌজ তো ময়দানেই পরাভূত করেছেন।

অর্জুন কোন সর্দারের কথা মানতে রাজী নয়। যে কোন মূল্যে সে মুসলমানদেরকে একবারের জন্য হলেও দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে চায়। সে চাচ্ছিল গজনী থেকে আগত বাহিনীকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাঝপথেই থামিয়ে দিতে। বাধ্য করতে চায় ন্যাক্কারজনক শর্তে কুতুবুদ্দীন আইবেক ও হাম্মাদকে মাথা নত করতে। এ আশায় অর্জুন গজনী থেকে আগত তাজাদম ফৌজের সামনে তার ফৌজকে দাঁড় করায়।

এদিকে যুদ্ধ শুরু করার পূর্বেই লাহরের দরোজা খুলে যায়। হাম্মাদ ও আইবেক অর্জুন বাহিনীর ওপর চড়াও হয়। এদের ঝটিকা আক্রমনে রাজপুতদের ভিতে কাঁপন ধরে। পরাস্ত হয়ে তারা রণে ভঙ্গ দেয়। গজনী থেকে আগত ফৌজের যুদ্ধ করার সুযোগ-ই এলো না। অর্জুন নারোয়ালমুখী হয়ে কোনক্রমে প্রাণে রক্ষা পেল।

কুতুব ও হাম্মাদ গজনীর জেনারেলদের সাথে আলাপ করছিল। এমন সময় হাম্মাদকে লক্ষ্য করে কে যেন বলে ওঠল, ভাইজান! ভাইজান!!'

হাম্মাদ পিছনে তাকিয়ে দেখল হাসান ওকে ডাকছে। হারেস দাঁড়ানো-ওর পাশটিতেই। হাম্মাদ হারেসকে লক্ষ্য করে বলল, 'জানতাম না গজনী থেকে আগত বাহিনীতে তোমরাও অন্তর্গত। এখানে আসার আগে তোমরা কি বাড়ী গিয়েছিলে?'

হারেসকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে হাসান বলল, 'ভাইজান! সুলতানের সাথে হিন্দুস্থানে আগমনের পর আমরা অল্প কদিনের জন্য বাড়ী গিয়েছিলাম। আব্বা-আম্মা আপনাকে খুব স্মরণ করেন।'

কুতুবুদ্দীন হাম্মাদের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'তোমরা ভায়েরা আলাপ করো। আমি সৈন্যদের শহরে যাওয়ার এন্তেযাম করি।'

কুতুবুদ্দীন ওখান থেকে চলে গেলে হারেস অভিযোগের সুরে বলল, 'ভাইজান! হাসান আমাকে বারবার বিব্রত করে। রাতে আমার জুতোয় পানি ভরে রাখে। আমরা দু'ভাই বাড়ী গেলে আব্বা আমাকে একটি বর্ম কিনে দেন। আমার বর্ম পুরানা বিধায় আব্বার এই কিনে দেয়া। আমরা গজনী ফিরে গেলে হাসান সেটি দখল করে। এখনও অব্দি আমার বর্মটি ফেরৎ দেয়নি সে।'

হাম্মাদ লালচোখে হাসানের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হাসান! বড় ভাইকে এভাবে বিব্রত করতে আছে! তার বর্ম ফিরিয়ে দাও। তোমাকে আজমীরের বাজার থেকে আজই আমি নয়া বর্ম কিনে দেব। ফের কোনদিনও হারেসের জুতোয় পানি ভরে রাখলে তোমাকে পেটাব।'

'শুধু কি তাই ভাইজান! বাড়ী গিয়ে রত্না বোনকেও সে বিব্রত করে। এই তো শেষ বার যখন আমরা বাড়ী যাই তখন রত্নাবোন রান্না করছিল। ও কড়াইতে এক মুঠি লবণ ফেলে দেয়। অবশ্য মা তা দেখে আচ্ছা করে ওর কান মলে দেন এবং আব্বার কাছে নালিশ করেন। আব্বা ওকে বকাঝকা করলেও ওর দুষ্টু মনে তেমন কোন প্রভাব ফেলেনি।

হাসানের বিরুদ্ধে অভিযোগের ডালি শুনে হাম্মাদ হো হো করে হেসে ওঠে। হাসান আত্মপক্ষসমর্থনে বলে ওঠে, ভাইজান! ঘরের খবর রণাঙ্গনে ফাঁস করা কী ধরনের বুদ্ধিমত্তা।'

'এত কিছু যখন বোঝ! তখন দুষ্টুমি কর কেন। দুষ্টুমি করা ছাড়া তোমার পেটের ভাত হজম হয় না বুঝি।' হাসতে হাসতে বলল হাম্মাদ।

হাসান চোখ লাল করে হারেসের দিকে তাকাল। বলল, 'আরো কিছু তোমার পেটে থাকলে উগড়ে ফেলছ না কেন?'

হারেস মুচকি হেসে বললো, 'আরো দুটি মারাত্মক অভিযোগ আছে ওর বিরুদ্ধে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। তা বাকী থাকবে কেন! হাসানের কণ্ঠে বিরক্তির সুর।

'ভাইজান! বোন রত্নার সাথে ও আরো দুটি দুষ্টুমি করেছে। একদিন তিনি ঘুমিয়েছিলেন। তার মুখ কিছুটা খোলা ছিল। হাসান তার মুখে মুঠি ভরা বালি দেয়। রত্না বোন ধড়ফড়িয়ে ওঠলে ও পালিয়ে যায়। আরেক দিন তিনি রান্না করছিলেন। ওর মনে দুষ্টুমি খেলে যায়। আচমকা কোত্থেকে একটা টিকটিকি ধরে এনে তার পায়ের উপর ছুঁড়ে মারে। রত্না ভয়ে চিৎকার দিয়ে রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। ওইদিন মা ওকে খুব বকেন।

এরপর হারেস বলে, 'হ্যাঁ ভাইজান বোন রত্না আপনাকে একটা পত্র দেন। এ পত্রে হাসানের দুষ্টুমির কাহিনী উল্লেখ আছে। হারেস হাম্মাদের হাতে পত্র তুলে দেয়। হাম্মাদ পত্র পাঠে মগ্ন হয়।'

হাম্মাদ পত্র পাঠ করে হারেসকে বলে, কৈ এ পত্রে হাসানের বিরুদ্ধে তো কোন অভিযোগ নেই।' হাসানের মুখোজ্জ্বল হয়ে ওঠল। সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বলল, 'আমার বোন হারেসের মত গীবতকারিনী হলে তো অভিযোগ করবেন। ভাইজান! হারেস আপনাকে দিয়েছে বোনের পত্র আর আমি আপনাকে দেব তারই হাতে বানানো দই।' বলে হাসান থমকে গেল। কেননা সেনারা তখন শহরমুখো হওয়া শুরু করে দিয়েছে।

হাম্মাদ বললো, 'এসো তোমরা! তোমাদের অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ শোনব। তিনও ভাই শহরের দিকে রওয়ানা হোল।

কুতুবুদ্দীন ও হাম্মাদ বেশ কদিন আজমীর অবস্থান করেন। এ সময় তারা ওইসব সর্দারদের খুঁজে বের করেন যারা অর্জুনের হয়ে মুসলিম প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর তোলে। এসব কাজে সৈন্যদের কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়। বিদ্রোহের মস্তকচূর্ণ করে হাম্মাদ সৈনিকদের সাথে দিল্লীর পথে রওয়ানা হয়। ওদিকে হাসান ও হারেস খিলজী জেনারেলের সাথে স্বরসতীর কিনারা ধরে দক্ষিণমুখো হয়।

চার.

একদিন বিদ্যানাথ, সাবিত্রী ও বিমলা ঘরোয়া আলাপ করছিল। এ সময় বাইরের ফটকে কারো করাঘাত শোনা গেল। তিন জনেই দৌড়ে বাইরে এল। সূর্য তখন ডুবু ডুবু জ্ঞানও করাঘাত শুনে দরোজার দিকে এগিয়ে গেল। দরোজা খুলে দেখল হারেস ও হাসান দণ্ডায়মান। জ্ঞান খানিক ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। বলল, 'আমার দৃষ্টি আমার সাথে প্রতারণা করে না থাকলে নিশ্চয়ই তোমরা দুজন হারেস ও হাসান। তবে তোমাদের মধ্যে কে হাসান আর কে হারেস জানি না।

হারেস কিছু বলতে যাচ্ছিল। এ সময় হাসানের মনে এল দুষ্টুমি। ও বললো, 'তোমার দৃষ্টিভ্রম ঘটেছে। দৃষ্টি তোমার সাথে প্রতারণাই করেছে। আমাদের কেউই হারেস কিংবা হাসান নয়। কি করে বুঝলে যে, আমরা হারেস ও হাসান?

'কিন্তু তা কি করে সম্ভব। তোমাদের চেহারা তো মুনিব হাম্মাদের মত অবিকল।

রাগতঃস্বরে হারেস হাসানের দিকে তাকাল। কিন্তু হাসান ওকে বলার সুযোগ না দিয়ে বললো, 'বিশেষ এক কাজে আমরা বিদ্যানাথের কাছে এসেছি। আমাদেরকে তার কাছে নিয়ে চল।'

ভেতর হাবেলীতে দণ্ডায়মান সাবিত্রী, বিদ্যানাথ ও বিমলার দিকে তাকিয়ে জ্ঞান বলল, ওই যে উনি, দেখা কর গিয়ে।

জ্ঞান অগ্রসর হলে হারেস বলল, 'ভাই তোমার নাম কি?'

'জ্ঞান চন্দ্র। মানুষে আমাকে জ্ঞান নামেই ডাকে।'

রাগত স্বরে হাসানের দিকে তাকিয়ে ও বলল, 'আমার নাম হারেস। আর ও আমার ভাই হাসান। ওর প্রকৃতিতে দুষ্টুমি ভরা। ও তোমার সাথে ঠাট্টা করেছে। আমরা হাম্মাদেরই ভাই। নিশাপুরের বোন রত্নার একটা চিঠি নিয়ে এসেছি। হাম্মাদ ভাইজান তোমাদের সকলকে সালাম জানিয়েছেন।

জ্ঞান মুচকি হেসে উভয়ের হাত থেকে ঘোড়ার লাগাম নিল। বলল, 'তোমরা হাম্মাদের ভাই হলে বাইরে এভাবে দাঁড়াবে কেন। ভেতরে এসো। জ্ঞান উভয়কে নিয়ে অন্দরে গেল। অন্দর আঙিনায় এসে বিদ্যানাথকে বলল, 'ওরা হারেস ও হাসান। হাম্মাদের ছোট ওরা। বিদ্যানাথ অগ্রসর হয়ে উভয়ের সাথে কোলাকুলি করেন। বলেন, 'তোমরা এ হাবেলীরই সন্তান।

হারেস পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে তার হাতে দিয়ে বলল, 'বোন রত্নার পত্র।'

ওরা তিনজনই পত্র পাঠ করে। সকলের চেহারায় খুশীর ঝিলিক। পত্র পাঠান্তে বিদ্যানাথ আসমানের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আল্লাহ তায়ালার লাখো কোটি শোকর নিশাপুরে ও শান্তিতে আছে।

বিদ্যানাথের মুখে 'আল্লাহ' নাম শুনে হারেস হাসান চমকে ওঠে। তিনি ওদের দুজনের হাত ধরে বলেন, 'এসো ভেতর এসো। তোমরা দুভাই এখানে কটা দিন থেকে যাবে।'

সন্ধ্যা আঁধারী পড়ে গেছে। হারেস বলল, নামাযের ওয়াক্ত হয়েছে।'

'ভেতরে চল। সব ব্যাবস্থাই আছে।' বললেন বিদ্যানাথ। সকলে ভেতরে চলে যায়।

পাঁচ.

উচ্ছল রত্না নিশাপুরের প্রাকৃতিক ঝর্ণা থেকে পানি তুলছিল। আচমকা কারো ডাকে ওর উচ্ছলতায় ছেদ পড়ল। রত্না! রত্না!! ও দ্রুত কলসী কাঁখে দাঁড়িয়ে গেল। বুড়ো খালদূন টিলার ওপর থেকে ওকে ডাকছেন। জলদী ঘরে এসো বেটি! মেহবান এসেছেন।' রত্না দ্রুত পাহাড় বেয়ে ওঠে যায়। এ সময় মেহমান! সে আবার কে! নিশ্চয়ই হাম্মাদ। হাম্মাদ ছাড়া এ জগতে তার আর কেইবা আছে। বুকের ধড়াস ধড়াস অনুভূতি কেবল একথাই বলে চলেছে।

টিলার ওপর উঠে রত্না বলল, 'কে এসেছে বাবা!'

খালদূন গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'তুমি ভেতরে গিয়েই দেখ না। তোমার কোন আত্মীয়-ই হবেন। তুমি ওদের সাথে গিয়ে দেখা কর। আমি বাগান থেকে আপেল পেড়ে নিয়ে আসি।'

রত্না আরো কিছু বলতে চাচ্ছিল কিন্তু খালদূন দ্রুত টিলা বেয়ে নেমে যান। রত্নার মাথায় তোলপাড়। তাহলে আগন্তুক আমার হাম্মাদ নয়। ও না এলে এমনকে আছে আমার আত্মীয়? ওর দেমাগে খটকা লাগছে। হতে পারে বাবা আমার সাথে ঠাট্টা করেছেন। এসেছে হাম্মাদ-ই।

দ্রুত ও ঘরে যায়। পানির কলসী যথাস্থানে রাখে। আসে মায়ের কাছে। তিনি রান্নাঘরে রান্না বান্নায় ব্যস্ত। রত্না জিজ্ঞাসা করে, 'মা! কে এসেছে?'

মা বললেন, 'জানি না বেটি। ওরা ১০/১২ জন এসেছে। তোমার বাবার সাথে ওদের কথা হয়েছে। আমি ওদের জন্য খানা তৈয়ারী করছি। যাও ওদের সাথে দেখা করে এসো। ওরা বৈঠক খানায় বসেছে।'

রত্না হাম্মাদের রুম সংলগ্ন বৈঠক খানার পর্দা সড়াল। পর্দা সড়িয়ে দেখল ১০/১২ জন লোকসহ অর্জুন উপবিষ্ট। অর্জুনও রত্নাকে দেখে ফেলল।

রত্না ঘটা করেই পর্দা ফেলে দিল। অজানা আশংকায় ওর দিল দেমাগ দুরু দুরু করে ওঠল। অর্জুন তৎক্ষণাৎ পর্দা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করল। রত্না হাম্মাদের পালংকে বসা। গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে সে। কল্পনার ধুসর পাখায় হাতড়ে বেড়াচ্ছে ও পেছন অতীতকে। রত্নার দিকে তাকিয়ে অর্জুন অবাক হয়ে যায়। নিশাপুর এসে রত্নার সৌন্দর্য বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। চেহারায় লাবণ্যতা বেড়ে গেছে বহুগুন। রত্নাকে দেখে অবাক হবার পাশাপাশি তেলে বেগুনে জ্বলেও ওঠে অর্জুন। অর্জুন ডাকে, 'রত্না! রত্না!!'

মাথা উঁচিয়ে অর্জুনের দিকে তাকায় রত্না। বলে, 'তুমি এখানে এসেছ কেন? রত্নার কণ্ঠে বিরক্তির সুর।

'তোমাকে নিতে এসেছি।' অর্জুন বলে শান্ত নদীটির মত।

'এক্ষণে আমি কোথাও যেতে পারব না।'

'তোমার কারনেই আমার এই দূর সুদূরে আসা আর তুমি কিনা যেতে পারবে না। আমি তোমাকে হিন্দুস্থানে নিয়ে যাব।' বলল অর্জুন।

রত্না এতক্ষণ শান্ত কণ্ঠে জবাব দিয়েছে। এবার ওর কণ্ঠ উচ্চকিত হয়ে যায়। বলে, 'আমার বাড়ী হিন্দুস্থান নয় নিশাপুর। হিন্দুস্থানের সাথে আমি সব ধরনের সম্পর্ক ছেদন করেছি। হিন্দুস্থান আমি ভুলে গেছি। ওখানে মানুষ নেই। আছে শৃগাল-কুকুর। হরে কৃষ্ণ হরে রাম এর রাজ্যে আর না যাওয়ার সিদ্ধান্ত আমার। পাহাড় জংগল, অরণ্য মাঠ পেরিয়ে আমি এখানে এসেছি এক জনের হাত ধরে। এই যে পাহাড় ও অরন্যানি আমার জীবন যৌবনের স্বপ্নের ভূবন। আমি হিন্দুস্থান ঘৃণা করি। আমি হিন্দুধর্মে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওই ধর্ম জলাঞ্জলি দিয়েছি।

'তোমার কথার মতলব তুমি হিন্দু ধর্মত্যাগী হয়েছ?' চোখ লাল করে প্রশ্ন করে অর্জুন।

'তোমার ধারণা যথার্থ। আমি এখন হিন্দু নই মুসলমান হয়েছি। আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি।'

'তুমি এখানে এসে বিয়ে করেছ কি?'

'তা অবশ্য করিনি। তবে হাম্মাদের সাথে অচিরেই আমার বিয়ে হতে যাচ্ছে।

'কে এই হাম্মাদ! কিসের টানে কিসের মোহে কি কারণে ওর প্রতি তোমার এই মোহ?'

'ও আমার আরাধনা, আমার স্বামী, আমার নাথ আমার প্রেম-ভালবাসা। ওর প্রেমে আমি অন্ধ। ও আমার জীবনের বন্ধদ্বার খুলে দিয়েছে। ওর চরণে নিজকে সঁপে দিয়েছি। ওর বদলে আমার চরণে কেউ রাজাসন ফেললেও আমি তা প্রত্যাখ্যান করব। ওই-ই আমার ধর্ম কর্মের মালিক।' এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে হাঁপিয়ে ওঠল রত্না।

'ও কি আমার চেয়ে কান্তিমান, শক্তিশালী?'

'শোন অর্জুন। তুমি ওর পায়ের ধুলোর সমানও নও। তোমার আর তার মাঝের পার্থক্য রাজা ও ভিখারীর। তারকার মাঝে চাঁদের যে স্থান তোমার আর তাঁর মাঝে সেই ব্যবধান।

'রত্না! এক যবন তোমাকে যাদু করেছে। যদ্দরুন তুমি নরবেদ হয়েছে। হয়েছ ধর্মত্যাগী।'

'আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না। সত্যিই আমি নরবেদ–ধর্মত্যাগী। এ ঘর আমার। এ ঘরেই আমার স্বামীর বাস। বাস আমার মা বাবার। স্বামীর বাড়ী নারীদের কাছে স্বর্গের মতই উচ্চ।'

'কেন তুমি জানো না তোমার সাথে শৈশবে আমার বাগদান হয়েছিল? আমার অনুমতি ছাড়া তুমি এখানে এসে মহাপাপ করেছ।'

'কারো সাথে বাগদানের কথা আমার জানা নেই। আমাদের বাবা-মা শৈশবে এমনটা করে থাকলে তারা ভুলই করেছেন। মনে রেখ অর্জুন! আমি স্বেচ্ছায় এখানে এসেছি। কেউ তুলে আনে নি আমায়। এ ঘর হাম্মাদ বিন খালদুনের। তাকে আমি ভালবাসি। সেই সূত্রে এ বাড়ী আমার। এই ঘরের প্রতিটি ইষ্টক খন্ড ও বালুকনার সাথে আমার প্রেম। পক্ষান্তরে শৈশবের বাগদানের সূত্র ধরে তুমি এখানে এসে থাকলে বলব চলে যাও। তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি তোমাকে চিনি না জানি না।' বলল রত্না।

'তুমি কোন হাম্মাদ বিন খালদূনের কথা বলছ? সেই কাপুরুষের কথা বলছ, আজমীরে আমার তাড়া খেয়ে যে কেল্লায় আশ্রয় নিয়েছিল। আমি তাকে ডেকে বলেছিলাম তুমি রত্নাকে নিশাপুর নিয়ে মহাপাপ করেছ এর শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে। আমি তাকে শক্তি পরীক্ষার জন্য আহবান করেছিলাম কিন্তু সে পালিয়ে গিয়েছিল।

আমি চাচ্ছিলাম ওর গর্দান কেটে ফেলতে। চেয়েছিলাম ওই দাম্ভিকের মাথাটি তোমার চরণে উৎসর্গ করতে। পরে তুমিই ফায়ছালা করতে কে বীর আমি না তোমার প্রেমাপম্পদ কাপুরুষটি।'

'মিথ্যা বলছ তুমি! সে রনাঙ্গনের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। তুমি তাকে আহবান জানালে তার সটকে পড়ার কথা নয়। হাম্মাদ তোমার পিছে পৃথিবীর অপর কোনে যেয়ে হলেও হামলা করবে। কোন জালেম তাঁর চলার পথে অন্তরায় হতে পারে না। চলার পথের প্রকান্ড প্যাথরগুলোকে সে ল্যাথি মেরে গুঁড়িয়ে দিতে জানে। দেখো! তুমি এমন এক কালজয়ী বীরপুরুষকে কাপুরুষ জ্ঞান করে মিথ্যাচারই করে যাচ্ছ। অস্তিত্বের প্রতিটি ক্ষণ যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকে সামান্য মিথ্যাচারে তা মায়া মরিচিকায় খেই খেয়ে যেতে পারে না।' ক্ষোভ ঝরে পড়ল রত্নার কথায়।

'তাহলে তোমার ধারনা আমি মিথ্যাচার করছি। ভগবানের দিব্যি করে বলছি, সত্যিই সে আমার মোকাবেলায় নামেনি।' বলল অর্জুন।

'সে কাউকে নিয়ে তখন পলায়ন করেছিল কী?' প্রশ্ন রত্নার।

যখমী আইবেককে নিয়ে সে পলায়ন করা অবস্থায় আমি আহবান করেছিলাম।'

'তাহলে তুমি কি করে তাকে কাপুরুষ ঠাওরাও। কোন মুখে বল সে তোমার মোকাবেলায় নামার সাহস পায়নি। আইবেকের জীবন রক্ষা ওই মুহূর্তে তার জন্য জরুরী ছিল বিধায় সে তোমার মোকাবেলায় আসেনি।'

থামল রত্না পরে দম নিয়ে বলল, শোন অর্জুন। হাম্মাদ এমন এক হিমালয় পাহাড়ের নাম যার সামনে জালেম এক নায়ক সকলেই মাথা নীচু করতে বাধ্য। সময় এলে দেখবে তোমার আর তার শক্তি ও পৌরুষে কতটা ফারাক। তোমার ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা চূর্ণ করতে কতটা ক্ষিপ্ত সে। ভগবানকে ধন্যবাদ জানাও অর্জুন। তার মোকাবেলায় তোমাকে নামতে হয়নি। নামলে আজ তোমাকে আমার সম্মুখীন হতে হত না। আমার প্রভু তাকে প্রতিটি ময়দানে বীর হিসাবেই প্রমাণ করেছেন। এই-ই আমার বিশ্বাস, এই-ই আমার আকীদা।

যাও অর্জুন। এখান থেকে চলে যাও। এটা নিশাপুরের যমীন-ট্রাম নয়। আমি এই মায়া জগতে শান্তি-সুখের নিঃশ্বাস ফেলতে পারছি। চলে যাও অর্বাচীন। তোমার অস্তিত্ব আমার জন্য নেহায়েত পীড়াদায়ক। আমার এখান থেকে চলে যাওয়াকে তুমি কল্পনাও করতে পারনা।'

রত্না! আমার ধৈর্য্যের পরীক্ষা নিও না। তোমার কথায় লাগাম টেনে ধরতে আমাকে বাধ্য করো না। আবারও বলছি তুমি আমার অনুমতি ছাড়া এখানে এসে মহাপাপ করেছ। এর শাস্তি তোমাকে পেতে হবে অতি অবশ্যই। আমি তোমাকে জ্যাঠা বিদ্যানাথের হাবেলীতে নিয়ে যাব এবং নিশাপুরের রাস্তা চিরদিনের তরে ভুলিয়ে দেব।

'মহাপাপের সাক্ষী খোদা-ই হন। তিনিই ভাল জানেন কে ভাল আর কে মন্দ। যাহোক তোমার সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই। আর তোমার সাথে বিদ্যানাথ মামার বাড়ীতে যাওয়ার প্রশ্নই আসেনা।

অর্জুনের ধৈর্য্যের বাধ ভেঙ্গে গেল। মানুষ অর্জুন এবার নেমে এল পশুত্বের স্তরে। সে রত্নার খুবছুরত হাতে টান মারল। বলল, 'দেখি তুমি আমার সাথে না গিয়ে পার কি করে। রত্নাকে টেনে বৈঠক খানার দিকে নিয়ে গেল।

এক ঝটকায় নিজকে ছাড়িয়ে নিল রত্না। ক্রুদ্ধ ফনিনীর ন্যায় ফোঁস করে ওঠল। বলল, 'নিজকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিওনা অর্জুন। যাও আমার সম্মুখ থেকে দূর হয়ে যাও।'

রত্নাকে তুলে নিতে উদ্যত হল অর্জুন এমন সময় লাঠি ভর দিয়ে মা কামরায় প্রবেশ করলেন। কড়া ভাষায় বললেন, 'তোমার ও রত্নার মধ্যকার সমস্ত কথা শুনেছি আমি। ওর সাথে তোমার কখনও বাগদান হয়ে থাকলে সময়ের পরিবর্তনে তা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। যাও বাবা! ভালোয় ভালোয় এখান থেকে কেটে পড়। রত্না এখান থেকে যাবে না কোথাও। ও এ ঘরের মেয়ে। আমার শেরদিল পুত্রের বউ হতে যাচ্ছে। ও তাঁর পবিত্র আমানত। যাও এখান থেকে চলে যাও।'

রত্না মায়ের পেছনে এসে দাঁড়াল দ্রুত। অর্জুন অগ্রসর হয়ে মাকে ধাক্কা মেরে ভূতলে ফেলে দিল। তাঁর হাত থেকে লাঠি খসে পড়ল। তিনি কষ্ট করে উঠে দাঁড়ালেন। এক হাতে লাঠি ধরে তা দিয়ে অর্জুনকে খোঁচা মেরে বললেন, 'দূর হও আমার সামনে থেকে নরপিশাচ। হায়! এ সময় আমার পুত্রদের কেউ উপস্থিত থাকত তাহলে বুঝতে কাদের মায়ের গায়ে হাত তুলেছ!'

অর্জুন ক্ষেপে গেল। বৃদ্ধা মায়ের মুখে প্রচন্ড এক চড় বসিয়ে দিল। বলল ষাঁড়ের মত গোঁ গোঁ করে, আমার পথ আগলে রেখ না বুড়ি। রত্নাকে কেউই আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

বৃদ্ধা-মা চড়ের আঘাত সহ্য করতে না পেরে বিছানায় পড়ে গেলেন। রত্না অগ্রসর হয়ে ক্ষিপ্রতার সাথে অর্জুনের গালে পরপর দুটি চড় কষে বলল, 'কমিনা। কমবখত! তুই আমার মায়ের গায়ে হাত তুলেছিস। তোর এই হাত আমি গুঁড়িয়ে দেব।'

অর্জুন রত্নার হাত ধরল শক্ত করে। আরেক হাতে রত্নাকে ধরে কামরা থেকে বের করে নিয়ে গেল। রত্নার মা মরতে মরতে উঠে দাঁড়ালেন। অর্জুনের হাত থেকে রত্নাকে বাঁচাতে কোশেশ করলেন। বললেন, দুষ্টু! আমার মেয়েকে ছেড়ে দে। নয়ত আমার পুত্ররা তোকে কাবাব বানিয়ে ছাড়বে।

অর্জুন রত্নাকে ছেড়ে বৃদ্ধা মাকে দু'হাতে উঠিয়ে যমীনে আছড়ে ফেলল। প্রকৃতিতে ভেসে ওঠল বৃদ্ধা মায়ের সকরুন আর্তনাদ। পাথরে আঘাত খেয়ে তার মাথা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। তিনি খামোশ হয়ে গেলেন।

ওদিকে অর্জুন রত্নাকে নিয়ে বৈঠক খানায় এল। ওখানে বসা সাথীদের লক্ষ্য করে বলল, চল যাই। আমাদের কাজ শেষ। এক্ষণে আর এখানে থাকা চলবে না। সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

রত্না চিৎকার দিতে লাগল। 'মা! মা! মায়ের পক্ষ থেকে কোন প্রত্যুত্তোর এল না। অর্জুন ওকে টেনে হিচড়ে বাইরে নিয়ে এল। বাইরে ওদের ঘোড়া দাঁড়ানো। ওরা তাতে সওয়ার হোল। রত্নাকে নিজের ঘোড়ায় বসাল। ঘোড়া রাস্তা ছেড়ে বাঁকা পথ ধরে চলল। যাতে কেউ ওদের পিছু নিতে না পারে।

ছয়.

ক্ষেত থেকে ঝুড়ি ভরে আপেল তুলে বাড়ী এসে রাজ্যের নিস্তব্দতা অনুভব করলেন খালদূন। রান্না ঘরে ঢোকলেন। সেখানে যাবীব কিংবা রত্না কাউকেই না পেয়ে তার মনটা ছ্যাৎ করে উঠল অজানা আশংকায়। তিনি লঘু আওয়াজে ডাকলেন— 'হাম্মাদের মা! হাম্মাদের মা!! তুমি কৈ? হাম্মাদের মায়ের কোন সাড়া শব্দ নেই। তিনি আবারো ডাকলেন, রত্না! বেটি আমার। তুমি কৈ? তোমরা মা-বেটি কেউ জবাব দিচ্ছ না যে।'

খালদূন মহাচিন্তায় পড়ে গেলেন। ঝুড়ি ভর্তি আপেল রান্না ঘরে রাখলেন। মাথার পাগড়ী সোজা করে হাবেলীর ভেতরে প্রবেশ করেন। রক্তের ঘ্রাণ এলো তার নাকে। দৌড়ে গেলেন আরো সামনে। রক্ত পাথারে সাঁতরাচ্ছেন তার জীবন যৌবনের প্রিয় মানুষটি। তিনি ভাঙ্গা আওয়াজে ডাকলেন, হাম্মাদের মা! কি হয়েছে তোমার। আমার অনুপস্থিতিতে এ কোন কিয়ামতে ছোগরা কায়েম হলো, কে করলো?

দ্রুত রক্তাক্ত দেহটা কোলে নিলেন নাড়ীতে হাত রেখে দেখলেন ওটি চলছে। হাম্মাদের মাকে ওই অবস্থায় ফেলে রেখে হল ঘরে প্রবেশ করলেন। এখানেই তিনি অর্জুনকে বসিয়ে রেখেছিলেন। হলঘরও তো খালী। তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। রত্নার ঘরে এসে দরোজা ধাক্কা দিলেন। রত্না! রত্না! তুমি কোথায় বেটি।'

আঙিনায় কেবল খালদূনের আওয়াজের প্রতিধ্বনি হল। তিনি উম্মাদ হয়ে গেলেন। পানির পেয়ালা উঠিয়ে হাম্মাদের মায়ের কাছে এলেন। মাথাটা কোলে তুলে চোখে মুখে পানি ছিটালেন। বৃদ্ধা যাবীব চোখ খুললেন। অসহায় নজরে খালদূনের দিকে তাকালেন। খালদূন বললেন, 'ওগো! তোমার একি দশা! কে তোমার প্রতি এই

অমানবিক আচরণ করেছে? আমাদের সেই মেহমানরা কৈ? রত্নাই বা গেল কোথায়? বড্ড কষ্ট করে বৃদ্ধা যাবীব বললেন, মেহমান নয় ওরা প্রতারক। ওদেরই একজনের নাম অর্জুন। রত্নার সাথে তার নাকি কোন সময় বাগদান হয়েছিল। জবরদস্তি মূলক সে রত্নাকে তুলে নিয়ে গেছে। ও খুব চিৎকার দিয়ে সাহায্য কামনা করেছিল কিন্তু ওর ডাকে কেউই সাড়া দেয়নি। আমি ওদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালে ওরা আমার এই দশা করে। রত্নাকে নিয়ে ওরা ভীমসেন গেছে। খুব সম্ভব বিদ্যানাথের বাড়ীতেই ওঠবে ওরা।

কথা বলতে গিয়ে বারবার তিনি কেঁপে উঠছিলেন। মাথা দিয়ে তখনও রক্তক্ষরণ হচ্ছে। এই অবস্থায় তিনি বলে চলেছেন, আমার দম ফুরিয়ে আসছে। হায়! এ সময় যদি বাবা হাম্মাদ আমার কাছে থাকত। ও যদি ওর ইনসাফের লাঠি জালেমের মাথায় নিক্ষেপ করতে পারত। আহ! আমার জীবন যখন মৃত্যুর মুখে তখন তুমি কোথায় বাবা। দস্যুরা না জানি রত্নার সাথে কী ব্যবহার করে। হায় হাম্মাদ তুমি যদি দেখতে দস্যুরা তোমার মায়ের সাথে কী ব্যবহার করেছে।'

তার চেহারায় মৃত্যুর রেখা ফুটে ওঠে। খামোশ হয়ে যান মা। খালদূন ডেকে বলেন, ওগো কথা বল। মায়ের চোখ বেয়ে অশ্রু নামে। শেষ বারের মত তিনি বলেন, হাম্মাদ তুমি কোথায়? হারেস, হাসান! তোমরা কোথায় বাবা! তোমার মা পরপারের যাত্রী হতে চলেছে। তোমাদের চেহারা না দেখেই তাকে চলে যেতে হল। হায় হায়! এই নরখাদক তোমরা জীবিত থাকতে কী করে হেরেমে প্রবেশ করল। তোমাদের ইজ্জত হরণ করে নিয়ে গেছে ওরা। হাম্মাদ! তোমার রত্নাকে ওরা তুলে নিয়ে গেছে। জানিনা আমি তখন জীবিত থাকব কিনা এ অপমানের প্রতিশোধ নিও তুমি। ভারতের কোণে কোণে তুমি শত্রুকে খুঁজে ফিরো। শয়তানের মাথায় তোমার কুড়ালের কোপ পড়লেই কেবল আমার অশরীরী আত্মা শান্তি পাবে।

আমার পুত্রগণ! খোদা তোমাদের ছহী-সালেম রাখেন। আর বলা হলো না। মায়ের মাথাটা এক দিকে কাত হয়ে গেল। বৃদ্ধ খালদূন হাউমাউ করে কেঁদে ওঠলেন। শক্ত প্রাণের অধিকারী খালদূন মৃত স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, মৃত্যুই তোমার প্রাপ্তি। যার তিনটা সন্তান অকর্ম, এক স্বামী বেঁচেও কোন কাজে এল না তার মরে যাওয়াই ভাল। তুমি তো গেলে কিন্তু আমি? চোখের পানি মুছে খালদূন একাকীই কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করলেন। পরে ঘরের ভেতরে এসে অস্ত্র সাজে সজ্জিত হলেন। আস্তাবলে এসে রত্নার ঘোড়ায় চেপে বাইরে এলেন। যাওয়ার সময় তিনি হাবেলীর প্রধান ফটকে তালা লাগিয়ে দেন। খানিক বাদে নিশাপুরের রাজপথ ধরে হিন্দুস্থানের উদ্দেশে ছুটে চললেন।

প্রতিশোধ

বিদ্যানাথের হাবেলীতে বেশ কিছুদিন অবস্থানের পর হারেস ও হাসান তাদের সেনা ছাউনীতে ফিরে গেল। ওদের সৈন্যদল ভাতিন্ডা থেকে ৪০ মাইল উত্তর পূর্বের একটি এলাকায় ছাউনী ফেলেছিল। এই সেন্যদলের প্রধান ছিলেন আরসালান খিলজী। ভাতিন্ডার প্রত্যান্ত অঞ্চলে উত্থিত দাম্ভিক বিদ্রোহী কিছু কবিলাকে শায়েস্তা করার দায়িত্ব দিয়ে তাকে প্রেরণ করেন কুতুবুদ্দীন আইবেক। ভাতিন্ডার মুসলিম গভর্নরের শক্তি এতটাই ছিল যে তিনি একাই এদের মোকাবেলা করতে পারতেন তথাপিও আইবেক নতুন প্রশাসনকে বিদ্রোহ দমনে না নামিয়ে আরসালানকেই প্রেরণ করেছিলেন।

জমকালো এক রাত্রীতে আরসালানের ফৌজি খিমায় হারেস ও হাসান ঘুমিয়ে ছিল। আকাশ ছিল পরিষ্কার। মিটিমিটি করে জ্বলছিল দূর অন্তরীক্ষের হাজারো সিতারা। হিমহিম ঠান্ডা বাতাস বইছিল সর্বত্র। টাপুর টুপুর করে নামছিল শিশিরকণা।

খিমার মধ্যে হারেস আচমকাই উঠে বসল। তার অবস্থাটা এমন যেন সে ভয়ানক কোন স্বপ্ন দেখেছে। সে স্বপ্নে রীতিমত সে ভয়ও পেয়ে গেছে। কান পেতে ওই অবস্থায় সে যেন কি শুনতে চাইছে। বাইরের প্রকৃতিতে কেমন একটা গুমোট বাধা নিস্তব্ধতা।

হারেসের কান সচকিত হয়ে ওঠে। বিশেষ এক ধরনের শিঙ্গার আওয়াজ আসে ওর কানে। কষ্ট পেলব মুখে হারেস বলে, 'কি সকরুন এই শিংগাধ্বনি। এ আওয়াজ তো আমাদের বাবাজানের। তিনি কোন মসিবতে পড়েছেন–হারেস এরচেয়ে বেশী কিছু ভাবতে পারছে না এই মুহূর্তে। কেননা শিংগার আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে। হারেস ওর গায়ের চাদর খুলে ফেলে। পাশেই শায়িত ছোট ভাইটিকে লক্ষ্য করে বলে—

'হাসান! হাসান! ওঠো ভাই আমার! আমাদের প্রতি নিশ্চয়ই কোন মসিবত এসে পৌঁছেছে।'

ধড় ফড়িয়ে উঠে বসে হাসান। হারেসের দিকে তাকিয়ে বলে, কি হোল ভাইজান!'

হারেস দরদমাখা কণ্ঠে বলে, 'হাসান! ভাই আমার! আমি এই মাত্র শিংগাধ্বনি শোনলাম। ওই ধ্বনি আমাদের বাবার এটা নিশ্চিত। মাঝরাতে তিনি আমাদের কেন

ডাকছেন। নিশাপুর থেকে তিনি এখানে কেন এসেছেন। আমাদের বাড়ীতে কোন সমস্যা হলো কী! মায়ের কোন সমস্যা! বাবার এখানে আসা নিশ্চয়ই কোন অশনি সংকেতের পূর্বাভাষ।

হারেসকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে হাসান বললো, 'ভাইজান! দুঃস্বপ্ন আপনাকে তাড়া করে ফিরছে বোধহয় এখনও। রাতের বেলা আমাদের বাবা এখানে আসতে যাবেন কেন। শিংগাধ্বনি যদি আপনি প্রকৃতই শুনে থাকেন তাহলে সেটা হাম্মাদ ভাইজানের— বাবার নয়।

আর তিনিইরা শিংগাধ্বনি দিতে যাবেন কোন দুঃখে। তিনি তো ইচ্ছা করলেই এ সেনা শিবিরে প্রবেশ করতে পারেন। তিনি আইবেকের নিযুক্ত জেনারেল। সেনাপতি আরসালানের কাছে এসে আমাদের খবরাখবর নিতে পারতেন। আরসালান তাকে আইবেকের সমমর্যাদা দিয়ে থাকেন। কাজেই ভাইজান দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়।'

হারেস মাথা নীচু করা অবস্থায়ই বললো, 'না না দুঃস্বপ্ন নয় হাসান আমি জাগ্রত অবস্থায় তার শিংগাধ্বনি শুনেছি। অপেক্ষায় আছি ওই ধ্বনি আবারও গুঞ্জরিত হয় কি-না।'

হাসান খামোশ হয়ে গেল। ইথার তরংগে আবারও ধ্বনিত হলো সকরুণ শিংগাধ্বনি। হারেস চকিতে প্রশ্ন করল, শোন হাসান! এটা শিংগা ধ্বনি নয় কি। এবারও কি বলবে এটা আমার শ্রুতিভ্রম।'

'না ভাইজান। এ আপনার শ্রুতিভ্রম নয়। নিশ্চয়ই এ শিংগাধ্বনি। অদ্ভুত ব্যাপার, ধ্বনিতো খুবই ব্যাথাতুর, ভয়াল ও হৃদয়বিদারক। শুনুন ভাইজান। লক্ষ্য করে শুনুন। এ ধ্বনি আব্বার ছাড়া আর কারো নয়। নিশ্চয়ই তিনি কোন মসিবতে আছেন। কেউ হয়ত তাকে দুঃখ দিয়েছে। তিনি আমাদের ডেকে চলেছেন।' বলল হাসান।

ফুঁসিয়ে ওঠা সাঁপের মত হারেস বলল, 'হাসান! হাসান! ওঠো ভাই তোমার শিংগা হাতে তুলে নাও। এসে দুভাই মিলে আমাদের শিংগা বাজিয়ে আমাদের বাবাকে সান্ত্বনা দেই। তিনি এখানে আসুন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করি, সুদূর নিশাপুর থেকে তিনি এখানে কেন? জেনে নেই, আমাদের বোন রত্না ও মায়ের খবরাখবর।'

হাসান তৎক্ষনাৎ উঠে দাঁড়াল। প্রথমে দু'ভাই সশস্ত্র হল। জিন তুলে দিল ঘোড়ায়। খিমার সামনে এসে ঘোড়ায় চপল। দুভাই-ই মুখে শিংগা লাগিয়ে ফুঁৎকার দিল। খানিকবাদে ইথারে যৌথ শিংগাধ্বনি বেজে ওঠল। ওদের ফুৎকার বন্ধ হলে অপর প্রান্ত থেকে আস্তে আস্তে এই ধ্বনির প্রত্যুত্তর শোনা গেল।

অপরপক্ষে আওয়াজটা উত্তর দিক থেকে আসায় ওরা দুভাই ঘোড়ার গতি উত্তর দিকে করল।

ফৌজি ছাউনী থেকে বেরিয়ে হারেস ও হাসান আবারও শিংগায় ধ্বনি তোলল। এবার এই ধ্বনির জবাব বা দিকের প্রান্তর থেকে পেল। ওই আওয়াজকে লক্ষ্য করে ঘোড়ার মুখ সেদিকেই ঘুরিয়ে নিল। কিছুদূর গিয়ে ওরা দেখল, জনৈক সওয়ার ওদের অপেক্ষায়। দুভাই দ্রুত তার কাছে গেল। দেখল ওদের বৃদ্ধ বাবা খালদুন অপেক্ষমান।

ওদেরকে দেখে বাবা ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে গেলেন। নামল ওরাও। পরস্পরে করল আলিঙ্গন। কুশল বিনিময়ের পর বাবা ভ্রু-কুঞ্চিত করে ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাদের বড় ভাইয়া কোথায়! বড্ড কষ্ট স্বীকার করে আমি এখানে এসেছি। ভাতিন্ডা শহরে এসে শুনেছি মুসলিম ফৌজ এখান থেকে ৪০ মাইল দূরে খিমা গেড়েছে। মনে করেছিলাম, এই বাহিনীর সাথে শরীক আছে হাম্মাদও। কিন্তু ওকে তোমাদের সাথে না দেখে আমি হতাশ হয়েছি বাবা! হায়! ও যদি তোমাদের সাথে থাকত। বলে তিনি ঠোঁট কামড়ে হাউ মাউ করে কেঁদে ওঠলেন। বললেন, আহ্ আমি কি হতভাগ্য মানুষ। আমি জীবিত থাকতে আমার ঘরদোর লুট হয়েছে। আহা ও যদি এখানে থাকত তাহলে হৃদয় বিদারক সে খবরে ও অগ্নিশর্মা হয়ে দুশমনের ওপর ঝাপিয়ে পড়ত।

হারেস অগ্রসর হয়ে বলল, 'বাবা! কে আপনাকে দুঃখ দিয়েছে! কী বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে নিশাপুর থেকে আপনি এখানে আসতে বাধ্য হয়েছেন? আর কেনই বা আপনার জামা রক্তাক্ত! চেহারায় উদাসীনতার ছাপইবা দেখছি কেন?

বাবার কাপড়ে শুকানো রক্ত শুঁকে হারেস বললো, বাবা! এ রক্তের মাঝে আমি আমার সত্বার অস্তিত্বের ঘ্রাণ পেতেছি। বলো কে তোমার ওপর হামলা করেছিল?

খালদূন চোখ বন্ধ করলেন। হাউ মাউ করে বললেন, 'নানা না! এরক্ত আমার নয় বাবা। 'তাহলে এ কার? বলুন বাপজান! আমাদের মা কোথায়? কোথায় বোন রত্না? আপনি একাকী হিন্দুস্থানে কেন? আপনি চুপ কেন? বলছেন না কেন–মা ও রত্নাকে কোথায় রেখে এসেছেন? আপনি এভাবে চুপ থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব যে।'

বৃদ্ধ খালদূন চোখ খুলে ব্যাথাতুর যবানে বললেন, 'প্রথমে আমাকে হাম্মাদের কাছে নিয়ে চলো, তারপর সব বলব কি হয়েছে সেকথা। চলো বাবা। আমাকে হাম্মাদের কাছে নিয়ে চলো।' তিনি খামোশ হয়ে গেলেন এবং ডুবে গেলেন চিন্তার অথৈ সাগরে। তার চোখে জ্বলে ওঠল প্রতিশোধের আগুন।

'বাবা! ভাইজান এক্ষনে দিল্লীতে, যা এখান থেকে বেশ দূরে। ভাইজানের কাছে যা বলতে চান তা আমাদের কাছে বলতে অসুবিধে কোথায়। আমরা না আপনার পুত্র। আমরা কি আমাদের মায়ের দুধ পান করিনি? কেন আপনি মূলকথা আমাদের থেকে এড়িয়ে যাচ্ছেন।

খালদুন দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বললেন, 'আহা! আমি চাচ্ছি হাম্মাদ শত্রুর মাথা দুমড়ে মুচড়ে দিক। তোমরা যদি আমাকে একান্ত বলতে বাধ্যই কর তাহলে শোন, তোমাদের মা বেঁচে নেই। শত্রুর আঘাতে সে এ জগতের সফর শেষ করেছে।' হারেস আর্তনাদ করে বলল 'উফ খোদা! এ কেমন হৃদয় বিদারক সংবাদ। হায়! এ খবর শোনার পূর্বেই যদি ইসরাফীল শিংগায় ফুঁৎকার দিয়ে দিত। বলুন! কে আমাদের মাকে হত্যা করেছে?'

'শোন তোমাদের মাকে হত্যা করে ওরা রত্নাকে ছিনতাই করে নিয়ে গেছে।'

হাসান বললো 'মা নিহত, বোন রত্না শত্রুর হাতে এগুলো কিসের সংবাদ আব্বাজান।'

খালদূন বললেন, হিন্দুস্থান থেকে জনৈক দস্যু এসেছিল। সেই-ই তোমাদের মায়ের হন্তা। সেই-ই রত্নাকে তুলে নিয়ে গেছে। শোন বাবারা! বিদ্যানাথের ভাতিজা অর্জুন যে নাকি কোন এক সময় রত্নার সাথে বাগদান করেছিল ১০/১২ জন জোয়ান নিয়ে আমাদের বাড়ী এসেছিল। আমি ওদের বসিয়ে আপেল আনতে গিয়েছিলাম। আপেল নিয়ে এসে দেখি তোমাদের মা রক্ত পাথরে সাঁতরাচ্ছেন আর তারাসহ রত্না উধাও। তোমাদের মা আখেরী দম নেবার আগে বলেছেন ওরা রত্নাকে তুলে নিয়ে জবরদস্তিমূলক বিয়ে করবে। আমার কোলেই তোমাদের মা শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন। উঠানেই তাঁকে দাফন করেছি। বলো, এ সময় নিশাপুর থেকে হিন্দুস্থান আসা ছাড়া আমার আর কিইবা করার ছিল।

'চলুন আব্বাজান! আমরা বিদ্যানাথের বাড়ী যাব। অর্জুনকে বলব, কাদের ইজ্জতের ও রক্তের সওদা করেছ তুমি। হ্যাঁ আব্বাজান! রত্না বোনকে ও বিয়ে করার পূর্বেই আমাদের ভীমসেন পৌছুতে হবে। রত্নার মদদ আমাদের জিম্মায় ফরয।' বলল হারেস।

'শোন। তোমাদের কথায় আমি ঐক্যমত পোষণ করছি। আমাকে ভীমসেন নিয়ে চলো। ভীম সেন কিংবা বিদ্যানাথের হাবেলী কোনটাই যে চিনি না আমি।'

তিনজনই মিলে এরপর ভীমসেনের উদ্দেশ্যে ছুটল।

মৃত্যুর কবলে হারেস

দূর প্রাচ্যের অজানা পর্বতমালার পাদদেশে সূর্য উদিত হয়ে বিশ্ববাসীকে তার আগমনি জানিয়ে দিচ্ছিল। ঝাকছাড়া পাখি নীড়ছেড়ে ছুটছিল খাদ্য-খাবারের অন্বেষণে। মর্তের নিস্তব্দতা কেটে যাচ্ছিল সেই সাথে একে একে। ঠিক এ সময় অর্জুন তার ১০/১২ জন সাথীসহ বিদ্যানাথের হাবেলীতে প্রবেশ করল।

রত্নাকে সে বসিয়েছিল ঘোড়ার আগে। তার দু'হাতই পিঠ করে ঘোড়া করে বাধা। সঙ্গীসাথীসহ অর্জুন আস্তাবলের সামনে এসে দাঁড়াল। ঘোড়ার খুড় ধ্বনি শুনতেই স্তান ও অন্যান্য কর্মচারীরা বেরিয়ে এল। অন্দর মহল থেকে বিমলা, সাবিত্রী ও বিদ্যানাথও বেরোলেন। সকলেই পেরেশান হয়ে আস্তাবলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বিশেষ করে রত্নাও অর্জুনকে দেখে তাদের সেই পেরেশানী আরো বেড়ে গেল।

সিড়িতে দন্ডায়মান বিদ্যানাথ অর্জুনের দিকে এগিয়ে যেতে মনস্থ করতেই দেখলেন অর্জুন রত্নাকে পাঁজাকোলা করে নামাচ্ছে। পরে কেটে দিচ্ছে ওর হাতের বাঁধন। অর্জুনই রত্নাকে নিয়ে বিদ্যানাথের কাছে এল। তিনি বিস্ময়ে বিমূঢ়।

সিড়িতে চড়তে চড়তে দৌড়ে বিদ্যানাথের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কেঁদে কেঁদে বলল, মামু! মামু! আমাকে এই হায়েনার হাত থেকে বাঁচান। ওর করাল গ্রাস হতে আমাকে রক্ষা করুন। ও বড্ড নিষ্ঠুর ও নরখাদক। আমি কারো আমানত। ও আমার দেহে কেন হাত লাগাল! নিশাপুর থেকে আমাকে জোরপূর্বক তুলে এনেছে। উফ্ মামুজান! ও আমার মাকে হত্যা করেছে। হায় মামুজান! বাবা যখন ক্ষেত থেকে আপেল ছিড়ে আনবেন তখন এসে দেখবেন তার স্ত্রী মৃত্যুর দুয়ারে উপনীত। খোলা উঠানে তিনি হয়ত আমাকে ডাকবেন। কিন্তু আমাকে না পেয়ে বিলকুল উন্মাদ হয়ে যাবেন। কিন্তু তিনি কী করে জানবেন যে, এক হায়েনা তার বেটিকে তুলে নিয়ে গেছে।

রত্না মামুজানকে তার বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে হাত জোড় করে বলল, 'মামুজান! আমার প্রতি রহম করুন। খোদার দিকে চেয়ে আমার প্রতি দয়ার্দ্র হোন। হাম্মাদকে খবর দিয়ে বলুন! তার ইজ্জতকে নিশাপুরে থেকে এক পিশাচ তুলে এনেছে।' বিদ্যানাথ রত্নার পিঠে হাত রেখে বললেন, 'তুমি যে মায়ের হত্যার কথা বললে সে কি হাম্মাদের মা!'

'হ্যাঁ। তিনি হাম্মাদের মা। তিনি আমাকে তার আপন মেয়ের চেয়েও অধিক পেয়ার করতেন। খোদার দিকে চেয়ে কাল বিলম্ব না করে ওকে খবর দিন।'

অর্জুন গোস্বায় অগ্নিশর্মা হয়ে বলতে লাগল, 'তুমি বারবার কোন খোদার নাম নিচ্ছ! একথা ভুলে যাও যে, তুমি এক মুসলিম এবং নিশাপুরের বাসিন্দা। শোন! যে যমীনে তোমার জন্ম সেখানেই তোমার মৃত্যু হবে। তোমাকে স্বধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তনের চিন্তা করতে হবে।

'না মামা। আমি মুসলমান আছি এবং থাকব। আমাকে শূলিতে চড়ানো হলেও। জ্বলন্ত চিতায় জ্বালানো হলেও। কোন অবস্থায়ই আমি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করব না।

অর্জুন রাগে দুঃখে রত্নাকে চড় মারতে উদ্যত হলে বিদ্যানাথ ওর হাত ধরে ফেললেন। বললেন, 'কি মনে করেছ অর্জুন! ওকে নিঃস্ব নিঃসম্বল মনে করেছ কি!'

সাবিত্রী স্বামীর পাশটিতে দাঁড়িয়ে বললেন, 'অর্জুন! রত্নাকে তুলে এনে তুমি মৃত্যু ডেকে এনেছ।'

বিমলাও চুপ থাকল না। বললো, 'কারো ইজ্জতের সাথে এভাবে ঠাট্টা করার পরিণতি সুখকর হয় না। হাম্মাদ শোনামাত্রই তুফান বেগে ছুটে আসবে।'

বিদ্যানাথ গোস্বায় ফুলে ওঠলেন। বললেন, 'অর্জুন! আমার ক'টা প্রশ্নের জবাব দাও।'

অর্জুন বললো, 'কী প্রশ্ন মামুজান।'

'তুমি কী হাম্মাদের মাকে হত্যা করেছ?'

'হ্যাঁ! করেছি। তিনি রত্নাকে ধরে রেখেছিলেন। এমনকি আমাকে লাঠি দ্বারা আঘাতও করেছিলেন।

'ওই সময় তাদের বাড়ীতে আর কে ছিল!'

'রত্না ও হাম্মাদের বৃদ্ধা মা।'

'কি লজ্জাস্কর কথা অর্জুন। যখন রত্নাকে হেফাজত করার কেউ ছিল না, সেই সময়ে তুমি রত্নাকে তুলে এনে বাহাদুরী ফলাচ্ছ যে! এ এক ধরনের বেঈমানী। জানো লোভে পাপ আর পাপে মৃত্যু? তুমি তোমার ধর্মের বিরুদ্ধে কাজ করেছ মূর্খ। ধর্ম রক্ষায় কল্যাণ আসে। তারপর এ জীবন ক্ষণিকের তরে। পুণ্য করতে না পারলেও পাপ করবে কেন। তুমি বেদ-বেদান্ত পড়নি। তুমি কি সেখান থেকে এই উপদেশ গ্রহণ করোনি যে, অপ্রাপ্তির সুখই আসল সুখ। তুমি কি জানো না, রত্না হাম্মাদকে ভালবাসে। ও ওকে পতি সাব্যস্ত করে ফেলেছে ইতিমধ্যে। ও নিজ উদ্যোগেই নিশাপুর গিয়েছিল কারো জবরদস্তিতে নয়।

অর্জুন শোন! যে স্বাদ বৈরাগ্যতায় তা দুনিয়া লিপ্সতায় নেই। তুমি যখন জানলে রত্না কারো আমানত তখন তার শরীর স্পর্শ করলে কোন সাহসে। কেন তাকে ভোগ-বিলাসের সামগ্রী মনে করে ছিনতাই করলে?'

অর্জুন গোস্বা জাহিরপূর্বক বললো, 'জ্যাঠামশাই! রত্না হাম্মাদের নয় আমার আমানত। ওর সাথে কী আমার বাগদান হয় নি? এরপরও কেন সে নিশাপুর গেল?'

'তা ছিল বৈকি। তবে সেটা সেই শৈশবে এবং ওর অজান্তেই। এখন ও জোয়ান। নিজের ভালমন্দ বুঝতে সক্ষম। এক্ষণে সে তোমাকে পছন্দ করছে না অথচ তুমি জোরপূর্বক ভালবাসা আদায় করতে চাচ্ছ। ওকে এখানে থাকতে দিয়ে তুমি চলে গেলেই ভাল।' বললেন বিদ্যানাথ।

অর্জুন চিৎকার দিয়ে বলল, 'জ্যাঠামশাই! এটা মনে করবেন না যে, নিজের লোকজন দিয়ে আপনি রত্নাকে আমার হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন। ওকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি আপনি ওর আর আমার মাঝে বিয়ে সম্পন্ন করে দেবেন বলে। আমাদের গোত্রে মুরুব্বী হিসাবে জীবিত আছেন কেবল আপনিই। আমার আশা, শুভ কাজটি আপনার মাধ্যমেই সমাধা হোক। জ্যাঠা! মনে করবেন না, আস্তাবলের সামনে দাঁড়ানো নগন্য কজনকে নিয়ে আমি এসেছি। দেউড়ীর বাইরেও বেশ কিছু ফৌজ আছে। তারা কেবল এ বসতি নয় গোটা এলাকায় মহাবিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে। আমার আর রত্নার মাঝে বিবাহ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত ওরা থেকেই যাবে। আমার অধীনস্ত এসব সঙ্গীদের বাড়ীতে এক মাসের খোড়াকীও প্রেরণ করেছি ইতোমধ্যে।'

বিদ্যানাথ দাঁতে দাঁত পিষে বললেন, 'অর্জুন! হাম্মাদের মাকে হত্যা করে রত্নাকে তুলে এনেছ জানলে সে তোমার প্রতি চরম প্রতিশোধ নেবে। সেও যদি একদল ফৌজ নিয়ে তোমার মোকাবেলায় এগিয়ে আসে তাহলে কি পরিণাম দাঁড়াবে— তাকি ভেবে দেখেছ? কে বাঁচাবে ওর হাত থেকে তোমাকে? আমার কথা মানলে তোমার পরিণতি ভালই হবে এবং এতে নিরাপত্তা সকলেরই। বাবা! তুমি ক্যাচাল এড়াতে রত্নার ওপর থেকে দাবী তুলে নাও।'

অর্জুন ভয়ানক কণ্ঠে বলল, 'তোমরা বারবার হাম্মাদ হাম্মাদ কপচাচ্ছ কেন! কেন আমাকে তার নাম শুনিয়ে প্রভাব সৃষ্টি করছ! হাম্মাদের প্রতি তোমাদের এতই ভরসা থাকলে তো তাকে আমার মোকাবেলায় ডেকে আনো। দেখি ওই বেটার শরীরে কত শক্তি। দেখি কি প্রভাবে সে রত্নাকে ফুসলেছে।'

এসময় বিদ্যানাথ বললেন, 'তাহলে আমার সাথে ওয়াদা করো যে, হাম্মাদ আসা পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা করবে। ওর আগমনের আগ পর্যন্ত বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করবে না। হাম্মাদ এসে রত্নার ওপর থেকে দাবী তুলে নিলে যা খুশী তাই করতে পার। কেউ তোমাকে তখন বাধা দেবে না।'

অর্জুন গাঢ় নযরে রত্নার দিকে তাকিয়ে বলল, 'প্রথমে রত্নাকে জিজ্ঞাসা করুন সে এ শর্তে রাজী কি-না।'

বিদ্যানাথ চোখের ইশারায় রত্নার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। রত্না মামুর ইশারা বুঝতে পেরে তৎক্ষনাৎ বললো, 'তুমি হাম্মাদকে মল্লযুদ্ধে হারাতে পারলে আমি ওয়াদা করছি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তোমাকে বিবাহ করব।'

অর্জুন আত্মতৃপ্তিতে এ প্রস্তাব মেনে নিল। বলল, 'আমি হাম্মাদের অপেক্ষায় প্রহর গুনব। তবে এর পাশাপাশি আমারও একটি শর্ত আছে, আর তাহলো, তাকে এখানে একাকী আসতে হবে। সেমতাবস্থায় আমার সাথে মল্লযুদ্ধ করে সে জিতে গেলে রত্না এবং আমি কোন প্রকার আপত্তি করব না। আর সে হেরে গেলে সেক্ষেত্রে আপনি অভিভাবক হয়ে রত্না ও আমার মাঝে বিয়ে পড়িয়ে দেবেন। ওর আগমন পর্যন্ত রত্না এই হাবেলীতেই থাকবে। আমার ১০/১২ জন সেপাই রত্নার প্রতি কড়া নযর রাখবে। যাতে সে পালাতে না পারে।'

ঘৃণার বিষ নযরে অর্জুনের দিকে তাকিয়ে রত্না বললো, 'ভয় নেই আমি পালাব না অর্জুন! আমি হাম্মাদের অপেক্ষা করব যার হাতে তোমার মৃত্যু লেখা।'

অর্জুন কোন জবাব দিতে যাচ্ছিল এ সময় বিদ্যানাথ জ্ঞানকে ডেকে বললেন, 'জ্ঞান! এদিকে এসো তো।'

হন্তদন্ত হয়ে জ্ঞান দৌড়ে এল। তিনি বললেন, 'তুমি এখনি রওয়ানা হয়ে যাও। হাম্মাদকে তালাশ করে নিয়ে এসো। খুব সম্ভব সে দিল্লী বা আজমীরেই আছে এ সময়। এ দু'জায়গার কোথাও তাকে না পেলে কাউকে জিজ্ঞাসা করবে, কুতুবুদ্দীন আইবেক তার সৈন্য নিয়ে কোথায় অবস্থান করেছেন। আইবেক যেখানে হাম্মাদকে সেখানে পাবে অতি অবশ্যই। জলদি তৈরি হও। আমি তোমার পথ খর্চা ও যাবতীয় ব্যবস্থাদি করছি।

জ্ঞান কামরার দিকে আর বিদ্যানাথ তার পরিবারসহ অন্দরে যাবার উদ্যোগ নিতেই থমকে দাঁড়ালেন। তারা দেখলেন তিন ঘোড় সওয়ার ফটক পেরিয়ে প্রবেশ করছে। ওরা ছিল খালদূন, হারেস ও হাসান। বিদ্যানাথ এদের দিকে তীর্যক দৃষ্টি ফেলে বললেন, 'রত্না! রত্না! হারেস ও হাসানের সাথে বুড়ো এ লোকটি কে?আর তাঁর কাপড় রক্তাক্তই বা কেন?'

রত্না আনন্দ আতিশয্যে বললো, 'দুভাইয়ের সাথে ওই বুড়োই আমার বাবা খালদূন। বিদ্যানাথ দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, 'আহ হাম্মাদ! তোমার বুড়ো বাপের কী করুন অবস্থা। কি তার চেহারা। উস্ক খুস্ক চুল। মনে হচ্ছে তার ওপর দিয়ে বিশাল এক তুফান বয়ে গেছে।'

ওরা তিনজন ঘোড়ার পিঠ থেকে নামলে রত্না দৌড়ে এগিয়ে গেল এবং সর্বাগ্রে খালদূনের বুকে মিশে গেল। বললো, 'বাবা! বলুন মায়ের অবস্থা কী! তিনি এখন কোথায়?'

খালদূনের গরদান নীচু হয়ে গেল! দুঃখ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, 'বেটি আমার! তোমার মা এজগতের সফর শেষ করেছেন। মৃত্যুর আগে তিনি তোমাকে বেশ স্মরণ করেছেন। ক্ষেতের থেকে আপেল এনে দেখি তিনি রক্ত পাথারে সাঁতরে চলেছেন। আমি তোমাকে ডেকে ডেকে হয়রান। কিন্তু তোমার কোন সন্ধ্যান পাইনি বেটি। বাধ্য হই তোমার মাকে হুঁশে আনা যায় কি-না এ কাজে। তিনি অবচেতনে

বলেছিলেন, মেহমান রত্নাকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে। কথা বলতে বলতে তিনি আমার কোলেই মৃত্যু মুখে পতিত হন। বাড়ীর আঙিনায়ই তাকে দাফন করে দেই এবং হিন্দুস্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। হাম্মাদকে সাথে নিয়েই এখানে আসতে চেয়েছিলাম কিন্তু পথিমধ্যে তোমার দুভাইকে পেয়ে ওদেরই নিয়ে এসেছি।'

মায়ের মৃত্যু খবর শুনে রত্না হাউ মাউ করে কেঁদে ওঠে। খালদূন রত্নাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেন, কেদো না মা! তোমার দুভাই মায়ের প্রতিশোধ নেবেই নেবে।

এদিকে অর্জুন এদের তিনজনকে প্রবেশ করতে দেখে আস্তাবলের সামনে দন্ডায়মান সাথীদেরকে ইশারায় কাছে ডেকে নিল। আচমকা অর্জুনের প্রতি নযর পড়ায় খালদূন বললেন, 'রত্না রত্না! এ না সেই হায়েনা, যে তোমার মাকে হত্যা করেছে? এবং তোমাকে তুলে এনেছে? বলো! এই-ই কী সেই কাপুরুষ অর্জুন!

রত্না খালদূন থেকে আলাদা হয়ে চোখের পানি মুছে বলল, 'হ্যাঁ বাবা! এ সেই বদমাশ।'

হারেস হাসানের দিকে তাকিয়ে খালদূন বললেন, আমার পুত্রগণ! যে জোয়ান তোমাদের সামনে দন্ডায়মান, নাম তার অর্জুন। এই পাষন্ডই তোমাদের মাকে হত্যা করেছে এবং তোমাদের বোনকে তুলে এনেছে।'

প্রতিশোধ স্পৃহায় দুভাই এক সাথে তলোয়ার বের করল। বলল, মাতৃহন্তা এ হায়েনাকে ধুঁকে ধুঁকে মারব।

হারেস ও হাসান তলোয়ার বের করলে অর্জুনও তলোয়ার কোষমুক্ত করে বলল, তোমরা অগ্রসর না হয়ে স্বস্থানে থেমে যাও। প্রথমে আমার কথা মনে প্রাণে শোন। আমার কথা না শুনে হামলা করলে জেনে নাও, ওই যে আমার সাথীদের দেখছ না ওরা এক যোগে হামলা করে তোমাদের দফারফা করে দেবে। তখন কিন্তু কিছু বলার থাকবে না হ্যাঁ।

হারেস ও হাসান থেমে গেল। অর্জুন বললো, 'তোমাদের আসার খানিক আগে রত্না ও আমার মাঝে চুক্তি হয়েছে। সর্বাগ্রে তোমার ভাই হাম্মাদকে ডাকার কথা। আমার সাথে হবে তার মোকাবেলা। সে জিতে গেলে রত্না তার আর আমি জিতে গেলে রত্নার সাথেই আমার বিয়ে হবে। হাম্মাদ আসার পূর্বেই যদি তোমরা আমার সাথে পালাক্রমে মল্লযুদ্ধ করতে চাও তো তারও অনুমতি আছে। তোমরা যদি আমার মোকাবেলায় জিততে পার তাহলেও আমি রত্নার দাবী থেকে নিজকে গুটিয়ে নেব। এক্ষণে তোমরা দু'ভাই মিলে পরামর্শ কর আমার মোকাবেলায় কে নামছ।'

হারেস অগ্রসর হয়ে বলল, 'আমার মোকাবেলায় এসো! আমি তোমাকে মল্লযুদ্ধের জন্য আহবান করছি। হারেসএকথা বললে হাসান বলল, 'ভাইয়া! তুমি না নেমে ওর মোকাবেলায় আমাকেই নামার অনুমতি দাও। আমি বেটার গর্দানটা কেটে ফেলি। হারেস বলল, 'তুমি বাবাজান ও রত্নার পাশে দাঁড়াও। হাম্মাদের পরে এই

হায়েনার বিরুদ্ধে নামার অধিকার যে একমাত্র আমারই। আমার আশা তোমাদের নিরাশ করব না আমি।

হারেস অগ্রসর হলে অর্জুন বললো, 'হে জোয়ান! তলোয়ারের স্থলে প্রথমে তোমার লৌহগদা নাও। দেখি তোমার গদার জোর কত। হারেস তলোয়ার বন্ধ করে ঘোড়ায় বাঁধা লৌহগদা ধারণ করল। ওর এক স্থানে গদা আরেক হাতে ঢাল। অর্জুনও গদা নিল। সকলের মাঝে নিরবতা।

হারেসকে আঘাত করার জন্য ক্ষুধার্ত শার্দুলের মত চক্কর দিতে লাগল অর্জুন। প্রচন্ড শক্তিতে সে হারেসের ওপর হামলা করল। ঢাল দ্বারা ওই আঘাত প্রতিহত করল হারেস। এতদসত্ত্বেও অর্জুনের হামলা এতই মারাত্মক ছিল যে, তাতে হারেসের আপদমস্তক কেঁপে ওঠল। ওই কম্পনে ও অনুভব করল যে, দুশমন এমন দু'চারটা আঘাত করলে তার পক্ষে লড়াই এর ময়দানে টিকে থাকা সম্ভব নাও হতে পারে। দুঃসাহসিক হারেস আত্মনির্ভরশীল ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে পাল্টা আঘাত হানল। গদা ঘুড়িয়ে সে অর্জুনের মাথায় আঘাত করতে চাইল। অর্জুন নিজকে ঢালের মাধ্যমে বাঁচাল। এবার তারা সমানে এক অপরের ওপর হামলা করে যেতে লাগল।

অর্জুন মাতানো ষাঁড়ের মত গোঁ গোঁ করতে করতে এক সময় হারেসের দিকে তেড়ে গেল। ভারী গদা দ্বারা ওর ওপর হামলা শানাল। বুড়ো খালদূন হারেসের প্রতিহত কৌশলে খুব একটা আস্থাশীল হতে পারছিলেন না। তাই তিনি চিৎকার দিয়ে বললেন, হারেস! হারেস! কি করছ বেটা আমার! ঢাল ডান কাধ বরাবর রাখো আর গদা বা'কাধ থেকে ঘুরিয়ে শত্রুর ওপর হামলা করো। এতে তোমার আক্রমণ যুৎসই হবে।' লড়াই করতে করতে হারেসের মনে উদাসীনতা ছেয়ে গেল। তার সব কৌশল মাঠে মারা গেল, সব প্রতিরক্ষা ভেস্তে গেল।

খালদূন ফের চিৎকার দিয়ে বললেন, 'ঢাল ডান কাধে রাখ। বা'কাধের দিক দিয়ে গদা ঘোরাও।' কিন্তু হারেসের আত্মশক্তি শত্রুর প্রথম আঘাতেই লোপ পেয়েছে যে। অর্জুন ক্রমশঃই ওর ওপর প্রাধান্য বিস্তার করছে।

খালদূন বলেন, 'হারেস গদা নীচের দিকে ঘোরাচ্ছ কেন বাপ আমার! গদা ডান কাধ দিয়েই ঘুরাও। দুশমনের মনে ভীতি সঞ্চার কর।' হারেস বাবার কথামত গদা ঘুরাতে ব্যাপৃত হতে চেষ্টা করল। কিন্তু অর্জুনের সামনে ওর প্রতিরোধশক্তি ক্রমশই নেতিয়ে পড়ছিল। হারেস যত দুর্বল হয়ে আসছিল অর্জুন তত শক্তিশালি মুডে ওর ওপর চড়াও হচ্ছিল।

হারেসের দুর্বলতা আঁচ করতে পারলেন খালদূন। মনে হচ্ছিল জগতটা তার সামনে অন্ধকার হয়ে আসছে। রত্নার চেহারায় ফুটে ওঠছে হতাশা। হাসান আক্ষেপে ঠোঁটে ঠোঁট কাটে। কেউ যেন ওকে পান করিয়ে দিচ্ছে তিক্ত শরবত। বিদ্যানাথ যেন পথহারা উদাসীন মুসাফির।

অর্জুন চূড়ান্ত আঘাত হানার মানসে গদা ঘোরায় সে আঘাত হারেসের ঢাল পিছলে ওর কাধে হানে আঘাত। ব্যাথায় কুকড়ে ওঠে হারেস। পড়ে যায় নিজের গদা হাত থেকে। আহত হারেস নেতিয়ে পড়ে সিড়ি ঘরে। অর্জুন ওর পিঠে পাড়া দিয়ে বলে, 'উঠে দাঁড়াও। আমার মোকাবেলা কর। হারেস কোনক্রমে দাঁড়িয়ে গদা ঘুড়াতে গেলে চোখের পলকে অর্জুন নিজের গদা দ্বারা ওর পেটে প্রচন্ড এক আঘাত হানে।

হারেস গগনবিদারী আর্তনাদ করে ওঠে। মুখ থুবড়ে পড়ে সিড়ির গোড়ায়। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে মুখ থেকে। ভায়ের এ পরিণতি দেখে নিজকে ধরে রাখতে পারে না হাসান। তলোয়ার বের করে অর্জুনের দিকে এগোয়, কিন্তু অর্জুনের সাথীরা ওকে আগলে ধরে। হারেসকে ধরে ওর পিঠে প্রচণ্ড এক আঘাত করে পুনরায় খালদুনের পায়ে আছড়ে ফেলে। তিরস্কার করে বলে,

'তোমার এই গুনধর পুত্রদের নিয়ে বুঝি আমার মোকাবেলায় এসেছিলে। আমৃত্যু লড়াই করেও এ ধরনের জোয়ান আমার হাত থেকে রত্নাকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। ওকে ওঠাও। নিয়ে যাও এখান থেকে। তোমার দুপুত্র আমার সাথে মোকাবেলায় নামলেও একই পরিণতি হত। এবার তোমার তৃতীয় পুত্রের অপেক্ষায় রইলাম। আর হ্যাঁ একথাও মনে রেখ! যে পরিণতি হয়েছে হারেসের তার চেয়ে কোন অংশে কম হবে না তার বেলায়ও। যতক্ষণ পর্যন্ত সে না আসছে ততক্ষণ রত্নার পাশাপাশি তুমিও এ বাড়ীতে নযরবন্দী থাকবে।'

অর্জুন এবার বিদ্যানাথকে লক্ষ্য করে বলল, 'জ্যাঠামশাই! তোমার হাবেলীর একটা কামরা আমার জন্য খালি করে দাও। আমি থাকব। আর আমার সাথীরা তোমার কর্মচারীদের কামরায় থাকবে এবং পাহারা দেবে। প্রয়োজনে ভেতরেও থাকবে এই প্রহরা। তোমরা কেউই এ বাড়ী থেকে পালানোর কোশেশ করেছ কি মরেছ। আর হারেসের ভাই হাসানকে দ্রুত প্রেরণ করো ওর বড় ভাইয়ের খোঁজে। আমি ওর রওয়ানা দেবার কথা আমার সঙ্গীদের জানিয়ে দিচ্ছি।' বলে অর্জুন সঙ্গীসাথীসহ কর্মচারীদের কামরায় চলে গেল।

হারেসের মাথা কোলেচেপে ধরে খালদুন বললেন, 'বাবা তোমার একি হোল। তুমি কথা বলছ না কেন?' হারেসের মুখ থেকে তখন রক্ত বেয়ে পড়ছিল অঝোর ধারায়। আস্তে আস্তে হারেস চোখ খুলল। বিড় বিড় করে রক্তমুখে বলল, 'বাবা! আমি এই যুদ্ধে তোমার মুখে হাসি ফোটাতে পারলাম না। এই জোয়ান আমাদের দুভাই অপেক্ষাও শক্তিতে ঢের বেশী। তার জংগী কৌশল খুবই মজবুত। হায়! আমি যদি তাকে তোমার পায়ে আছড়ে ফেলতে পারতাম। কিন্তু আমার সে আশা দুরাশা হয়ে থেকে গেল।

বাবা! দ্রুত হাসানকে প্রেরণ করে হাম্মাদকে আনার ব্যবস্থা কর। এই যুবকের প্রতিটা আঘাত পাল্টা আঘাত করার শক্তি রাখেন কেবল ভাইজান। তিনি এসে এই ধোঁকাবাজের ধোঁকা খতম করবেন। আমার প্রতি যে অনাচার করেছে সে, তার জবাব দিতে ভাইয়ার জুড়ি নেই।

খালদূন তপ্তাশ্রু ফেলে বললেন,'হায়! তোমরা দু'জন যদি আমাকে এখানে আসতে বাধ্য না করতে। আহা! তোমাদের বড় ভাইকে নিয়েই যদি আসতে পারতাম, তাহলে এ দৃশ্য আজ আমাকে দেখতে হত না। আজ আমি কি দেখছি! দেখছি তোমার মায়ের মত রক্তাক্ত হয়ে আমার কোলে তড়পাচ্ছ। হায়! আজ আমি কত অসহায়! এখন আমি কি করব।'

হারেস তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'বাবা! আমার আহত অবস্থার ওপর আপনি বারিপাত করবেন না। ভাইজান আসবেন। আমার প্রতিটা আঘাতের জবাব তিনিই দিবেন। বাবা! আমার কষ্টবহুল শ্বাসের প্রতিটি ক্ষণ আপনার কাছে মিনতি করবে, আপনি কষ্ট নেবেন না। ভাইজান আপনার যাবতীয় মনবেদনা দূর করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। তাকে ডেকে আনুন। খুব শীঘ্র। আমার রক্তের প্রতিটি ফোটা অর্জুনকে পরাজয়ের সুসংবাদ দিচ্ছে।

হারেস খামোশ হয়ে গেল। নিকটে দাঁড়ান রত্না কেঁদে কেঁদে হাসানকে বলল, 'হাসান! হাসান! ভাইয়াকে উঠিয়ে ভেতরে নিয়ে চল। নিশ্চুপ হাসান এগিয়ে গেল। হারেসকে পাজাকোলে করে ওঠাল এবং হাবেলীর ভেতরে নিয়ে গেল। খালদূন হাসানকে লক্ষ্য করে বললেন, 'বেটা হাসান! তুমি এখনি বেরিয়ে পড় এবং হাম্মাদকে নিয়ে এসো। দেরী করো না বেটা। ওকে কিছু বলবে না। স্রেফ এটুকু বলো, আব্বাজান হিন্দুস্থানে এসেছেন। কিন্তু মারাত্মক মুসিবতে আছেন। তাঁকে সাহায্য করা দরকার। দেখবে এতেই ওর রক্তে আগুন ধরে যাবে। বিদ্যুৎ গতিতে ও চলে আসবে।

হাসান বেরোলে রত্না ওকে বলল, 'হাসান! হাসান!! আমার কথা শোন।' হাসান থেমে গেল। রত্না বলল, 'শোন! তোমার ভাইজানকে বলবে তিনি যেন এক হাজার সেপাই নিয়ে আসেন। অর্জুনের সাথে সশস্ত্র সেপাই আছে। তারা গোটা বসতি ঘেরাও করে আছে। এমন যেন না হয় যে, মল্লযুদ্ধে হাম্মাদ জিতে গেলে ওরা বসতিতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

হাসান যখন দৈউড়ির দিকে এগিয়ে গেল তখন হাবেলীর ভেতর থেকে বাবার করুণ কণ্ঠ শোনা গেল। 'হাসান! দাঁড়াও! তোমার ভায়ের দমরুদ্ধ হয়ে গেছে।'

হাসান দ্রুত ফিরে এল এবং হারেসের নাড়ীতে হাত রাখল। হারেস আর নেই। মাথা নীচু করে চোখের পানি ফেলল হাসান। বিদ্যানাথসহ সকলের চোখে তপ্তাশ্রু। ওই দিনই হারেসের কাফন দাফনের ব্যবস্থা করা হোল।

দিল্লীর জামে মসজিদে তুর্কী জেনারেল ইযদুদ্দীন মুয়াইয়েদের সাথে মাগরিবের নামায পড়ে বেরোল হাম্মাদ। উভয়েই যাচ্ছিল তাবুর দিকে। ছাউনীর নিকটে এসে হাম্মাদ বলল, 'ইযদুদ্দীন! আসুন আমার তাবুতে, এখানেই খানা খাবেন।

ইযদুদ্দীন মুচকি হেসে বললো, 'আপনার সাথে খানা খাওয়া সেতো এক সৌভাগ্য। এ সুযোগ হাতছাড়া করা যায় কি।

হাম্মাদ সেপাইকে ইশারায় খানা আনতে বলল। উভয়ে চাটাইতে বসে খানা খেতে লাগল। সেপাই খালি পাত্র নিয়ে গেলে ইযদুদ্দীনকে লক্ষ্য করে বলল, 'ইযদুদ্দীন! কিছুদিনের জন্য আমাকে এখান থেকে অন্যত্র যেতে হবে।'

'কেন আপনার কাছে নতুন কোন খবর এসেছে? চকিতে প্রশ্ন করে ইযদুদ্দীন।

হাম্মাদ মুচকি হেসে বলল, 'না তেমন কোন খবর আসেনি। আমাদের বিরুদ্ধে হিন্দুস্থানের এখানে ওখানে যে ষড়যন্ত্র মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল তা আমরা অংকুরেই বিনাশ করেছি। এখন চারদিকেই শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করছে। বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আমাদের বাহিনী এখন বেকার হয়ে পড়েছে। কুতুবুদ্দীন আইবেককে আমি চিনি। তিনি বেকার বসে থাকার মত ব্যক্তি নন। আমার যদ্দুর বিশ্বাস, এবাহিনীকে তিনি অন্য কোন কাজে খাটাবেন। নতুন কোন অভিযানে প্রেরণ করবেন। যুদ্ধংদেহী মনোভাব তাকে বসে থাকতে দেবে না। তিনি কসম করে বলেছেন, 'আল্লাহ চাহেত তিনি গোটা হিন্দুস্থানে ইসলামের পতাকা ওড়াবেন।

ইযদুদ্দীন বললো, 'নতুন কোন অভিযানে গেলে আমাকে সাথে নেবেন। আপনার নেতৃত্বে যুদ্ধ করতে পারলে নিজকে সৌভাগ্যবান মনে করব। আপনি ওয়াদা করুন' বলে তিনি থামলেন।

কেননা প্রহরী খীমায় প্রবেশ করলো। এবং হাম্মাদেক লক্ষ্য করে বললো, 'আমীর সাহেব! আপনার ভাই এসেছেন।'

'তাকে ভেতরে নিয়ে এসো।'

'সে ভেতরে আসতে চাইছে না। খুব সম্ভব আপনার সাথে নিরিবিলিতে কথা বলতে চায়।'

হাম্মাদ বাইরে এল।

তাবুর গায়ে উঁচানো মশালের আলোতে দেখল হাসান ঘোড়া বেধে দাঁড়িয়ে। ও ঘোড়ার গায়ে স্নেহ পরশ বুলিয়ে দিচ্ছিল। হাম্মাদ ওর কাছটিতে এসে বলল, হাসান!

অপরিচিত মানুষের মত তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছ কেন? হারেসের মত আমার সাথে দুষ্টুমি করতে চাও বুঝি।' হারেসের নাম শুনে হাসানের মুখ পাংশু বর্ণ হয়ে গেল এবং দু'চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল অঝোর ধারার অশ্রু।

হাম্মাদ চমকে ওঠল। বলল, 'হাসান! হাসান!! তোমার চোখে পানি কেন?'

ফোঁপানো কাঁদা বন্ধ করে হাসান বলল, 'আব্বাজান হিন্দুস্থানে এসে এক মসিবতে জড়িয়ে গেছেন। জনৈক হিন্দু জোয়ান তাকে নযরবন্দী করে রেখেছেন। তিনি আপনাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যেতে বলেছেন।'

হাম্মাদ বললো, 'আব্বাজান নিশাপুর থেকে ভারতবর্ষে এসেছেন? কবে, কখন, কিভাবে তিনি এলেন? কেন এলেন? মা ও রত্না কোথায়? তাঁর সাথে তোমার সাক্ষাৎ হয়েছে কবে? কিভাবে? হারেস কোথায়? হাসানের কাঁধে ঝাকুনি দিয়ে হাম্মাদ জিজ্ঞাসা করল। 'আমার প্রশ্নের উত্তর দাও হাসান! তুমি চুপ কেন? কেন তোমার যবান রুদ্ধ?'

হাসান সংযত যবানে বলল, 'বাবা বলেছেন এর চেয়ে বেশী কিছু আপনাকে না বলতে। রত্না বোনও আব্বাজানের সাথে বন্দী। আপনার নামে একটি পরগাম আছে। তিনি বলেছেন, অন্ততঃ এক হাজার ফৌজ নিয়ে আপনাকে যেতে হবে। কেন না ওই হিন্দু জোয়ানের সাথে অসংখ্য ফৌজ রয়েছে।'

হাম্মাদ পাগলের মত চিৎকার দিয়ে বলল, 'ইযদুদ্দীন! ইযদুদ্দীন!!'

ইযদুদ্দীন খিমায় বসা ছিলো। ডাক শুনে সে বেরোল। বলল, 'আমীর সাহেব! আমায় ডেকেছেন কী!

হাম্মাদ কড়াকণ্ঠে বললো, 'তাড়াতাড়ি আমার সাথে যাবার জন্য এক হাজার ফৌজ তৈরি করো। কিছুদিন আমি ছাউনীর বাইরে থাকব। আমার অবর্তমানে সেনা ছাউনীর দিকে খেয়াল রেখো। কুতুবুদ্দীনের থেকে কোন পয়গাম এলে ওযর পেশ করো। তাকে বলো, বিশেষ কাজে আমাকে বাইরে যেতে হয়েছে।

ইযদুদ্দীন চলে গেল। হাম্মাদ হাসানের হাত ধরল এবং খিমায় নিয়ে সামনে বসিয়ে বললো, 'আমি তোমার খানার এন্তেযাম করছি। ততক্ষণে তুমি আমাকে পুরো ঘটনা সবিস্তারে শোনাও।

হাম্মাদের হাত ধরে হাসান বললো, 'ভাইজান! আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমার খিদে নেই।'

'তাহলে আমাকে পুরো কাহিনী শোনাও। আব্বাজান হিন্দুস্থানে এসেছেন কেন? আম্মা ও রত্না কোথায়? হারেসের হয়েছে কী? আর আমাদের বাবাকে কে আটকে রেখেছে?

হাসান মিনতি করে বললো, 'ও প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অপারগ ভাইজান। বাবা নিষেধ করেছেন।'

হাম্মাদ ধমক দিয়ে বলল, তুমি বলতো দেখি। আমি তোমাকে একীন দিচ্ছি– আব্বাজান তোমাকে কিছুই বলবেন না।

'ভাইজান! আপনি বাধ্য করলে শুনুন! বিদ্যানাথের ভাগ্নে অর্জুন যার সাথে রত্নার সাথে শৈশবে নাকি বাগদান হয়েছিল ১০/১২ জন সাথীসহ নিশাপুর গিয়েছিল। সে জবরদস্তিমূলক রত্নাকে তুলে এনেছে। আম্মাজান বাঁধা দিলে পাষন্ডরা তাকে হত্যা করে ফেলে এবং রত্নাকে জোরপূর্বক তুলে আনে।

হাম্মাদ আর্তনাদ করে বলে ওঠল, কী! আমাদের মা আর নেই। অর্জুন তাকে হত্যা করে তুলে এনেছে। হাসান! তুমি একি ভয়ানক খবর নিয়ে এসেছো। এ খবর শোনার আগে আমার মরণ ভাল ছিল। আব্বাজান বোধহয় মানসিক ভাবে অপনি ভেঙ্গে না পড়েন এজন্য বলতে নিষেধ করেছিলেন। অর্জুন রত্নাকে বিদ্যানাথের হাবেলীতে ওঠায় পরে হারেসের সাথে লড়াইয়ের খবরসহ অন্যান্য কাহিনী সংক্ষেপে বলে যায় হাসান।

হাম্মাদ বলে, 'হাসান! মা গেল, হারেস গেল। তাহলে আমাদের আর রইল কে! কসম খোদার! আমি অর্জুনের হাড্ডির জোড়া খুলে নেব।'

'ভাইজান! বিদ্যানাথসহ হাবেলীর সকলকে সে গৃহবন্দী করে রেখেছে। আপনি না যাওয়া পর্যন্ত তাদের কারো রেহাই নেই।'

'আমার মাকে হত্যা করা হয়েছে। ভাই গেছে মারা। আব্বা ও রত্না গৃহবন্দী–কী সব অশনি সংকেত খোদা! নিশ্চিত থেকো হাসান! অর্জুনের আর রক্ষা নেই। যমীন চিরে গেলেও ওর রেহাই নেই। ওর জন্য আমি মৃত্যু বিভীষিকা নিয়ে যাব। কেটে কেটে ওর দেহ শত খন্ড করব। তোমার ঘোড়া তৈরি করো।'

খানিক বাদে ইযদুদ্দীন হাজার খানেক সৈন্য নিয়ে এলেন। হাম্মাদ ও হাসানের সাথে তারা ভীমসেনের উদ্দেশ্যে ছুটলেন।

দুই.

বিদ্যানাথের হাবেলীতে একদিন রত্না, খালদূন, বিদ্যানাথ, সাবিত্রী ও বিমলা কামরায় বসে আলাপ করছিল। প্রসঙ্গ হাম্মাদের আগমন। রত্না উদাসীন উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করছিল এমন সময় অর্জুন ওখানে প্রবেশ করল।

খানিকবাদে রত্নার দিকে তীর্যক দৃষ্টি ফেলে বলল, 'কোন বিচারের মজলিস বসিয়েছ কি প্রেয়সী! যার আগমনের অপেক্ষায় তুমি ব্যাকুল সে আসবে না। হাসান গিয়ে তাকে সবকিছু বলেছে অতি অবশ্যই। সেই সাথে সে একথাও জেনেছে যে, হারেস ও তার মা মারা গেছে। সুতরাং ভয়কাতুরে ওই লোকটার পক্ষে এখানে আসা সম্ভবপর হবে না।

বিদ্যানাথ ওর কথা শুনে বললেন, 'অর্জুন! মুর্খের মত কথা বলো না। সে আসবে। অবশ্যই আসবে। আসবে তুফান গতিতে ঝড়ো হওয়ার আকৃতিতে। তার

ইস্পাত কঠিন মনোবলের সামনে তুমি তৃণলতার মত উড়ে যাবে। অচিরেই এ হাবেলীর লোকজন দেখবে তুমি তার সম্মুখে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য করজোড়ে প্রার্থনা করছ। তুমি বলবে, মহারাজ! আমাকে ক্ষমা করুন মহারাজ। আমার প্রাণভিক্ষা দিন। গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিও না যে, সে ভয় পেয়েছে। ও এসে যখন মল্লযুদ্ধ করবে তখন টের পাবে কত ধানে কত চাল।

'সে আসলে দেখা যাবে আপনার কথা কতটা ঠিক। তবে জ্যাঠামশাই আমি কাপুরুষ নই। আমি ওকে এমন শিক্ষা দেব যাতে রত্নার নাম ভুলে যাবে।'

রত্না বললো, 'তুমি তাকে কি শিক্ষা দেবে? ও এলে দেখবে তুমি তোমার অস্তিত্ব নিয়েই হুমকির মুখে পড়েছ। তোমার সকল অভিলাষ তখন মাথাকুটে মরবে।'

রাগে ক্ষোভে অগ্রসর হয়ে অর্জুন রত্নার গালে প্রচণ্ড এক চড় বসিয়ে দিল। বলল, 'চুপ কর মুখরা মেয়ে। তুমি কেন তার পক্ষে কথা বলছ। আমাদের মাঝে এই কথা হয়েছে যে, মল্লযুদ্ধে যে জিতবে তুমি তাকে পতিত্বে বরণ করবে। সুতরাং এক্ষণে তুমি পক্ষপাতিত্ব অবলম্বন করছ। এরপর থেকে হাম্মাদের পক্ষ হয়ে একটি কথা মুখ থেকে বের করেছ কি কালবিলম্ব না করে পণ্ডিত ডেকে তোমাকে বিয়ে করে ফেলব। দেখব কি করে আমার অবাধ্য হও এরপর।

এবার খালদূন কড়াকণ্ঠে বললেন, 'আমার বেটির ওপর হাত ওঠানোর মজা তুমি অচিরেই পাবে। আমার বড় পুত্র এলে তুমি মাতৃভূমির নামটি পর্যন্ত ভুলে যাবে। তোমার জীবন প্রদীপ তার হাতেই নিভবে মনে রেখ। অপেক্ষা করো। আর কটা দিন। দুনিয়ার আলো বাতাস ভোগ করে নাও। যদি তোমার অস্তিত্ব হুমকীর মুখে না পড়ে, যদি এ যমীনে তোমার সমাধী না হয়, যদি তোমার দাম্ভিকতা চূর্ণ-বিচুর্ন না হয়, তাহলে আমাকে আর খালদূন বলবে না।'

অর্জুন অট্টহাসি দিয়ে বলল, 'তোমার এক পুত্রের যে পরিণতি হয়েছে তার চেয়ে কোন অংশে কম হবে না অন্যটার বেলায়।

খালদূন দাঁতে দাঁত পিষে বললেন, হারেস আর হাম্মাদকে একই পাল্লায় মেপো না। হাম্মাদ আমার প্রভাবের লাঠি ও আশার মীনার। শোন অর্জুন শোন! ১০ হারেস একস্থানে করলেও একজন হাম্মাদের সমান হবে না। ওর সাথে মল্লযুদ্ধে নামলেই কেবল একথার সত্যাসত্য প্রমাণ হবে।

বলতে বলতে খালদূন থেমে গেলেন। কি একটা আওয়াজ শোনার কোশেশ করলেন। পরে চিৎকার দিয়ে বললেন, 'বিদ্যানাথ! আমার বাবা এসে গেছে। এসে গেছে আমার হাম্মাদ। শোন! ওর প্রাক আগমনি শোন। কেন তোমার কানে শিংগাধ্বনি যাচ্ছে না? সকলেই ইথারে শিংগাধ্বনি শুনতে পেল। খালদূন রত্নাকে ডেকে বললেন, 'রত্না! বেটি তুমি আমার শিংগাটা নাও। আমার বেটা আমাকে ডাকছে। আমি ওর ডাকে সাড়া দেব। সে জিজ্ঞাসা করছে, এ হাবেলীতে কোন ধোঁকা কিংবা প্রতারণা চলছে না তো এই মুহূর্তে! জলদি ওঠো বেটি! শিংগা আন। আমি জানিয়ে দেই, তুমি এখানে নির্দ্বিধায় প্রবেশ করতে পার।

রত্না যখন খালদূনের শিংগা আনতে গেল তখন তিনি অর্জুনকে লক্ষ্য করে বললেন, নাও অর্জুন! প্রস্তুত হও। অস্ত্র ধারণ করো আমার পুত্র এসে গেছে। আমি ওর ক্ষিপ্রতা ও চরিত্র সম্পর্কে আগেভাগে জানিয়ে দিচ্ছি যে, ও এলেই তোমার সাথে লড়াই শুরু করে দেবে। বিশ্রাম ও কালক্ষেপণ ওর প্রকৃতিবিরোধী। দ্রুত গিয়ে তুমি অস্ত্র ধারণ করো। কেননা মা-ভায়ের হত্যার প্রতিশোধে হাবেলীতে ঢুকে ও তোমাকে অস্ত্রধারণ করতে নাও দিতে পারে।

অর্জুন দ্রুত বাইরে বেরোল এবং অস্ত্রসাজে সজ্জিত হল। ঘোড়ায় লাগাল জিন। সঙ্গীদের নিয়ে খোলা উঠানে দাঁড়াল। রত্না দ্রুতই কামরায় প্রবেশ করল। হাতে ওর খালদূনের শিংগা। খালদূন অগ্রসর হয়ে শিংগা হাতে নিলেন এবং কামরা থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। রত্না, বিমলা, সাবিত্রী ও বিদ্যানাথ তাকে করে অনুসরণ। খালদূন দ্বিতলের একেবারে উপরের সিড়িতে হাটুগেড়ে বসে মুখে শিংগা লাগান এবং পূর্ণশক্তিতে শিংগায় ফুঁক দেন। তিনি কয়েকবার এভাবে শিংগা বাজিয়ে যান। মনে হচ্ছে তিনি হাম্মাদকে কোন পয়গাম দিয়ে চলেছেন। তাঁর শিংগাধ্বনি থেমে গেলে ওপাশ থেকেও অনুরূপ ধ্বনি ভেসে এল। পরক্ষণে গেল থেমে। খালদূন দাঁড়িয়ে গেলেন। উদ্বিগ্নতার সহিত তাকাতে লাগলেন দেউরীর ফটকের দিকে।

এ সময় সশস্ত্র অর্জুন তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে আছে তার বারজন সেপাই। ঠিক এই মুহূর্তে জনৈক হিন্দুজোয়ান হন্তদন্ত হয়ে হাবেলীতে প্রবেশ করল। বলল, 'এই কিছুক্ষণ হোল কিছু মুসলিম সেপাই বসতিতে প্রবেশ করে আমাদের সঙ্গীদের সকলকে মেরে ফেলেছে। আমরা ওদের রুখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি। আমার সঙ্গীদের সকলেই মারা গেছে। কোন মতে প্রাণে বেঁচে আপনাকে সংবাদটা দিতে এসেছি।

ওই সময় জ্ঞান তার কিছু সঙ্গীসহ আস্তাবল থেকে খালদূনের কাছে এসে দাঁড়াল। অর্জুন রাগে ক্ষোভে অগ্নিশর্মা হয়ে রত্নাকে লক্ষ্য করে বলল, তুমি আমার সাথে প্রতারণা করেছ। এর প্রমাণ এই যে, হাম্মাদ একাকী আসেনি। সাথে নিয়ে এসেছে বিশাল এক বাহিনী। কিন্তু আমিও তোমাদের সহজে ছাড়ছিনা। এই প্রতারণার শাস্তি তোমাদের পেতেই হবে। হাম্মাদ আসার পূর্বেই আমি সকলকে হত্যা করে ফেলব। বলে সে ঘোড়ার পিঠ থেমে নামতে উদ্যত হয়েও থেমে গেল। কেননা ওই সময় ফটকে হাম্মাদকে দেখা গেল। ওর পেছনে হাসান ও ক'জন সেপাই।

অর্জুন ঘোড়ার পিঠে বসে গেল। এক নযরে সার্বিক পরিস্থিতি আঁচ করতে চাইল। মুহূর্তে তার হাত চলে গেল গদার ওপর। সিড়িপথের সামনে এসে হাম্মাদের ঘোড়া থামল। অর্জুনকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে হাসান অর্জুনের সাথীদের লক্ষ্য করে বলল, 'তোমরা যদি যুদ্ধে শামিল হতে চাও তো ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকো। আর যদি পক্ষপাতিত্বের চিন্তা কর তাহলে আস্তাবলের সামনে গিয়ে দাঁড়াও। মনে রেখ বসতিতে যে পাহারাদারদের তোমরা নিযুক্ত করেছিলে তারা সকলেই মৃত্যুর দুয়ারে

উপনীত। তোমাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, অর্জুনের সাথে কেবল আ
একাকীই মোকাবেলা করবে। অর্জুনের সাথীরা ঘোড়াসহ আস্তাবলের স
দাঁড়াল। আর ওদের পূর্বস্থানটায় হাম্মাদের সাথীরা দাঁড়াল।

ওদিকে রত্নার মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিল। হাম্মাদের আগমনে ওর মুষড়ে পড়া চেহারায় আনন্দের বান ডেকে গেল। কল্পনার রঙীন পাখায় ভর করে ও দেখতে পেল, হাম্মাদ কিয়ামতের বিভিষিকা নিয়ে অর্জুনকে কেটে টুকরো করছে।

ঘোড়ার পিঠে বসা অবস্থায় হাম্মাদ বাবাকে লক্ষ্য করে বলল, 'আব্বাজান! কে সেই পাষণ্ড যে আমার মাকে হত্যা করেছে? হত্যা করেছে হাসেরকে। তুলে এনেছে রত্নাকে? দেখিয়ে দিন তাকে। তার দিকে আপনি ইংগিত করুন, যে আমাকে মল্লযুদ্ধের আহবান করেছে। খালদূন তাঁর শিংগাটা অর্জুনের দিকে ঘোরালেন। বললেন, 'বেটা! এই নরপিশাচ-ই তোমার মাকে হত্যা করেছে। রত্নাকে তুলে এনেছে। তোমার ভাইকে নৃশংসভাবে খুন করেছে।

হাম্মাদ অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওই বেটা ধড়িবাজ প্রতারক। আমার মা-ভাইয়ের হন্তা তাহলে তুই-ই। তুই-ই সেই নরঘাতক অর্জুন?

আত্মম্ভরিতা প্রকাশপূর্বক অর্জুন বললো, 'হ্যাঁ আমি সেই অর্জুন। তুমি অগ্রসর হয়ে দেখো কিভাবে তোমাকে তোমার ভায়ের কাছে পাঠাই। মোকাবেলায় নেমে দেখো অর্জুন কত ভয়ঙ্কর।

মুচকি হাসির রেখা ওষ্ঠ প্রান্তে এনে হাম্মাদ বলল, 'তোকে তো বড্ড আহম্মক ও নির্বোধ মনে হচ্ছে। তোর দম্ভের সুউচ্চ চূঁড়া গুড়িয়ে দিতেই আমার আগমন। তোর চূড়ান্ত হিসাব গনার সময় আসন্ন। তৈরী হও পাপী। আমার আক্রমন তোকে পেতে যাচ্ছে।'

অর্জুন ফওরান গদা ও ঢাল তাক করল। হাম্মাদ বা'হাতে ঢাল নিল এবং ডানে হাতে গদা-ধারন করল। অর্জুন খালদূনকে লক্ষ্য করে বলল, 'হারেসের মত হাম্মাদকেও তুমি যুদ্ধ চলাকালীন পরামর্শ দিতে পার-এতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। তোমার ওই পুত্রের মত একেও খতম করে দেব।

খালদূন বললেন, 'আমার এই পুত্র যুদ্ধপটু। তাকে পরামর্শ দেওয়ার কিছু নেই। তার পয়লা আঘাতেই ধারনা করতে পারবে যে, এ প্রতিযোগী আগের জনার চেয়ে কত বেশী মারাত্মক। ওর প্রথম আক্রমনই তোমার মিথ্যা, চারিত্রিক অবক্ষয় ও তামাম অহংকারের পতন ঘটাবে।

হাম্মাদ ঘোড়ায় পদাঘাত করল। হ্রেষাধ্বনি দিয়ে ঘোড়া সামনে অগ্রসর হোল। ডান হাতে ঢাল নিয়ে বাম কাঁধের ওপর গদা রাখল। অর্জুনের কাছে গিয়ে এতজোরে তাকবীর ধ্বনি দিল যাতে পাহাড়ে পর্যন্ত প্রতিধ্বনি শোনা গেল। পূর্ণশক্তিতে অর্জুনের ওপর আঘাত হানল। সে আঘাতে অর্জুনের ঢাল বেঁকে গেল এবং এতে তার আপাদমস্তক কেঁপে ওঠল। সে বুঝতে পারল, প্রতিপক্ষের শক্তির সীমা।

বুড়া খালদূন খুশী গদগদচিত্তে বললেন, 'সাবাশ বেটা! তুমি তোমার গদার ছহীহ এস্তেমাল করেছ। মারটা আমার ইচ্ছামাফিকও দিয়েছ। এ ধরনের হামলা করার নির্দেশই আমি হারেসকে দিয়েছিলাম। চেয়ে দেখ বেটা! তোমার প্রতিপক্ষের ঢাল কিভাবে বেকে নিজের অসহায়ত্ব প্রমাণ করছে।

নিজের ঢাল ফেলে অর্জুন পাল্টা আঘাত করল। হাম্মাদ ওই আঘাত সহজে প্রতিহত করল। হাম্মাদ সজোরে ওর ঘোড়ার লাগাম কষল। ঘোড়াটি সামনের দু'পা উঁচিয়ে হ্রেষাধ্বনি দিল। অর্জুন তখন অবাক নয়নে তার ঢালের দিকে তাকাল। একি তার ঢালের অবস্থা এত করুন কেন! হাম্মাদ এ সময় ভর্ৎসনা করে বললো, তোমার ঢালের করুন হাল আমি পর্যবেক্ষণ করেছি। ভয় নেই নিরস্ত্র শত্রুর ওপর আমি হামলা করি না। নতুন ঢালের যোগান দেয়া হবে। তোমার মৃত্যু অবধারিত এবং সশস্ত্র অবস্থায়ই। আমৃত্যু তুমি ঢালের পর ঢাল বদলে যেতে থাকবে আর আমি তার এক একটাকে বেকার করে ছাড়তে থাকব।

হাম্মাদ দ্বিতীয় বারের মত ঘোড়ায় পদাঘাত করে জোরালো আক্রমন চালাল। ওর এবারের আঘাতে অর্জুনের ঢাল মাঝ বরাবর থেকে ভেঙ্গে গেল। এমনকি যে হাতে অর্জুন ঢাল ধরে রেখেছিল সে হাতও মারাত্মক যখমী হলো। এ হামলা প্রতিহত করার মত কৌশল অর্জুনের জানা নেই। কাজেই সে চোখে সর্ষে ফুল দেখতে লাগল। ভাঙ্গা ঢাল নিয়ে কোনক্রমে প্রাণরক্ষা করে যাচ্ছিল দাম্ভিক অর্জুন।

কিন্তু এভাবে আর কতক্ষণ! অর্জুন এক সময় নেতিয়ে পড়ে। আঘাতে আঘাতে তার দেহ রক্তাক্ত হয়ে যায়। তার সমস্ত কৌশল মাঠে মারা যায়। তার বলার মুখ হয় মুক। লৌহমানব হাম্মাদ এবার আসল খেল শুরু করে। ইথারে ভেসে আসে ওর চূড়ান্ত আঘাতের তাকবীর ধ্বনি। অর্জুন মনে করছে জ্বলন্ত এক আগ্নেয়গিরি তার উত্তপ্ত লাভা উৎক্ষিপ্ত করছে। সেই আভায় তাকে জ্বলে যেতে হচ্ছে। পুড়ে হতে হচ্ছে খাক। হাম্মাদ আঘাতের পর আঘাত হেনে তাকে পুতুলের মত নাচিয়ে যাচ্ছে।

হাম্মাদ পঞ্চম বারের মত গদা দ্বারা আঘাত করলে অর্জুন গদা-ঢাল ফেলে দ্রুত ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে তরবারী ধারণ করে। হাম্মাদও ফওরান ঘোড়া থেকে নেমে তলোয়ার কোষমুক্ত করে। হাম্মাদ ও অর্জুনের দেখাদেখি গদা দূরে ফেলে দেয়। অর্জুনকে ঢালমুক্ত দেখে হাম্মাদ হাসানকে লক্ষ্য করে বলে, 'হাসান! হাসান!! অর্জুনকে একটা নতুন ঢাল দাও। আমি ঢালমুক্ত শত্রুর মোকাবেলা করতে চাই না।

ঢাল ওঠাতে গিয়ে ইতস্ততবোধ করছিল অর্জুন। না জানি হাম্মাদ এই অবস্থায় হামলা করে বসে কি-না।

হাম্মাদ তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললো, নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্ত মনে ঢাল কুড়িয়ে নাও। তোমাকে প্রতারণা করার এতটুকু ইচ্ছে নেই আমার।' অর্জুন দ্রুত ঢাল উঠিয়ে নিল। হাম্মাদ বললো, 'অর্জুন! তোমাকে আমি কাবাব বানিয়ে ছাড়ব। কিছুক্ষণের মধ্যেই টের পাবে হাম্মাদ কি জিনিষ! শোন অর্জুন! বনে-জংগলে গাছ-গাছালী বেশী

জন্মালে তার কিছু কেটে ছাফ করতে হয়। তোমার মাঝের জংলী মনোভাব খুবই প্রকট বিধায় ভেতরের পশুটাকে মেরে ফেলতে হবে। তোমার সময় ঘণিয়ে এসেছে।'

ক্ষুধার্ত শার্দুলের মত হাম্মাদ অর্জুনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হাম্মাদের মাঝে বিজয়ের নেশা চেপে বসল এবং পরিস্থিতি তার আনুকুল্যেই বোঝা গেল। তলোয়ারের আক্রমনে তাকে বারবার পিছু হটতে বাধ্য করল। অর্জুন ক্রমশঃ তাই নেতিয়ে যাচ্ছিল। ওর পতিপক্ষের আক্রমনে সমুদ্রের শো শো ধ্বনি শোনা গেল।

বিদ্যানাথ বুলন্দ আওয়াজে অর্জুনকে লক্ষ্য করে বললেন, 'অর্জুন! হাম্মাদের আগমেনর পূর্বে তুমি যে হিমালয়সম মনোভাব প্রদর্শন করেছিলে— কোথায় গেল তা? তোমার অসহায়ত্বে আমি বিস্মিৎ হচ্ছি। দেখ কতক্ষণ ওর সামনে টিকতে পার।'

অর্জুন বললো, 'শুনুন জ্যাঠামশাই! যতক্ষণ এই বুদ্দুর অন্তিম পরিণাম না হচ্ছে আমি টিকে থাকব।'

'তোমার প্রতিপক্ষ আজ এমন এক যোদ্ধা পরমাত্মা যার পক্ষে। তোমার জীবন অবসান হতে চলেছে। শোন অর্জুন! আজ এক নব দিগন্তের দ্বারোন্মোচন করছি তোমার সামনে। আমি হিন্দু নই। আমি নিখাদ এক মুসলমান। বিদ্যানাথ নয় আমার নাম আবুল ফাতাহ। আমার স্ত্রী ও মেয়েও ইসলাম গ্রহণ করেছে। প্রকাশ্যে আজ আমি মুসলিম হবার ঘোষণা করছি। তোমার অন্তিম সময়ে একথা না বললে মর্মপীড়া থাকবে তাই বললাম। আমাদের বসতির অধিকাংশ মানুষই মুসলমান হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। অর্জুন! পাপে ছাড়েনা বাপকেও। তোমার পাপের প্রায়শ্চিত হচ্ছে।'

অর্জুনকে আঘাতে আঘাতে বিধ্বস্ত করে হাম্মাদ বললো, 'অর্জুন! ভালভাবে আত্মরক্ষা করো, তোমার তলোয়ার ভেঙ্গে খান খান।' অর্জুনের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। হাম্মাদ এ সময় ঢাল দ্বারা অর্জুনের মুখে প্রচণ্ড আঘাত হানল। সে আঘাতে মুখ থুবড়ে সিড়ি বরে পড়ল অর্জুন।

হাম্মাদের বিজয় প্রকাশ হতে থাকায় রত্নার খুশীর অন্ত নেই। ওর মন সেই শুরু থেকেই খুশীতে আটখামা। প্রীতি ভরা মন নিয়ে ও হাম্মাদকে দেখে যাচ্ছিল। ওর প্রতিটা আঘাতকে হৃদয় নিংড়ানো উচ্ছ্বাস নিয়ে সমর্থন করে যাচ্ছিল। মুষড়ে পড়া ওর মন-মীনারে জ্বলছিল সুরাইয়া সেতারা। কি মনে করে এক সময় রত্না হাম্মাদের কাছে এগিয়ে গেল। কানে কানে কি যেন বলল। সে কান কথায় হাম্মাদের চোখ মুখ লাল হয়ে গেল। রত্না দাঁড়িয়ে রইল ওর কাছটিতে।

হাম্মাদ মুখ থুবড়ে পড়া অর্জুনের কাছে এগিয়ে গেল। প্রচণ্ড এক লাথি মেরে বলল,

'ওঠো অর্জুন! তোমার গদা হাতে নাও। আমার মোকাবেলা কর।'

অর্জুন করজোড়ে নিবেদন করল, 'মহারাজ! আমি আপনার সেবক। আমাকে ক্ষমা করুন মহারাজ।' এ সময় রত্না অগ্রসর হয়ে অর্জুনের গালে প্রচণ্ড এক চড় কষে

দিল। বললো, 'আমার প্রিয়তম আসার পূর্বে কতইনা বাহাদুরী ফলিয়েছিলি কাপুরুষ। ক্ষমা চাইতে তোর লজ্জা হয় না। পরমাত্মা তোর কপালে দুঃখ রেখেছেন। তুই-ই আমাদের শান্তির নীড়ে আগুন জ্বেলেছিস। হাসি খুশী প্রাণোচ্ছল পরিবারে দাবানল সৃষ্টি করেছিস। এই আঙিনায়-ই আজ তোর জীবন প্রদীপ নিভবে আর আমি তা দেখে উল্লাস প্রকাশ করব।'

অর্জুনের এসব কথায় কোন প্রতিক্রিয়া নেই। আবারো কাতর নয়নে সে হাম্মাদের দিকে তাকাল। বললো, 'মহারাজ! মহৎ লোকেরাই তো ক্ষমা প্রদর্শন করে।'

হাম্মাদ লাথি মেরে বললো, 'ওঠ! পাপিষ্ঠ নরাধম! গদা ওঠা। আমার মোকাবেলা কর। কি নিকৃষ্ট পরিণতি তোর চিন্তা করে দেখেছিস। তোর খান্দানী বীরত্ব এত সহজে ভেস্তে গেল যে। তুই তো ক্ষত্রীয়-তা এক্ষনে অমন শুদ্রের মত কথা বলছিস কেন। হাম্মাদের চেহারায় ঐশীআভা দেখতে পান কাছটিতে দাঁড়ানো আরেকজন কল্যানকামী। তিনি খালদূন। বিদ্যানাথ এ সময় বলেন, 'উঠে দাঁড়াও অর্জুন। তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত এতটুকুতেই হবে না। অর্জুন ফের মাফ চায়। হাম্মাদ গোস্বালাল মুখে বলে, 'ওঠো! ঢাল নাও। আমার সাথে লড়াই করো। নয়ত এই শোয়া অবস্থায়ই তোমার পেটে খঞ্জর ঢুকিয়ে দেব।

অর্জুন কোনক্রমে উঠে দাঁড়াল। হাম্মাদ তলোয়ার কোষে ঢুকিয়ে গদা ওঠায়। অর্জুন যেই কিনা গদা উঠাতে ঝুকেছে সেই অমনি হাম্মাদ ওর পেটে প্রচণ্ড ভাবে গদাদ্বারা আঘাত করে। অর্জুন কয়েক হাত শুন্যে লাফিয়ে ওঠে সে আঘাতে। গলগল করে তার মুখ থেকে রক্ত ছোটে।' রত্না খুবসম্ভব এই আঘাতের কথাটাই কানে কানে বলেছিল। কেননা এভাবে সে হারেসকে আঘাত করেছিল। রক্তে উঠান ভেসে গেল। খানিক নড়াচড়া করে অর্জুন ঠান্ডা হয়ে গেল। সেই সাথে তার প্রাণপাখি দেহ পিঞ্জর থেকে বের হয়ে গেল চিরদিনের তরে।

জ্ঞান দৌড়ে অগ্রসর হোল। হাত রাখল অর্জুনের নাড়ীতে। অর্জুন ততক্ষনে অক্কা পেয়েছে। জ্ঞান দাঁড়িয়ে বললো, 'মনিব। বেটা পটল তুলেছে। মহারাজ! আপনার আগমনের পূর্বে এই জংলী ষাঁড় আমাদের সাথে এমন ভাষায় কথা বলছিল যেন তার মুখ থেকে পাথর বর্ষিত হচ্ছিল।

বিদ্যানাথ দৌড়ে এসে হাম্মাদকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন-'বেটা! তুমি এক অভিনব জংগী কৌশল রপ্ত করেছ। এই হাবেলীতে অর্জুন কিয়ামতে ছোগরা কায়েম করেছিল। বিদ্যানাথ হাম্মাদকে বাহুবন্ধন থেকে মুক্তি দিলে খালদুন দু'হাত উঁচিয়ে ধরলেন। হাম্মাদ এসে বাবার বুকে মিশে গেল। খালদূন ওর কপালে চুম্বন করে বললেন, 'বেটা! তুমি এক অসহায় বাবার তপ্ত হৃদয়কে শীতল করেছ। এক জালেমের রাহুগ্রাস থেকে জাতিকে মুক্তি দিয়েছ। এক বাবা তার গুনধর পুত্রের থেকে যা আশা করে তুমি তা-ই করে দেখয়েছো।

পরে খালদূন বিদ্যানাথকে লক্ষ্য করে বললেন, 'বিদ্যানাথ! বিদ্যানাথ!! মাফ করুন! এখন তো আপনি মুসলমান।'

'হ্যাঁ জনাব আমি মুসলমান। আমি আবুল ফাতাহ। আয়েশা আমার স্ত্রী। সাঈদার বাবা আমি। খালদূন পরে হাম্মাদকে মুক্ত করে বলেন, 'আবুল ফাতাহ! আমি কিছু বলতে চাই। আমি আপনার কাছে একটা আর্জি রাখছি। আমার আশা আজই হাম্মাদ ও রত্নার বিয়েটা হয়ে যাক। সূর্যাস্তের পূর্বেই ওদের মিয়া বিবি হিসাবে দেখতে চাই।'

রত্না শরমে আয়েশার পেছনে লুকোয়। খালদূন খামোশ হলে আবুল ফাতাহ বলেন, 'এমন একটা আর্জি আমারও আছে। আমি বলতে চাচ্ছি আমার মেয়ে সাঈদাকেও আপনার হাসানের হাতে তুলে দিতে চাই। আপনি সম্মতি দিলে কৃতার্থ হব।'

খালদূন বললেন, 'এতো আমার পরম সৌভাগ্য। সাঈদার চেয়ে ভালো মেয়ে হাসানের জন্য আমি পাব কোথায়। আজ সন্ধ্যার পূর্বেই ওদের চারজনের শুভ পরিনয় হবে।'

'বিয়ে পড়াবে কে?' প্রশ্ন আবুল ফাতাহর।

'কেন আমিই পড়াব।' বলেন খালদূন।

আবুল ফাতাহ আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। এ সময় হাম্মাদ জ্ঞানকে লক্ষ্য করে বলল, 'জ্ঞান! জ্ঞান!! শোন।'

জ্ঞান মুচকি হেসে বলল, 'মনিব! বড় মনিব যখন আবুল ফাতাহ হয়ে গেছেন তখন আমাকে জ্ঞান বলে ডাকছেন কেন? আমার নাম শরফুদ্দীন।'

হাম্মাদ হাসি দিয়ে বলল, 'আচ্ছা শরফুদ্দীন। আস্তাবলের সামনে অর্জুনের যে সাথীরা আছে তাদেরকে ডেকে আনো।'

শরফুদ্দীন আস্তাবলের সামনে দন্ডায়মান সকলকে ডেকে আনলে হাম্মাদ তাদেরকে লক্ষ্য করে বললো, 'অর্জুনের লাশ ওঠাও এবং এখনি এলাকা ছেড়ে চলে যাও। নতুবা আমার সেপাইরা তোমাদের খতম করে দেবে। তোমাদের সাথে আমার কোন দুশমনি নেই। এজন্য আমি তোমাদের ওপর হাত ওঠাব না।

এদের দুজন অর্জুনের লাশ উঠিয়ে বাকী সাথীসহ হাবেলীর বাইরে চলে গেল। হাম্মাদ তার অধীনস্ত কমান্ডারকে লক্ষ্য করে বলল, 'নাজিমুদ্দীন! সৈন্য সেপাইদের এখানে আর জরুরত নেই। তুমি সকলকে নিয়ে চলে যাও। নাজিমুদ্দীন প্রশ্নচ্ছলে হাম্মাদকে বলেন, 'ইযদুদ্দীন কিছু জানতে চাইলে কি বলব?'

'তাকে বলো, আমি ২/৪ দিনের মধ্যেই ফিরছি।'

ওই দিন বিকেলেই হাম্মাদ-রত্না ও হাসান-সাঈদার শুভ পরিনয় সম্পন্ন হলো। পাইন গাছের আড়াল থেকে গোধুলির সূর্যটা ওদের সম্ভাষণ জানাল।

ফজরের নামাযের পর হাম্মাদ তার কামরায় বসা ছিল। এ সময় রত্না কামরায় প্রবেশ করল। প্রেমময় সুরে বললো, আপনি নামায পড়েছেন কি?'

মুচকি হেসে হাম্মাদ বললো, 'আমি পড়েছি আর তুমি?'

'মামী ও সাঈদার সাথে আমিও পড়েছি। মামী খানা তৈরি করেছেন।' বলল রত্না, তিনি আর কিছুক্ষনের মধ্যে সকলকে খানার টেবিলে ডাকবেন। আমি বিশেষ একটা কথা বলতে আপনার কাছে এসেছি।'

হাম্মাদ ওর নরম তুলতুল হাত ধরে বলল, 'বলো! কি বলতে এসেছ।'

'আপনি এখানে কতদিন থাকছেন?'

'তুমি বললে আজই চলে যাব।' ঠাট্টাচ্ছলে বলল হাম্মাদ।

'যাহ! ঠাট্টা ছাড়ুন। সত্যি করে বলুন আপনি কতদিন এখানে থাকছেন। আমি এখানে একাকী থাকতে পারব না। আপনার সাথে আমাকেও নিতে হবে।

হাম্মাদের মনে দুষ্টবুদ্ধি চাপলে ও বললো, 'রত্না! আমার কানের কাছে কান পাত, তোমাকে একটি সুসংবাদ শোনাব।'

রত্না কান এগিয়ে দিলে কান ধরে হাম্মাদ বিছানায় শুইয়ে বললো, 'আমার বিবি হবার পর তোমাকে বেশ জিদ্দী মনে হচ্ছে।'

'আপনি আমার স্বামী। মেয়েরা স্বামীর সাথে জেদ ধরবে না তো ধরবে কার সাথে? এ জগতে আর কে আছে।'

রত্নার কান ছেড়ে হাম্মাদ বললো, 'আমি তো আজই এখান থেকে চলে যাবার ইরাদা করেছি।'

'কি বললেন? আপনি আজই এখান থেকে... না না! আপনাকে যেতে দেব না আমি। আপনার বিরহ আমার সহ্যাতীত। বিরহ যন্ত্রনায় বহুত ভুগিয়েছেন আমায়। আমি আপনাকে ছেড়ে আর থাকতে চাই না। আহতকণ্ঠে বলল রত্না।

'রত্না! আমি ঠাট্টা করছি না। সত্যিই আমাকে যেতে হবে আজই। দায়িত্বের হাতছানি আমাকে ডাকছে।' গম্ভীর কণ্ঠে বলল হাম্মাদ।

রত্না কেঁদে ফেলল। বলল, 'তাই বলে আজই আপনাকে যেতে দেব না।'

হাম্মাদ ওর চোখের পানি মুছে বললো, 'আগে জেনে নাও আমি যাচ্ছি কোথায়?'

কান্নাকাটি বন্ধ করে রত্না বললো, 'কোথায় যাবেন?'

'আবু বকর ও ইসমাঈলের সাথে দেখা করতে যাব সুধানীড়ে।'

'তাহলে আমিও যাব আপনার সাথে।'

'তোমাকে আমার সাথে যেতে নিষেধ করেছে কি কেউ? তুমি তো যাবেই। হাসান-সাঈদা যেতে চাইলে তাদেরও অনুমতি আছে। এক রাত ওখানে থেকে পরদিন চলে আসব। এরপর ক'দিন তোমার আঁচলে না হয় বাধা থাকলাম। সত্যি বলতে কি রত্না, এক সেপাইয়ের জীবন কখনও মসৃণ নয় বরং বন্ধুর ও কন্টকাকীর্ণ। সুধানীড় থেকে ফিরে আমি হাসনাপুর যেতে চাই।'

'হাসনাপুরেও কী আপনার কাফেলার সহযাত্রী হতে পারব আমি?'

'না এখনি তুমি আমার সাথে যেতে পারবে না। এ ব্যাপারে আব্বাজানের সাথে আমার বিস্তর আলাপ হয়েছে। এখান থেকে গিয়ে হাসনাপুরে আমি বসবাসের বাড়ী খুঁজব। খুঁজে পেয়ে তুমি আব্বা ও হাসানসহ নিয়ে ওখানে ওঠব। রত্না! মনে করনা সেপাই হয়েছি বলে কোন প্রকার পার্থিব সুখ চাইবো না। তোমাকে ছেড়ে দূরে থাকার বেদনা কেবল তোমার একার ভাবলে কি করে?'

হাম্মাদের কাঁধে মাথা রেখে রত্না বললো, 'আমি কবে বলেছি আপনি পার্থিব সুখ বিসর্জন দিয়েছেন?'

ঘরের কোনের জিন লক্ষ্য করে হাম্মাদ বললো, 'ওটা উঠিয়ে আমার ঘোড়ায় বাধো।'

রত্না জিন ওঠালে সাঈদা কামরায় প্রবেশ করে বললো, 'হাম্মাদ ভাইয়া! নাশতা প্রস্তুত। আসুন খেয়ে নেবেন। আম্মা আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

হাম্মাদ রত্নার হাত থেকে জিন নিয়ে তা নিজের পায়ের কাছে রেখে সাঈদাকে বললো, 'হাসান কৈ?'

সাঈদা লজ্জানম্র কণ্ঠে বললো, 'উনি আম্মিজানের কাছে।'

ওকে এখানে ডেকে পাঠাও। আর হ্যাঁ ওর সাথে এসো তুমিও।'

সাঈদা বের হয়ে গেলে হাম্মাদ জিন থেকে নগদ তিন তোড়া মুদ্রা বের করল। রত্নার সামনে তা রেখে বললো, 'এগুলো যত্ন করে রেখো রত্না।'

'আমাকে কেন। এগুলো আব্বাজানের কাছে জমা রাখুন না। বাড়ীর যাবতীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব মা বাবার হাতেই থাকে।'

হাম্মাদ বললো, 'ওগো! সে কথাও গতকাল তার সাথে হয়েছে। তিনি বলেছেন এখন থেকে এ সংসারের চাবিকাঠি তোমার আঁচলেই বাধা থাকবে। এ বাড়ীর মালিক যে এখন তুমিই। কাজেই নগদ অর্থগুলো তুমিই রাখ।'

মুদ্রার তোড়া হাতে নেয়া অবস্থায়ই হাসান ও সাঈদা কামরায় প্রবেশ করল। হাম্মাদ বললো, 'এসো এসো! আমি তোমাদেরই অপেক্ষায় ছিলাম। হাসান কাছে এলে ও ফের বললো, 'হাসান! তোমার কাছে কোন নগদ অর্থ আছে কি?

নিজের পকেটস্থ তোড়ার প্রতি হাত রেখে হাসান বললো, ভাইজান! আমার কাছে যথেষ্ট অর্থ আছে। আপনার প্রয়োজন থাকলে নিতে পারেন।

'পাগল কোথাকার! আমার লাগবে না। তোমার লাগে কিনা সেজন্যই না জিজ্ঞাসা করলাম। লাগলে যত মনে চায় তোমার ভাবীর থেকে চেয়ে নিও। আর সাঈদা! তোমারও কখনও প্রয়োজন পড়লে রত্নার থেকে চেয়ে নিও। ও দিতে না চাইলে আমাকেই বল। আমি বন্দোবস্ত করব।

'আমার বোনটি এতটা কিপ্টে নয় যে, অর্থ চাইলে সে দিবে না। কাজেই বন্দোবস্ত করার বিষয় থেকে নিজকে মুক্তই ভাবতে পারেন আপনি।

হাম্মাদের কি একটা মনে এলে রত্নাকে বলল, 'রত্না! আব্বাজান কোথায়?'

রত্না বললো, 'আব্বাজান ও মামা আজ ফজরের নামায মসজিদে গিয়ে পড়েছেন। মামা বলছিলেন, আজ থেকে নামায তিনি মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথেই আদায় করবেন। যাতে সকলেই তার ইসলাম গ্রহণ থেকে ফায়দা নিতে পারে। এতে দুর্বল মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি পাবে।

হাম্মাদ খামোশ হয়ে পরক্ষনে হাসানকে বললো, 'হাসান! আব্বাজানের থেকে অনুমতি নিয়েছি নাশতা খেয়ে পরিচিত কিছু মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করতে আমি সুধানীড় যাব। সুধানীড় স্বরসতীর উত্তর উপকূলে অবস্থিত। তুমি আর সাঈদা যেতে চাইলে তৈরি হও।'

হাসান কিছু বলতে চাচ্ছিল কিন্তু বলা হোল না। দরোজায় দেখা খালদুন ও আবুল ফাতাহকে। আবুল ফাতাহ ওদের লক্ষ্য করে বললেন, 'বাবারা! মায়েরা আমার! তোমাদের আম্মিজান নাশতা করতে ডাকছেন। এসো সকলে মিলে নাশতা সারি।' হাম্মাদ বেরোলে হাসান অনুচ্চস্বরে বললো, 'ভাইজান! আমি ও সাঈদা আপনার সাথে সুধানীড় যাব।

নাশতা শেষে ওরা চারজন সুধানীড়ের উদ্দেশ্যে ছুটলো।

দুই.

সুধানীড়ে পৌছে একটি মসজিদ ওদের নযরে ভেসে ওঠল। এইখানে আগে কোন মসজিদ ছিলনা। একটি নয় এমন বেশ কয়েকটা মসজিদ সুধানীড়ের শোভা বর্ধন করে যাচ্ছে। ইসমাঈলের বাড়ীর সামনে এসে হাম্মাদ দেখল গলিপথে বাঁধা পশুপালকে তিনি ঘাস পানি দিচ্ছেন। ঘোড়ার লাগাম কষে হাম্মাদ ডাকল, ইসমাঈল! ইসমাঈল!! ইসমাঈল ওকে দেখে দৌড়ে এল। হাম্মাদ ঘোড়ার থেকে নেমে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

ইসমাঈল হাম্মাদকে বাড়ীর পথ দেখিয়ে বলল, 'আসুন! পরে রত্নার প্রতি নযর পড়লে সে বলল, 'ওহ্ হো! বোন রত্নাও এসেছেন।

হাসানের দিকে তাকিয়ে হাম্মাদ বললো, 'এ আমার ভাই হাসান আর ওর পাশে ওরই স্ত্রী সাঈদা।'

ইসমাঈল হাসানের কাছে গিয়ে মোসাফাহার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন। হাম্মাদ বললো, 'ইসমাঈল। তোমার এখানে ওঠতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। তবে তার আগে ভাগে একটু আবু বকরের সাথে দেখা করতে চাই।'

'চলুন! আপনার অভিপ্রায় এমনটা হলে আমারও কোন আপত্তি নেই।' বলে ইসমাঈল বাড়ী গিয়ে খানিক দেরী করে এসে বললো 'চলুন!' পথিমধ্যে হাম্মাদ তাকে জিজ্ঞাসা করে, ইসমাঈল! এ বসতিতে আগে কোন মসজিদ ছিলনা। এক্ষনে একটা নয় বেশ কয়েকটা মসজিদের মীনার দেখতে পাচ্ছি।

ইসমাঈল আনন্দ আতিশয্যে বললো, 'আপনি যেদিন বাঘিনী মেরে এ বসতিতে নিয়ে এসেছিলেন তার কয়েক দিনের ব্যবধানেই এখানকার তিন চতুর্থাংশ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। উল্লেখ্য আপনার ওই অসম ভূমিকা আর বাঘিনীর মৃত্যুতে হিন্দুসমাজে এক বৈপ্লবিক চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল। এক্ষণে এবসতি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। খুব কমই পৌত্তলিক আছে এখানে।'

ইতোমধ্যে আলাপে আলাপে ওরা আবু বকরের দরোজার কাছে উপনীত হয়। ইসমাঈল দরোজায় করাঘাত করে। দরোজা খুলে গেলে আবু বকর বেরিয়ে আসেন। ইসমাঈল দরোজার মুখ থেকে সড়ে বলেন, 'দেখুন! আপনার বাড়ীতে আজ কাদের নিয়ে এসেছি।'

হাম্মাদকে দেখে আবু বকর খুশী জাহির করার ভাষা হারিয়ে ফেলেন। বলেন, হাম্মাদ! বেটা আমার!' পরক্ষণে বলেন, 'বীনা! বীনা! দেখ কে এসেছে!'

বীনার পেছনে তাঁর পুত্রও ছিল। হাম্মাদকে দেখে বীনা খুশীতে চিৎকার দিয়ে ওঠল। আহ্! আজ বড় খুশীর দিন। আজ এ বাড়ীতে আমার ভাই এসেছেন। পরে বীনা বৈঠক খানার দরোজা খোলে। এদিকে আবু বকরের পুত্র পালাক্রমে হাম্মাদ ও হাসানের সাথে মোসাফাহা করে। বীনা বলে, 'ভাইজান! ভেতরে আসুন!'

বীনা এতক্ষণ হাসান ও সাঈদাকে দেখেনি কেননা ওরা দরোজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। সকলে ভেতরে প্রবেশ করলে বীনার চোখ পড়ল ওদের ওপর। রত্না সাথে কোলাকুলি করে বীনা বলল, কি লজ্জার কথা আমি এতক্ষণ বোনকে দেখলাম না। রত্না এসময় হাসান ও সাঈদার পরিচয় তুলে ধরল, 'পরক্ষণে বীনা সাঈদাকেও বুকে জড়িয়ে ধরে কুশল বিনিময় করল।

সকলে বৈঠকখানায় বসে গেলে রত্না বীনাকে বলল, 'বীনা! তোমার বাবার মৃত্যুতে আমি শোকাহত।'

বীনা বললো, 'হায়াত-মউত আল্লাহর হাতে। সকলকেই তার কাছে নীত হতে হবে। বাবার জীবন যে ক'দিন ছিল তিনি সে কদিনই বেঁচেছেন। আল্লাহ মৃত্যুর

মাধ্যমে তাকে সম্মানিত করেছেন। আমার সবচেয়ে বড় খুশীর কারণ, মৃত্যুর পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তাকে জান্নাত নসীব করেন।'

হাম্মাদ বীনাকে লক্ষ্য করে বলল, 'এক নতুন কথা শোনাব তোমায়। রত্না এখন স্রেফ রত্নাই নয় আমার স্ত্রীও।

বীনা চকিতে প্রশ্ন করে, 'কবে বিয়ে হলো?'

'হয়েছে গত দিন।'

'তা আমাকে একটু জানালেন না ভাইজান!'

'কেন এই যে বিবাহোত্তর সময়টায় তোমার কাছে এলাম!'

আবু বকর বলেন, 'হাম্মাদ! নিশাপুর নাকি অন্য কোথাও থেকে এসেছ তোমরা?'

হাম্মাদ জবাব দেয়। গতকাল আমাদের বিয়ে হলে নিশাপুর থেকে একদিনে এখানে পৌঁছা সম্ভব কিভাবে। আমরা ভীম সেন থেকে এখানে এসেছি। আমার ছোট ভাই হাসানের স্ত্রী সাঈদা রত্নার আপন মামাত বোন। ওর মামা ভীমসেনের অধিবাসী। নাম আবুল ফাতাহ।

বীনা হাম্মাদকে লক্ষ্য করে বলল, 'ভাইজান! আপনারা বসে কথা বলুন। আপনাদের জন্য আমি বিশেষ খানা প্রস্তুত করতে চাই।'

হাম্মাদ নিষেধ করা সত্ত্বেও রত্না ও সাঈদাকে নিয়ে বীনা ভেতরে গেল। পুরুষেরা বৈঠক খানায় মেতে ওঠল নানান কথায়। কথায় কথায় সুধানীড় হয়ে ওঠল সুখনীড়।

খণ্ড লড়াই

হাম্মাদ স্রেফ একরাত সুধানীড়ে অবস্থান করল। পরদিন রত্না, হাসান ও সাঈদাকে নিয়ে ভীমসেনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হোল। এখানে রত্নার সান্নিধ্যে ও আরো হপ্তা দুয়েক থাকল। পরে হাসনাপুর সেনা ছাউনির উদ্দেশ্যে ভীমসেন ত্যাগ করল। এক সন্ধ্যায়ও সেনা ছাউনিতে প্রবেশ করল। ছাউনীতে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। সর্বত্রই শ্লোগান উঠল, আমীর সাহেব এসে গেছেন। ততক্ষণে হাম্মাদ ঘোর পিঠ থেকে নেমে যায়। জনৈক সেপাই ওর ঘোড়ার লাগাম ধরে নিয়ে যায় আস্তাবলে।

হাম্মাদের তাবু থেকে ইযদুদ্দীন বেরোল। প্রথমে সে হাম্মাদের সাথে গলা মেলাল। অতঃপর বলল, 'আপনি গুরুত্বপূর্ণ এক সময়ে এসেছেন। আমি ক'দিন ধরে খুব পেরেশান ছিলাম। বেশ কিছুদিন আপনার তাবুতে বসে আপনারই পথ চেয়ে বসেছিলাম।'

হাম্মাদ চকিতে প্রশ্ন করে, কেন কি হয়েছে? কোন সুসংবাদ আছে কি?'

ইযদুদ্দীন বিনয়তাপ্রকাশ পূর্বক বললো, 'তেমন কোন দুঃসংবাদ নয়। তবে এখানে আপনার বড্ড প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। চারদিন পূর্বে কুতুবুদ্দীন আইবেকের পক্ষ থেকে একজন দূত এসেছিল। তিনি আপনাকে স্বসৈন্যে আজমীরে তলব করেছেন। আমার মন বলছে, তিনি কোথাও হামলা করতে যাচ্ছেন। হাম্মাদ খিমায় প্রবেশ করে বললো, 'তোমার ধারনাই যথার্থ। গুজরাটের রাজা আমাদের পথের এমন এক কণ্টক হয়ে দাঁড়িয়েছেন যাকে না হটালে পুরো হিন্দুস্থান আমাদের হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। মাস দুয়েক পূর্বে আমি নিজেই তাকে গুজরাটের বিরুদ্ধে অভিযানের পরামর্শ দিয়েছিলাম। কেননা তাকে পরাভূত করতে পারলে গোটা ভারতবর্ষ আমাদের হাতের মুঠোয় চলে আসবে। আমি এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত যে, তিনি গুজরাটের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন।' ইযদুদ্দীন বললেন, 'আপনি আজকের রাতটা একটু বিশ্রাম নিন। কাল আমরা এখান থেকে কোচ করব।'

হাম্মাদ তার কথা রদ করে বলল, 'না না। সেপাইরা আজই রওয়ানা হবে। আমি আরামের প্রয়োজনীয়তা বোধ করছিনা। তুমি সৈন্যদের কোচ করার হুকুম দাও। যে সেপাই আমার ঘোড়া নিয়ে আস্তাবলে গেছে তাকে জিন খোলতে নিষেধ কর।'

ইযদুদ্দীন বাইরে গিয়ে নাকারা বাজাল। সংগে সংগে সেপাইরা তাবু গুটানো শুরু করল। খোলা ময়দানে সেপাইরা মাগরিবের নামায আদায় করল। রাতের খানার পরে ওরা ওখান থেকে আজমীরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হোল।

দুই.

একদিন দুপুরের পর হাম্মাদ তার সৈন্যদের নিয়ে আজমীরের উপকণ্ঠে নীত হলো। ওর চোখে ভেসে ওঠল দিগন্ত প্রসারী তাবু। আজমীরকে মনে হচ্ছিল তাবুর শহর। হিন্দুস্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সমস্ত জেনারেলকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। গুজরাটের ওদের বিপুল সৈন্য স[illegible] আশায় তাঁর এই ডেকে পাঠানো। গুজরাটের রাজা ভীমদেব কুতুবুদ্দীনের বিরুদ্ধে গোটা হিন্দু প্রশাসনকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। রাজপুতদের জড়ো করে সে আইবেককে চরমভাবে পরাভূত করাতে চাইছিল। প্রথমে সে আজমীরের ওপর চড়াও হয়ে একে দখল করার পরিকল্পনা হাতে নিল। সবশেষে গোটা হিন্দুস্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুসলমানদের কচুকাটা করার ইচ্ছা পোষণ করল। কিন্তু আইবেকও ছেড়ে দিয়ে কথা বলার মানুষ নন। তিনি আজমীরের ওপর চড়াও হবার পূর্বেই ভীমদেবকে পরাজিত করার দৃঢ় ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন।

শহর থেকে খানিক দূরে সৈন্যদের খিমা গাড়ার নির্দেশ দিল হাম্মাদ। সেনারা খিমা গাড়ার কাজ শেষ করলে হাম্মাদ ইযদুদ্দীনকে বললো, 'সেপাইদের দেখো, আমি আইবেকের সাথে সাক্ষাত করে আসি। আমি বেশির বেশী' বলে হাম্মাদ থেমে গেল। যেন শহরের দিক থেকে ও ঢোলের আওয়াজ পেল। মনে হল ঘোড়াকে তেড়ে মেরে কারা যেন হাকিয়ে নেয়ে আসছে।

হাম্মাদ থমকে দাঁড়াল। দিগন্ত প্রসারী ধুলিঝড়ের দিকে ও গভীরভাবে তাকাল। হাম্মাদ ইযদুদ্দীনকে বললো, দিগন্তের ওই ঝুলিঝড় বলছে আমাদের উদ্দেশে কোন সেনাদল আসছে। সংখ্যায় ওরা পঞ্চাশের অধিক হবে না। এরা কারা হতে পারে।'

ইযদুদ্দীন কিছু বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় দ্রুতগামী দু'সওয়ার এগিয়ে এল। হাম্মাদের আন্দায ঠিক প্রমাণিত হল। সত্যিই ওরা সংখ্যায় ৫০ এর উপরে না। হাম্মাদ ফের ইযদুদ্দীনকে বলল, 'দেখো! কুতুবুদ্দীন আমাদের দিকে আসছেন। খুব সম্ভব আমাদের আগমন বার্তা তিনি জেনে গেছেন। তার ঘোড়ার পিঠে বসা ও ঘোড়া চালনা দেখেই এ অনুমান আমার।

তুফান গতিতে আইবেক এসে হাজির হলেন। তাঁকে দেখেই হাম্মাদ তাজিমস্বরূপ ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে দাঁড়াল এবং সাদর সম্ভাষণ জানাল। আইবেকের চেহারা ও পোষাক-আষাক ধূলি-ধূসরিত। হাম্মাদের কাছে এসে তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে নামলেন। হাম্মাদের সাথে কোলাকুলি করে বললেন, 'আমি খুব শীঘ্র গুজরাটে হামলা করব। তোমার কথামত রাজা ভীমদেবকে শায়েস্তা করতে চাই। গুজরাট জয় করতে পারলে হিন্দুস্থানে আমাদের কোন বাধা থাকবে না। আমার যদ্দুর বিশ্বাস তুমি নির্ধারিত সময়ের চারদিন পরে পৌঁছেছো। আমার ভয় হচ্ছিল, ভীমদেবের সৈন্য পথিমধ্যে তোমার পথ আগলায় কি-না। খোদার শোকর তুমি ছহি-ছালামতে পৌঁছুতে পেরেছো। যাহোক, তা তোমার দেরী হলো কেন?'

এ প্রশ্নের জবাবে হাম্মাদ রত্নাকে তুলে আনা পরবর্তী কাহিনী বলে গেল।

এক কুশলাদি শেষে আইবেক বলেন, 'তুমি শাদী করেছ কী?'

মুচকি হেসে হাম্মাদ বললো, 'হ্যাঁ করেছি।'

আইবেক এবার কৃত্রিম গোস্বাভরে বললেন, 'অদ্ভুত ব্যাপার তো! তুমি শাদী করেছ অথচ এ খবরটুকু পর্যন্ত আমাকে দাওনি!'

আত্মপক্ষ সমর্থনে হাম্মাদ বললো, একটা গ্যাড়াকলে আটকে যাবার দরুন আমাকে তড়া করে বিয়ের পীড়িতে বসতে হয় নয়ত এ সময় আমার বিয়ে করার কোন পরিকল্পনা ছিল না। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, আমার মা ও ভাই খুন হয়ে যান অল্প কিছু দিনের ব্যবধানে।

'তোমার মা-ভায়ের মৃত্যুতে আমি শোকাহত।'

ইযদুদ্দীন এতক্ষণ খামোশ দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি ইযদুদ্দীনক ও হাম্মাদ দু'জনকেই লক্ষ্য করে বললেন, এসো ভেতরে এসো। তোমাদেরকে আমিও একটা খোশ খবর শোনাতে চাই।

হাম্মাদ বললো, 'কী! আপনিও শাদী করেছেন বুঝি?'

'করিনি। তবে করার কাছাকাছি বলতে পারো। বেশ ক'দিন হলো গজনী থেকে সুলতানের এক ফরমান এসেছিল। তিনি আমাকে গজনী তলব করেছিলেন। ভীমদেবকে শায়েস্তা করে আমি তড়া করেই গজনী যাব। আমার অবর্তমানে তুমিই হিন্দুস্থানে আমার স্থলাভিষিক্ত থাকবে। সুলতান আমার পাত্রী নির্বাচন করে ফেলেছেন ইতোমধ্যে। আমার নামে লেখা পত্রে তিনি ব্যাপারটা খোলাসা করে দিয়েছেন।

হাম্মাদ নড়ে চড়ে বসল। উৎসুক হয়ে বলল, 'পাত্রীর পরিচয়টা কী জানতে পারি! তিনি কী ভারতীয়, নাকি গজনীর?

'কোনটাই না।'

হাম্মাদ ও ইযদুদ্দীন হতবাক হলো একথায়। আইবেক ব্যাপারটা ওদেরকে এভাবে বললেন, 'আসলে তিনি কিরমানের সুলতান তাজুদ্দীন ইয়ালিদোজের পরমা সুন্দরী মেয়ে।'

'এমন সুন্দরী মেয়েকে স্ত্রী হিসাবে পাবার আগে ভাগেই আপনাকে মোবারকবাদ দেই।

তিন

গুজরাটের রাজা ভীমদেব তার সৈন্য সংখ্যা কয়েক গুন বাড়িয়ে নিলেন। এছাড়া কনৌজ, মথুরা, গোয়ালিয়র কালিঞ্জর, আজমীর ও রথম্বরার কেল্লাগুলোতে আশ্রয় নেওয়া রাজপুতদেরও তিনি জমায়েত করে চমক দেখালেন। ভীমদেবের অহংকারের সীমা নেই। তার বিশ্বাস, দুনিয়ার কোন শক্তি তাকে হারাতে পারবে না। বিশাল এক আশা নিয়ে অবশেষে তিনি আজমীরের উদ্দেশ্যে গুজরাট ছাড়লেন। গুজরাটের বড়

মন্দিরে গিয়ে মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন— আইবেককে শাস্তি না দিয়ে তিনি গুজরাটে ফিরবেন না।

ভীমদেব সসৈন্যে গুজরাট থেকে সামান্য দূরে ছাউনী ফেলেছিলেন, এসময় তার গুপ্ত চরেরা সংবাদ দিল যে, আইবেক বিশাল এক সেনাবহর নিয়ে গুজরাট পানে ধেয়ে আসছেন। ভীমদেব ওই সময় পাহাড়ী এলাকা অতিক্রম করছিলেন। গুজরাটে যাবার রাস্তা আজমীর থেকে কেবল একটিই। ভীমদেব নিশ্চিত যে, আইবেককে এ পথেই গুজরাট যেতে হবে। কাজেই পাহাড়ের উঁচু নীচু এলাকায় তিনি সৈন্য ওঁৎপেতে রাখলেন। আইবেকের ওপর গেরিলা হামলা চালাতেই তাঁর এই পরিকল্পনা। জালের মত সৈন্য ছড়িয়ে দেয়ায় গুজরাটে পৌঁছুতে পৌঁছুতে তার সৈন্য সংখ্যা কমে এল।

সত্যিই ভীমদেবের এ প্লান খুবই যুৎসই ছিল। কেননা গুজরাটের এই গিরিসংকুল একমাত্র পথে এভাবে গেরিলা নিয়োগে যে কেউই পরাভূত হতে বাধ্য। পরবর্তীতে তিনি অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে খোলা ময়দানে তাবু গাড়লেন।

এদিকে আইবেকের গুপ্তচরও তাকে এই গেরিলা নিয়োগের সংবাদ জানাল। তিনি ভীমদেবের চালাকি ধরে ফেললেন। সুতরাং ওই পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরলেন। জীবন বাজী রেখে দুর্গম এই পথ অতিক্রম করে আইবেক সেখানে এসে তাবু গাড়লেন যেখানে ভীম দেব তাবু গেড়ে অপেক্ষমান ছিল।

আইবেকের পথ বদলের খবর শোনা মাত্রই ভীমদেবও তার গেরিলা সেনাদের জরুরী তলব করলেন। দু'একদিন বিশ্রামের পর উভয় সেনাদলই মুখোমুখি হোল।

আইবেক এ ময়দানে তার মনিব মোহাম্মদ ঘুরীর পদাংক অনুসরণ করলেন। সেনাদলের মধ্যভাগ নিজের অধীনে রাখলেন। অগ্রগামী বাহিনীর দায়িত্ব দিলেন হাম্মাদের হাতে। ডান বাহুর কমান্ডার আরসালান খলজী। বামবাহু খরমীল জেনারেলের অধীনে। উভয় বাহিনীর ব্যান্ডপার্টি রণসংগীত বাজিয়ে ময়দানকে প্রকম্পিত করে তুলেছিল। গোটা ময়দানে দেখা দিল যুদ্ধ উন্মাদনা।

ভীমদেবের সৈন্যদের থেকে এক বিশালদেহী বর্মাচ্ছাদিত রাজপূত বেরিয়ে এল। রণাঙ্গনের মাঝ বরাবর এসে সে এক হাতে তলোয়ার আরেক হাতে ঢাল উঁচিয়ে দাম্ভিকতাপূর্ণ স্বরে বললো, তোমাদের মধ্যে এমন কি কেউ আছে যে আমার সাথে একাকী যুদ্ধ করবে? মধ্য বাহিনী থেকে আরসালান খলজী এবং বাম বাহিনীর প্রধান খরমীল দ্রুত ঘোড়া হাঁকিয়ে রাজপূতের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে এগিয়ে গেল। কিন্তু আইবেক তাদের বারণ করে হাম্মাদকেই তার মোকাবেলায় নামতে নির্দেশ দিল।

আইবেকের নির্দেশে হাম্মাদ ঘোড়ায় পদাঘাত করল। ময়দানে নেমে হাম্মাদ রাজপুতের চারপাশে চক্কর দিতেছিল। রাজপুত হাম্মাদের দিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্য ভরে বললো, দূরত্ব বজায় রেখে আমার চার পাশে ঘোড়া চক্কর দিচ্ছ যে। বাহাদুরী ফলাতে চাও তো আমার কাছে এগিয়ে এসো। ভয় না পেলে এগিয়ে এসো। দেখ রাজপুতের সাথে মোকাবেলা করার পরিণতি কী!

হাম্মাদ ওর গদা হাতে নিয়ে শূন্যে ঘোরাল। রাজপূতের কাছটিতে এসে বললো, 'তুমি তোমার নামটা বল। এরপর দেখো আমার গদা ওই নামের দেহের ওপর কি করে হামলা করে।

রাজপূত ঘোড়া হাঁকিয়ে ওর কাছটিতে এসে বললো, 'আমার নাম শিব নারায়ণ। ভীমদেবের সৈন্যদের মধ্যে আমিই সেরা। দেখো আমার তলোয়ারের আঘাত সহ্য করার মত মানুষ এ ময়দানে আছে বলে মনে হয়না।'

হাম্মাদ বললো, 'মনে রেখো! আমার নাম হাম্মাদ। আমি আইবেক বাহিনীর অগ্রগামী বাহিনী প্রধান। আমি এ বাহিনীর সবচেয়ে কম অভিজ্ঞ ও অপ্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জেনারেল। হয়ত তোমার মোকাবেলায় আমি হারব। আমার পরবর্তীতে তোমার বিরুদ্ধে এমন জেনারেল নামবেন, যারা তোমাকে কাঁচা লবণ দিয়ে চিবিয়ে খাবেন। আমার সবচেয়ে বড় পরিচয় এই যে, আমি আইবেক বাহিনীর নগণ্য এক সেপাই। তোমার গদা হাতে নাও। আমি আক্রমনে যাচ্ছি। দেখা যাবে কার বাহুতে কত বল।

শিব নারায়ণ লজ্জিত যবানে বললো, 'আমার কাছে গদা নেই। তলোয়ার দিয়ে পারলে লড়।

আমি গদা বিদ্যা রপ্ত করিনি।'

হাম্মাদ দাঁত পিষে বললো, 'আচ্ছা আহাম্মক তো দেখছি। গদা চালাতে জানো না। যাকে তুমি চিবিয়ে খেতে ময়দানে এসেছো তার যুদ্ধনীতির উল্টা অস্ত্রে এসেছো। যাও এমন কাউকে নিয়ে এসো যে গদা চালাতে জানে। আমি অপারগ ও অসহায়ের ওপর হাত তুলি না। নয়ত তোমাকে হালুয়া বানিয়ে ফেলব।'

'এত প্যাচাল রেখে হিম্মত থাকলে গদা রেখে তলোয়ার নিয়ে আমার মোকাবেলা কর। দেখা যাবে কতখানি তলোয়ারী ট্রেনিং আছে তোমার।'

শিব নারায়ণ তলোয়ার নিয়ে আক্রমন করতে যাবে সেই মুহূর্তে হাম্মাদ গদা ফেলে তলোয়ার বের করল। শিব নারায়ণ বিদ্যুৎ গতিতে ওর ওপর ঝাপিয়ে পড়ল। হাম্মাদ জংগী কৌশলে ওই আঘাত প্রতিহত করল।

এবার হাম্মাদ পাল্টা আঘাত হানল। দুই বীরের ঘোড়া লম্ফন কুর্দন করতে করতে হ্রেষা ধ্বনি দিল। তলোয়ারের ঝনঝন আওয়াজে গোটা মাঠ ঝংকৃত হলো। উভয় সেনারা জীবন-মৃত্যুর এই মল্লযুদ্ধ উদ্বিগ্ন ভরে দেখে যাচ্ছিল।

হাম্মাদ প্রতি পক্ষকে প্রবল দেখে কৌশল পাল্টাল। মুখোমুখি যুদ্ধ না করে ও ডান-বামে ঘোড়া নিয়ে গেল। হাম্মাদ তলোয়ার দ্বারা প্রচন্ড আঘাত হানলে নারায়ণ তার তলোয়ার ধারণ করার শক্তি হারাল এবং ঘোড়ার পিঠ থেকে নীচে পড়ে গেল। তলোয়ার ফেলে হাম্মাদও তার ওপর ঝাপিয়ে পড়ল। পরে ওরা আবার তলোয়ার তুলে নিল। ঘোড়ার পিঠে বসে নারায়ণ বেশ যুৎসই ও সহজভাবে হামলা করে যাচ্ছিল কিন্তু নীচে নামার পর তার অবস্থা পাল্টে গেল।

হাম্মাদের আঘাতে এক সময় নারায়ণের তলোয়ার ভেঙেই গেল। তলোয়ার ভেঙে যাওয়ার পর দু'হাতে ঢাল চেপে ধরল নারায়ণ।

তলোয়ার ঘুরাতে ঘুরাতে হাম্মাদ বললো, 'দেখো! তোমার যাবতীয় যুদ্ধকৌশল আমি ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছি। রাজপুতের হাত থেকে তলোয়ার ভেঙে খসে পড়া শোভা পায় না। আমি নিরস্ত্রকে আঘাত করা পছন্দ করি না। তোমাকে নতুন তলোয়ার দিচ্ছি। এসো এবার লড়।

হাম্মাদ এক সময় চূড়ান্ত আঘাত হানল। ইথারে শোনা গেল শির নারায়ণের গগণ বিদারী আর্তনাদ। ওর তলোয়ার শত্রুর গলায় লেগে তা দু'ভাগ করে দিল। এভাবেই দ্বৈত যুদ্ধে হাম্মাদ জিতে গেল। মুসলিম শিবিরে খুশীর নাকারা বেজে ওঠল আর হিন্দু শিবিরে শোকের মাতম।

চার

রাজা ভীমদেব কালক্ষেপন না করে ব্যাপক হামলার নির্দেশ দিলেন। তার যুদ্ধ বহরের সামনে ছিল রাজপূতগণ। কোন এক অজানা কারণে তিনি এই যুদ্ধে হাতি ব্যবহার করেন নি। ওদিকে আইবেকও তার বাহিনীকে ব্যাপক হামলার অনুমতি দেন।

পাহাড়ী অঞ্চল দু'দল সৈনিকের যুদ্ধকার্যে কেঁপে ওঠল। মুসলিম আক্রমনের প্রথম ধকলেই ছত্রখান হয়ে গেল ভীমদেবের প্লান। তার সৈন্যরা যুদ্ধের মাঠে চরম কাপুরুষতার পরিচয় দিল। তাদের মাঝে পরাজয়ের ভাব ফুটে ওঠল। রাজা ভীমদেব অবস্থা বেগতিক দেখে রাজপূতদের আত্মসম্ভ্রমে টোকা মেরে উৎসাহিত করে গেলেন। বৃথা গেল তার এ প্রচেষ্টা। সৈন্যদলের পর সৈন্যদল আগপাছ করেও কোন ফল হলো না। কেউই পা জমে মুসলমানদের মোকাবেলায় দাঁড়াতে পারল না। রাজা ভীমদেবের সৈন্যদের মাঝে একটা ব্যাপার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। যেখানে ভীমদেব সুরক্ষিত সেনা প্রহরায় ছিলেন সেখানে মুসলিম সেনাপতি আইবেক সৈন্যদের একেবারে সামনে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন।

সৈন্যদের এ প্রতিক্রিয়া আঁচ করতে পেরে তিনি সেনাপ্রহরা থেকে সরাসরি ময়দানের সামনের কাতারে চলে এলেন। তার আশা, এতে ফল হবে এবং এরপর তিনি মুসলিম শিবিরকে নাস্তানাবুদ করবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য তার এসব পরিকল্পনা গরমিল হল।

এদিকে ভীমদেবকে সামনের কাতারে দেখে আইবেক সকল জেনারেলকে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে পূর্ণ শক্তিতে আক্রমন করার নির্দেশ দিলেন।

এ আঘাত সহ্য করার শক্তি পৌত্তলিকদের কৈ রাজপূতরা পালাল। জেনারেলরা রণে ভঙ্গ দিল। মুসলিম জানবায ফৌজের একদল ভীমদেবের ওপর চড়াও হোল। ৫০ হাজার হিন্দু সৈন্য মারা পড়ল। মুসলিম ফৌজ পলায়নপর হিন্দুসেনাদের পশ্চাদ্ধাবণ করল। এদের খুব কম সংখ্যকই গুজরাটে পালাতে পারল।

অগ্রপথাত

গজনীর রাজমহল।

সুলতান মোহাম্মদ ঘুরী তার শিশুকন্যার সাথে পিতৃসুলভ খেলায় মগ্ন।

এ সেই রাজমহল যেখানে এক সময় সিংহাসনে বসেছিলেন সোমনাথ বিজেতা সুলতান মাহমুদ গজনবী।

এ প্রাসাদের প্রবাদ পুরুষ এক সময় নগর কোট, মথুরা, মুলতান, নন্দনা, কনৌজ, মীরাট, মহাবন, কালিঞ্জর, লাহোর গোয়ালিয়র ও সোমনাথ জয় করেছিলেন। এই রাজমহলে বসেই গজনীবাসির জন্য একদিন সোমনাথের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন কিংবদন্তী মাহমুদ। যার দৃঢ় ইচ্ছায় সম্মুখে ভেঙ্গে পড়েছিল সোমনাথের পাষাণ গাত্র।

এসেই রাজমহল যা দেখেছে খোদার রাহে জীবনোৎসর্গী মর্দে মুমিনের ঘোড়া। এ প্রাসাদে বসেই ভারতের রাজা জয়পাল, নন্দনপাল, তারালোচন পাল, প্রেমদেবের মাথা নত করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন গজনী—সিংহ।

মোহাম্মদ ঘুরী আজ সেই প্রাসাদের শোভা বর্দ্ধন করে যাচ্ছেন। দ্বিতীয় মাহমুদ হয়ে তিনি তরাইনের ময়দানে পৃথ্বিরাজকে কুপোকাত করেছেন।

আচমকা প্রাসাদের প্রভাবশালী জনৈকা মহিলার কথায় তার ধ্যানভঙ্গ হলো। তাকে বলা হোল, ভারত থেকে আইবেক এসেছেন। তিনি বৈঠক খানায় আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী। শিশুকন্যাকে মহিলার হাতে তুলে দিয়ে সুলতান বেরোলেন। কোন প্রকার ভূমিকা ছাড়াই আইবেককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'গুজরাটের রাজা ভীমদেবের সাথে তোমাদের যুদ্ধের ফলাফল কী?'

'আলীজাহ!' আইবেক বললেন, 'আল্লাহ আমাদের বিজয় দান করেছেন। ভীমদেব রণাঙ্গনেই মারা পড়েছে। গুজরাট এখন আমাদের কব্জায়।'

'রণাঙ্গনে হাম্মাদের কার্যক্রম কেমন ছিল?'

'আলীজাহ! হাম্মাদের কার্যক্রম কী বলার অপেক্ষা রাখে। তার মত জাদরেল সেনা কমান্ডার পেয়ে সত্যিই আমি গৌরবান্বিত।'

'আমি শুনেছি আজমীরের বাইরে কোন এক যুদ্ধে তুমি আহত হয়েছিলে। এটা কি সত্য?

হ্যাঁ। আমি আহত হয়েছিলাম।'

'তা তুমি প্রাণে রক্ষা পেলে কি করে?'

'আহত অবস্থায় আমি যখন ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাচ্ছিলাম তখন হাম্মাদ আমাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিল এবং যুদ্ধের মাঠ থেকে আমাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গিয়েছিল।

'আইবেক! হাম্মাদ তোমাকে দ্বিতীয় বারের মত বিরাট এক এহসান করল। আমার আশা, তুমি ওকে কোন একটা প্রদেশের গভর্নর বানিয়ে দাও। এটা ওর জংগী কারিশমার স্বীকৃতি।'

'গুজরাট বিজয়ের পর এই প্রদেশটির গভর্নর হবার প্রস্তাব দিয়েছিলাম ওকে। কিন্তু সে অস্বীকার করে বসে। বলে, আমাকে রণাঙ্গনে থাকতে দিন। গদীর চেয়ে ঘোড়ার পিঠ আমার জন্য সুখকর।'

সুলতান এবার কথার মোড় ঘুরাতে গিয়ে বললেন, 'তুমি তো জানতে চাইলে না যে, তোমার অনুপস্থিতিতে আমি কি করে তোমার শাদীর এন্তেজাম করলাম?'

'স্নেহশীল পিতার দরদ নিয়ে কেউ পুত্রের জন্য কোন কাজ করলে তাতে পুত্রদের কিছু জানতে চাওয়া ঠিক হয় কী? আমার কল্যাণকামী এ জগতে আপনার চেয়ে আর অধিক কে আছে? আপনার মতের বাইরে আমি কোনদিনও যাইনি। যাওয়ার ইচ্ছাও নেই।

'তাজুদ্দীন ইয়ালদোজের শাহজাদী কন্যাকে তোমার জন্য নির্বাচন করেছি। তাকে প্রস্তাব করতেই তিনি আনন্দে রাজী হয়ে গেছেন। আমার এখানে কিছুদিন থেকে তুমি তাজুদ্দীনের ওখানে চলে যাও। তার নামে তোমার কাছে পত্র দেব। বিয়ে করে ওখান থেকেই হিন্দুস্থান রওয়ানা হয়ে যাবে। আর শোন! হিন্দুস্থান থেকে এখানে এক জেনারেলকে আনতে চাই। তুমি হাম্মাদ কিংবা খরমীলকে প্রেরণ করো।

'আপনি বাস্তবিকই কোন জেনারেলকে চাইলে খরমীলকে নিয়ে নিন।'

'হাম্মাদ নয় কেন?'

'ওকে ছাড়া হিন্দুস্থানে আমি বড্ড একা হয়ে পড়ব। যুদ্ধের মাঠে অসম পরিস্থিতিতে আশার আলো দেখাতে পারার মত ও ছাড়া কেইবা আছে। ও এক আশির্বাদ। আমি হিন্দুস্থান গিয়েই খরমীলকে প্রেরণ করব। হাম্মাদ বর্তমানে দিল্লী আছে। ও ইতোমধ্যে শাদী করেছে। দিল্লীতেই ওর বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছি।'

'কি! হাম্মাদ শাদী করেছে! কবে? কোথায়! ওর জন্যও তো আমি পাত্রী নির্বাচন করে রেখেছিলাম।

'আলীজাহ! ওর শাদীর কাহিনী বড় করুণ ও নিষ্ঠুর। সময় সুযোগমত আপনাকে শোনাব। গুজরাটে কিছু হিরা জহরত আমরা হস্তগত করেছি। এর কিছু নিয়ে এসেছি। মহলে তা এনে রেখেছে আমার লোকজন।'

'আইবেক! আমি অবশ্যই দেখব তুমি কি নিয়ে এসেছো।' বলে সুলতান হিরা দেখতে বেরোলেন।

দুই.

গভীর রাত।

আবুল ফাতাহর হাবেলী নারী কণ্ঠের আর্তনাদে কেঁপে ওঠল। আর্তনাদটা রত্নার কামরা থেকে বেরুচ্ছিল। মনে হচ্ছে কেউ ওর কণ্ঠনালী চেপে ধরেছে, তাই আর্তনাদের পাশাপাশি শোনা গেল গোঙানীও।

আবুল ফাতাহ ও আয়েশা দ্রুত কামরা থেকে বেরুলেন। তারা আর্তনাদ শুনে রত্নার কামরার উদ্দেশ্যে ছুটে গেলেন।

তাদের পেছনে বেরিয়ে এলেন খালদুনও। তারা সকলেই রত্নার দরোজা থাবড়াচ্ছিলেন। কিন্তু রত্নার পক্ষ থেকে কোন জবাব এলোনা। সে সমানেই চিৎকার দিয়ে যাচ্ছে। পরিবেশটা ক্রমেই ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। এক সময় হাসান ও সাঈদাও ওই আওয়াজ শুনে বেরোল। হাসান হয়রান হয়ে বলল, বাবা! কি হয়েছে? ভাবীর রুম থেকে অমন আওয়াজ বেরুচ্ছে কেন?

খালদুন বললেন, 'আমার কিছুই বুঝে আসছে না বেটা। জানিনা কি হয়েছে। দেখো ও কি ভয়াল চিৎকার দিচ্ছে।'

রত্নার চিৎকার ক্রমশঃ বুলন্দ হতে চলেছে। আবুল ফাতাহ কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'হাসান!

হাসান! দরোজা ভেঙ্গে ফেল। আমার মন বলছে ভেতরে কিছু হচ্ছে। ওর কিছু হলে আমরা হাম্মাদের কাছে কি জবাব দেব।

হাসান দরোজা কয়েকবার থাবড়ে শেষ পর্যন্ত শাবল দ্বারা তা ভেঙ্গে ফেলল। কপাট ফরাশে গিয়ে পড়ল। সকলে রত্নার কামরায় প্রবেশ করল। রত্নাকে শোয়া দেখা গেল। ওই অবস্থায়ই ও চিৎকার দিয়ে চলেছে।

খালদুন অগ্রসর হয়ে কম্পিত হস্তে রত্নার মাথায় হাত রাখলেন। ডেকে বললেন, 'রত্না! রত্না!! বেটি আমার! তোমার কি হয়েছে?'

রত্না নিথর শায়িত। ওর চিৎকার বন্ধ হয়েছে। খালদুন মাথা ধরে আবারো ডাকলেন. 'রত্না!

রত্না! ওঠো বেটি! কি হলো তোমার। চিৎকার দিয়ে উঠে বসল রত্না, পরক্ষণে খালদুনকে জড়িয়ে ধরল। তিনি বললেন,

'তোমার কি হয়েছে মা! বলো কিছু।'

রত্না চারদিকে বড় চোখ করে তাকাল। চোখের পানি ওড়নায় মুছল। না জানি কি দেখে চিন্তার সাগরে ডুবে গেল।

আয়েশা অগ্রসর হয়ে রত্নাকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। বললেন, 'কি হয়েছে বেটি! কথা বলছ না যে। সাঈদা ওর হাত পা টিপে দিল। কম্পিতকণ্ঠে রত্না বলল, মামী! এক ভয়ানক স্বপ্ন দেখেছি আমি। ওকে নিয়ে আমার এই দুঃস্বপ্ন দেখা। আবুল ফাতাহ বললেন, 'তুমি কি হাম্মাদের ব্যাপারেই দুঃস্বপ্ন দেখেছো?'

'হ্যাঁ! মামা।'

'কি স্বপ্ন দেখেছো' জলদী বলো, আমি খুবই উদ্বিগ্নবোধ করছি।'

'আমি দেখলাম শুষ্ক এক বনে আগুন লেগেছে। আগুনের লেলিহান শিখা পুরো জংগলে ছড়িয়ে পড়ছে। মনে হচ্ছে গোটা পৃথিবীকেই গ্রাস করে নেবে। ওই আগুনে হাম্মাদকে পতিত দেখলাম। প্রাণরক্ষায় ও হাত পা নাড়ছে। ওর অবস্থা এমন যে যুদ্ধে আহত হয়ে বাড়ী ফিরতে গিয়ে ওই আগুনে পড়েছে। ওর দেহে রক্তের ছাপও দেখলাম।

থামল রত্না। খানিক দম নিয়ে বলল, 'বেশ কিছুক্ষণ ওকে আমি হাত-পা নেড়ে তড়পাতে দেখলাম। পরে ওই জংগলের মধ্যে এক লোকের আবির্ভাব ঘটল। দেখতে সে হাম্মাদের তুলনায় ছোট ও কম কমযোর।

ওইলোক ওকে আগুন থেকে বাচাতে সচেষ্ট হল এবং আগুন থেকে বাঁচাল। এ সময় আম্মাজানকে সাদা কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখলাম। তিনি ওই লোকের হাত থেকে হাম্মাদকে ছিনিয়ে নিলেন এবং হাম্মাদকে নিয়ে আগুনের ভেতর ঢুকলেন। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে চিৎকার দিচ্ছিলাম। কিন্তু মা-বেটা কেউই আমার চিৎকারে সাড়া দিল না। এক সময় ওদের কোন টিকিটি খুঁজে পেলাম না।' রত্না খামোশ হয়ে গেল।

বারবার শুকনো ঠোঁট দুটো চাটল। আয়েশা সাঈদাকে বললেন, 'সাঈদা! ওর জন্য পানি আনো।' সাঈদা উঠে বাইরে চলে গেল। হাসান গভীর চিন্তায় মগ্ন। ও এই ভয়াল দুঃস্বপ্নের তাবীর খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কামরায় পীন পতন নিস্তব্ধতা, সকলেই এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত পেতে মশগুল।

খালদূন রত্নাকে ডেকে বললেন, 'বেটি! তোমার স্বপ্নটা সত্যিই ভয়াল ও রহস্যপূর্ণ। খালদূন আর কিছু না বলে চুপ করলেন। কেননা বাইরে দরোজায় করাঘাত চলছে। আবুল ফাতাহ চকিতে বলেন, এই গভীর রাতে আবার কে এল?'

খালদূন বললো, 'আয় মাওলা! এই গভীর রাতে যেন কোন সুসংবাদ আসে। কোন দোস্ত যেন আসে। দুশমন যেন না আসে। হাসান দেখতো কে এসেছে?'

আবুল ফাতাহ চিৎকার দিয়ে বললেন, 'হাসান! বেটা থেমে যাও। তুমি নও দরোজা খোলব আমি। এই স্বপ্ন আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। না জানি আগন্তুক কে!

আবুল ফাতাহ বেরিয়ে গেলেন। দেউড়ী ফটকে কুকুরগুলো ডাকছে।

হাবেলীর বেলকনিতে দাঁড়িয়ে আবুল ফাতাহ শরফুদ্দীনকে ডাকলেন। বললেন, শরফুদ্দীন! আস্তাবলের ও প্রান্ত থেকে শরফুদ্দীন বললো জী মনিব!'

'কুকুরগুলো বেধে দেখোতো কে এসেছে?'

কুকুর বেধে শরফুদ্দীন ফটক খুলে দিল। দেখল ঘোড়ায় জনৈক সওয়ার ভেতরে ঢুকছে।

আবুল ফাতাহকে শরফুদ্দীন বললো, 'মনির হাম্মাদ এসেছেন।'

আবুল ফাতাহ ফওরান সিড়ি বেয়ে নামলেন। হাম্মাদকে লক্ষ্য করে বললেন, এই মাত্র রত্না তোমাকে নিয়ে এক দুঃস্বপ্ন দেখেছে। ওই স্বপ্ন শুনে যে কারো লোমকূপ শিউরে ওঠবে। তুমি দ্রুত উপরে এসো।'

আবুল ফাতাহ হাম্মাদের হাত ধরে রত্নার রুমে নিয়ে এলেন।

কামরায় ঢুকে তিনি বললেন, তোমরা চিন্তা করো না। যাকে নিয়ে তোমাদের চিন্তা সে এসে গেছে।

সকলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যেন। রত্না হাম্মাদকে দেখে স্বপ্ন ভুলে গেল। আবুল ফাতাহ ওকে রত্নার পাশে বসিয়ে বললেন, আমাকে রত্নার স্বপ্নের তাবীর বোঝাও।

হাম্মাদ রত্নার থেকে স্বপ্ন শোনল। রত্না খামোশ হলে খালদূন বললেন, 'হাম্মাদ! তোমার এ কয়েকদিনের এমন কোন ঘটনা ঘটেছে কি-না বল।'

হাম্মাদ মুচকি হেসে বলল, 'রত্নার স্বপ্ন সত্যি। ও যে আগুন দেখেছে তা গুজরাটে ভীমদেবের সাথে পাহাড়ী অঞ্চলে সংঘটিত আমাদের যুদ্ধ বুঝায়। ওই যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করেছি এবং ভীম দেবের ভবলীলা সাঙ্গ করেছি। আমাকে যে লোক আগুন থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছেন তিনি আইবেক যিনি যুদ্ধের পর আমাকে গুজরাটের গভর্নর বানানোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন, আমি তা অস্বীকার করেছি। কুতুবুদ্দীন আইবেকের হাত থেকে আগুনে নিয়ে আম্মাজানের প্রবেশ সংক্রান্ত ব্যপারটা আমার ঐ গুর্ভনরী ত্যাগ এবং যুদ্ধের মাঠে থাকার চিত্র মাত্র।'
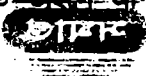
স্বপ্নের তাবীর শুনে সকলের চেহারা খুশীতে ডগমগ করে ওঠল। খালদূন ওর পিঠে হাত রেখে বলেন, কতদিনের জন্য এসেছো বাবা!

'স্রেফ দু'দিনের জন্য। আমি আপনাদের নিয়ে যেতে এসেছি। দিল্লীর খন্ড রায়ের প্রাসাদ আমাকে দেয়া হয়েছে। আইবেক বিয়ে করতে গজনী গেছেন। কিছুদিনের মধ্যে এসে যাবেন তিনিও। মহলের অর্ধেক আমার আর অর্ধেক তার।

সাঈদাকে লক্ষ্য করে মা বললেন, 'সাঈদা! ওঠো বেটি। অসুরের জন্য খানা তৈরি করো।

হাম্মাদ সাঈদাকে বারণ করে বললো, 'বসো বোন! ওই ঝামেলা আমি পথিমধ্যে চুকে এসেছি।' পরে আয়েশা বললেন, 'সকলে চলো। ভোর হয়ে আসছে। খানিক বিশ্রাম নিই।

সকলেই কামরা থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় হাসান পন্ডিত দরোজা উঠিয়ে কোনক্রমে চড়িয়ে দিল। রত্না উঠে হাম্মাদের জুতো ঠিক করল।

হাম্মাদ ওর হাত ধরে বলল, 'জুতো আমিই ঠিক করছি। আমি খুলে নেব জুতো।

'স্বামীর সেবা করার সুযোগ দিতে কেবল আপনি নারাজ। কেন আমাকে এই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করছেন?'

রত্না প্রথমে হাম্মাদের জুতো খুলল এবং তা জুতোদানিতে রাখল। রাতের সাধারণ পোষাকের জোড়া হাম্মাদের হাতে তুলে দিল। হাম্মাদ পোষাক বদল করে বলল। তুমি এ কোন ধরনের স্বপ্ন দেখা শুরু করলে। কি চড়ুই পাখির মত প্রাণরে বাবা।

এর প্রত্যুত্তরে রত্না ওকে জড়িয়ে ধরল। মাথা স্বামীর কাধে রেখে ও বলল. বাজপাখির স্নেহছায়ায় থাকলে চড়ুই পাখি ভয় পায় কি করে?

তিন.

গজনী প্রাসাদের বাইরে একদিন কুতুবুদ্দীন আইবেককে আল বিদা দিচ্ছিলেন সুলতান মোহাম্মদ ঘুরী। আইবেকের বাহিনী তার সাথে বিদায়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সুলতান তাকে শেষ মুহূর্তে বললেন, আইবেক! এখান থেকে সোজা কিরমানি যাবে। বিয়ে করে যাবে হিন্দুস্থান। খরমীলকে গিয়েই আমার কাছে পাঠাবে। বলবে, গজনীতে তোমাকে বিশেষভাবে প্রয়োজন। আর শোন! হাম্মাদ বিন খালদূনকে তোমার সেনাবাহিনীর প্রধান বানাবে। তোমার আর ওর মাঝে কখনও কলহ হলে পরস্পরে যুদ্ধে যেয়োনা। ওকে তৎক্ষনাৎ গজনী রওয়ানা করিয়ে দিও। আমি জাতির কল্যাণের জন্য ওর থেকে কাজ নেব। দিল্লীতে ওকে তোমার ছত্রছায়ায় রেখো। যুদ্ধেও কাছাকাছি রেখো। তিনি লেবাছ থেকে একখানা পত্র বের করলেন এবং তা আইবেকের হাতে গুঁজে দিলেন।

ওই ফরমানে লেখা ছিল, আইবেক গোটা ভারতের রাজা আর হাম্মাদ তার সিপাহসালার। ফরমান শেষে সুলতানের মোহরাঙ্কিত।

ফরমান পাঠ করে শ্রদ্ধায় আইবেকের মাথা নুয়ে এল। বললেন, আলীজাহ! গোলাম আপনার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। আমি এই সম্মানের যোগ্য নই। আপনার— আমার সম্পর্ক এ ফরমানের চেয়ে অনেক বেশী। সেটা যেন ক্ষুণ্ন না হয়। হাম্মাদকে নিয়ে ভাববেন না। ও কেবল সিপাহসালারই নয় আমার জীবন রক্ষাকারীও।

সুলতান অগ্রসর হয়ে আইবেকের সাথে করমর্দন করে বললেন, 'এখন তুমি রওয়ানা হয়ে যাও। আল্লাহ তোমার হেফাজত করুন।

আইবেকের কাফেলা রওয়ানা হোল দিল্লীর উদ্দেশ্যে। বার বার তিনি পেছন ফিরে তাকাচ্ছিলেন। এক সময় মুহাম্মদ ঘুরী আর আইবেকের মাঝে দূরত্বের দেয়াল সৃষ্টি হলো। আইবেকের চোখে নেমে এল অশ্রুপ্লাবন। তিনি আনমনে বলে চলেছেন. বিদায় ভারত বিজেতা, বিদায় গজনীর সিংহ, বিদায় লৌহ মানব সুলতান মোহাম্মদ ঘুরী, আল-বিদা তরাইন বিজেতা।

ঐতিহাসিক উপন্যাস

লৌহ মানব

নসীম হিজাযী

অনুবাদঃ ফজলুদ্দীন শিবলী

এশিয়া মাইনরের কাহিনী। ইতিহাসের ধুসর পৃষ্ঠায় চকচক করা এক মহামানবের উপাখ্যান। নিশাপুরের পার্বত্যাঞ্চল থেকে আড়মোড়া দিয়ে জেগে ওঠা সিংহশার্দুল। তার নাম সুলতান মুহাম্মদ ঘুরী।

ভারতবিজেতা, মুক্তিকামী মানুষের ত্রানকর্তা তিনি। তার কাফেলায় অসংখ্য সহযাত্রী ছিল। ছিল হাম্মাদ। ছিল খালদুনের মত লৌহমানব। তাদের পথের কন্টক ছিল পৃথ্বিরাজ।

তরাইনের যুদ্ধে তার শৌর্যবীর্য প্রকাশ পায়। তিনি সেই ব্যক্তিত্ব যিনি ভারতের ভাগ্যাকাশে সুরাইয়া সেতারা হয়ে উদিত হন।

আসুন এ উপন্যাসের পাতায় তার সাথে পরিচিত হই। কিছুক্ষনের জন্য হলেও ফিরে তাকাই হাজার বছর পেছনের দিকে।

আল-এছহাক প্রকাশনী
বাংলাবাজার, ঢাকা।